ISSN-0971-8397

যোজনা
ধনধান্যে

বিশেষ সংখ্যা

জানুয়ারি ২০১৫ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹২০

স্যানিটেশন, উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন

স্যানিটেশন এবং ভারতে সামাজিক পরিবর্তন
বিজয়ন কে পিল্লাই ও রূপাল পারেখ

ভারতে সার্বিক স্যানিটেশন
গ্রেগরি পিয়ার্স

ভারতীয় শহরাঞ্চলে স্যানিটেশন
তৃষা আগরওয়ালা

বিশেষ নিবন্ধ
ভারতে উৎপাদন উপকরণের আয় অসাম্য
তুলসী জয়কুমার

ফোকাস
প্রযুক্তি ও জন-নীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবুজ বিপ্লব
ড. টি এন শ্রীনিবাসন ও পবন কাটকর

Vision for a Developed Nation

Good Governance Day

December 25, the birthday of the Former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, is being observed as National 'Good Governance Day'. On this occasion, some of the relevant excerpts from his speeches are reproduced below-

Good Governance: Transparent, Accountable and Credible

…The essential elements of 'Good Governance' are

- A comprehensive legal framework defended and enforced by an impartial and competent judicial system,
- An accountable, open and transparent executive decision-making coupled with a capable, efficient and people-friendly bureaucracy,
- And, last but not the least, strong civil society participation…….

….Transparency and accountability are the test of good governance. Not only do they ensure the efficacy of the activities and programmes of the government, but they also establish its credibility in the eyes of those who elect it. Credibility is as important for the moral legitimacy of the government as majority support is for its political legitimacy. Indian democracy has therefore, created a strong institutional framework for adherence to the norms of transparency and accountability. Keeping track of where and how the government has spent the taxpayers' money is among the most important duties of legislators.

Work for the Nation: Faster and Better

..Productivity enhancement must be given priority in all the sectors of the economy. The appeal I would like to make to every worker and every organization is 'work faster, work better, work for the nation'.

Fairness, Equity and Sustainability

…The greatest challenge before all those in governance, business and administration is to steer the growth in global trade, business and economy along the lines of fairness, equity and sustainability. If we want globalization to deliver the desired boons in the next century, our watchwords have to be:

- The good of all, and not the greed of the few;
- Long-term growth and not short-term gains;
- Cooperation based on complementary strengths and not conflict rooted in unhealthy competition.

India's Potential Vindicated

…People, both in developing and developed countries, are willing to support liberalization and globalization, provided they are credibly reassured:

- That these reforms will benefit everybody, especially the poorest and the most disadvantaged;
- That the environment will be protected;
- That their cherished national and cultural identities will be preserved.

….Every Indian – whether living in India and abroad – has always believed that India is a great nation and has wondered why the world has not acknowledged this obvious truth. Perhaps we tended to judge ourselves by our potential, whereas others judge us by our performance. However, this gap between our potential and performance is now getting bridged. India is changing, and changing very rapidly. The imprint of this change is becoming bolder and more attention-catching by the day. The world acknowledges our prowess in IT and other sectors of knowledge based economy. Our growing markets and our rapidly expanding economy compel global recognition. Indian businesses have learnt from the globalization and the technology revolution the imperative of becoming globally competitive. Today " Made in India" or " Sourced from India" labels are becoming a matter of national pride.

We can, We must

…..Let each and every economic organization in the country become a Learning organization and let India itself become a Learning nation. Our efforts to create a new national work culture will bear the desired fruit only if it is rooted in the age-old concepts of *Seva*. Work becomes more than a job- indeed, work becomes worship- only when it is done with the attitude of *Samaj Seva* and *Rashtra Seva.*

…India faces a big challenge today. We will always remain a democracy, of course. That is an abiding source of India's pride and strength. But the challenge is:

- Can our democracy create a common national purpose around the issue of development and deliver it on a scale all of us dream of?
- Can we remove regional and social disparities and bridge urban-rural divide fast enough?
- Can we speedily enlarge the basket of opportunities to match the growing aspirations of our predominantly youthful population?
- In short, can we make India a Developed Nation in a holistic way by 2020?
- Within the life span of a single generation? Yes, we can. We must…

(Source: Selected Speeches of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, published by Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India)

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

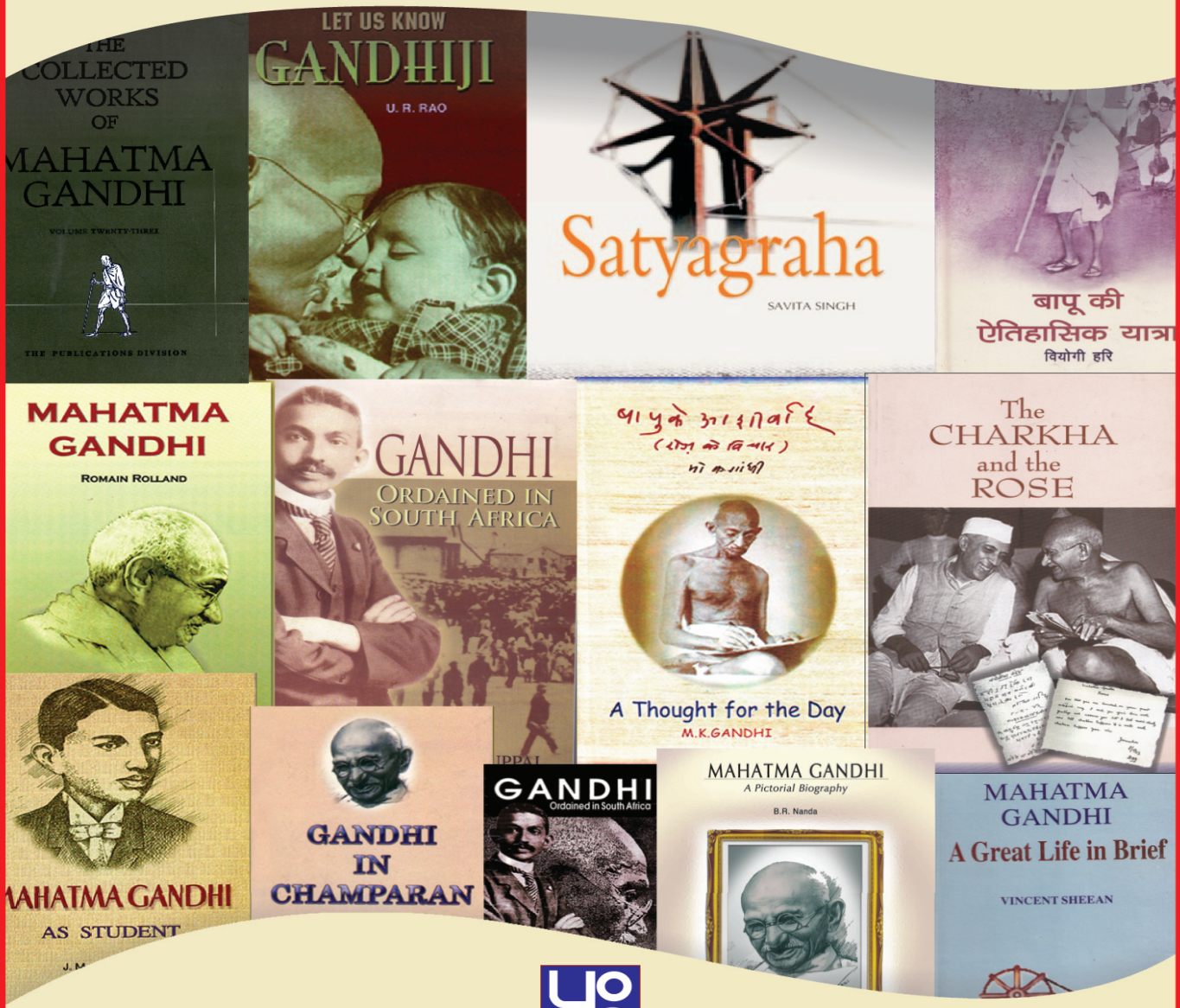

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 20.00

JANUARY, 2015
REGISTERED No. KOL-RMS/109/2015
R.N.I. No. 19740/6

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐☐☐☐☐☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

জানুয়ারি, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেশ কুমার ঝা**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- শৌচাগার নির্মাণ এবং ভারতে সামাজিক পরিবর্তন — ড. বিজয়ন কে পিল্লাই ও রূপাল পারেখ ৫
- ভারতে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি : সমস্যা ও সম্ভাবনা — গ্রেগরি পিয়ার্স ৯
- ভারতীয় শহরাঞ্চলে অনাময় বিকাশের উপাখ্যানের উলটো দিক — তৃষা আগরওয়ালা ১২
- অপুষ্টি, অপরিচ্ছন্নতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন — মিতালি পালধি ১৬
- সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নির্মলীকরণের ভূমিকা : কয়েকটি বিষয় — ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য ২১
- স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলন—একটি সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া — চণ্ডী চরণ দে ২৪
- স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশের অগ্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ — কে এন পাঠক ৩০
- মিশন নির্মল গ্রামবাংলা — সুস্মিতা ঘোষ ৩৫
- বায়ো-শৌচালয়-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এক নয়া পন্থা — ড. হাজাইফা খোরাকিওয়ালা ৩৯
- স্বচ্ছ ভারত গড়তে সচেতনতার প্রসার ও আইনের অনুশাসনের গুরুত্ব — তপন কুমার ভট্টাচার্য ৪০
- গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে স্যানিটেশন কর্মসূচির প্রভাব ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা — অভিষেক মিত্র ৪৬

বিশেষ নিবন্ধ

- ভারতে উৎপাদন উপকরণের আয় অসাম্য — ড. তুলসী জয়কুমার ৫২
- বিপন্ন জীববৈচিত্র্য — অনিন্দ্য ভুক্ত ৫৬

ফোকাস

- সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি ও জননীতি — ড. টি এন শ্রীনিবাসন ও পবন কাটকর ৬১

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত ৬৮
- জানেন কি? জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন — মলয় ঘোষ ৭৭
- প্রতিযোগিতা প্রস্তুতি (উড়ান দুনিয়ায় পেশার হদিস) — মহুয়া গিরি ৭৯
- যোজনা ক্যুইজ — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৮২

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

সাফাই করবে "কে"

গান্ধীজির জীবনের একটি ঘটনা ফিরে দেখা যাক। সেটা ছিল ১৮৯৮ সাল। গান্ধীজি তখন দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ওকালতি করতেন। সেসময়ে তিনি প্রায়ই তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে থাকতেন। মেথর পরিবারভুক্ত এমনই একটি খ্রিস্টান কর্মচারী একবার তাঁর সঙ্গে থাকতে আসে। নালা না থাকায় সেসময়ে ঘরে পায়খানার পাত্র থাকত, যা রোজ সকালে কস্তুরবা নিজে পরিষ্কার করতেন। নীচু জাতের পায়খানা পরিষ্কারের কাজটা তিনি যে খুব প্রসন্নচিত্তে করতে রাজি হন, তা বলা যায় না। তবে একইসঙ্গে গান্ধীজি সে কাজটা করবেন, তাও তিনি ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না। গান্ধীজির মত ছিল কাজটা কস্তুরবা করুন এবং খুশি মনে করুন। আত্মজীবনীতে গান্ধীজি লিখছেন, "আমার ভিতরের মানুষটাকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম সেদিন। আমার অসহায় স্ত্রীর হাত ধরে টানতে টানতে গেট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। সিঁড়িটা ছিল গেটের ঠিক বিপরীতে। সেই গেট খুলে ফেললাম, যেন তাকে একেবারে ধাক্কা মেরে বার করেই দেব।" অত্যন্ত অনুতাপের সঙ্গে, লজ্জার সঙ্গে গান্ধীজি সেই ঘটনা স্মরণ করছেন।

পরিচ্ছন্নতা, নির্মলীকরণ ও সমাজের নীচু জাতের প্রতি গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, এই ঘটনা থেকে আমরা তা খানিকটা হলেও বুঝতে পারি। পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কিংবা পৌরসভাভিত্তিক পারিপার্শ্বিক অনাময়-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর একটা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ এবং রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বুঝেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় অনাময় ব্যবস্থা বা পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রাজনৈতিক মাত্রা দেওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমে বর্ণবিদ্বেষকে জাগিয়ে রাখার অজুহাত গড়ে তুলেছিল ব্রিটিশ শাসকরা। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বা ঘোর বর্ণের নেটিভদের নানা ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রামের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নটি আলাদা করে দেখা যেত না। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই দিনগুলি এবং ১৯৪৭-৪৮ সালের "ভাঙ্গি বস্তি"-তে থাকার দিনগুলি সেই একই সূত্রে বাঁধা। গান্ধীজি বুঝেছিলেন যে, পরিচ্ছন্নতা ও অনাময় ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া বৃথা, যদি না মানুষের মন থেকে বর্ণবৈষম্যের সুপ্রাচীন সংস্কারকে উৎপাটিত করা যয়। তাই গান্ধীজি পরিচ্ছন্নতাকে দেখতেন একটা সংস্কারের হাতিয়ার হিসেবে, পরিবর্তনের ধারক ও বাহক হিসেবে।

যোজনা

পরিচ্ছন্নতার এই বিষয়টিকে বর্তমান সরকার জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করবার এবং তা নিয়ে যথেষ্ট প্রচার করবার পর তা আবার মূলস্রোতে ফিরে এসেছে এবং মানুষের মনোযোগ কেড়েছে। অতীতেও বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে বিভিন্ন সরকার, তবে এবার যেন প্রশাসন ও প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে একে একটি জোরদার ধাক্কা দেওয়া হল। আগামী বছরগুলিতে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শৌচালয় নির্মাণ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে গণশিক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে সরকার বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন এই প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হবে রাজ্য সরকার, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে যৌথভাবে।

তবে হ্যাঁ, যাঁরা আমাদের স্কুলে, দপ্তরে, বাড়িতে শৌচালয় ও নর্দমা পরিষ্কার করবার দৈনন্দিন দায়িত্বে আছেন, তাঁদের বেতন বাড়ানোর দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। তাঁদের কাজের সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এরা আর্থিকভাবে সমাজের সবথেকে অসচ্ছল শ্রেণীভুক্ত। বহু লোক কাগজ ও অন্যান্য আবর্জনা নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করেন। তাঁদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ১৪ বছরের কমবয়সি। এঁদের সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। আমাদের দেশের অনাময় ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সঙ্গে যুক্ত ৯০ শতাংশ কর্মী ৬০ বছর বয়স হওয়ার আগেই নানারকম সংক্রামক রোগে ভুগে মারা যান। এ কি কম লজ্জার কথা! পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ওপর আমরা আজ যেমন জোর দিচ্ছি, তেমনি নানা ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও মর্যাদার প্রশ্নকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

গান্ধীজিকে আজকের এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে। তাঁকে এই অভিযানের প্রাণপুরুষ ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কেন্দ্রে যে রাখা হয়েছে, এর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রতীক চিহ্ন হিসেবে তাঁর সেই সুবিখ্যাত চশমাটি তখনই সফল হয়ে উঠবে যখন এই সমস্ত কর্মীরা নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে বা আবর্জনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কোনও সংক্রমণে প্রাণ হারাবেন না। গান্ধীজির সেই ভুবনভোলানো, নির্মল হাসিটিও তখনই হৃদয়স্পর্শী হবে যখন সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ হাসিমুখে পৌরকর্মী দ্বারা আধুনিকৃত অনাময় ব্যবস্থায় "সাফাই কর্মী"-র কাজ করতে এগিয়ে আসবেন উপার্জনের আর পাঁচটা রাস্তার মতোই।

বাপু, সেদিন যেন শীঘ্রই আসে, এই আশীর্বাদ করো। ❑

শৌচাগার নির্মাণ এবং ভারতে সামাজিক পরিবর্তন

ভারতের শৌচালয় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে তার যোগ এবং এর আর্থসামাজিক প্রভাবের প্রগাঢ় বিশ্লেষণ রয়েছে এই নিবন্ধে। গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত খুঁটিনাটির পাশাপাশি **ড. বিজয়ন কে পিল্লাই** ও **রূপাল পারেখ** *তুলে ধরেছেন সমস্যা সমাধানের দিশানির্দেশও।*

শৌচাগারের সংস্থান নেই, বিশ্বের এমন ২৬০ কোটি মানুষের মধ্যে ৬৫ কোটি মানুষেরই বাস ভারতে। স্যানিটেশন নিয়ে এমন বিপুল সমস্যার মোকাবিলায় ভারত সরকার 'মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির' সূচনা করেছে। এই কর্মসূচির সাফল্য, বিশেষত, এর ধারাবাহিকতা নির্ভর করছে সামাজিক কাঠামোগত শক্তিগুলির সঙ্গে মেলবন্ধনের ওপর। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য, ভারতে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সার্বিক শৌচাগার ব্যবস্থার সামাজিক প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করা। এক্ষেত্রে আমরা বহুমুখী উপাদান-সম্পন্ন একটি মডেল গ্রহণ করে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে তার গাণিতিক বৈধতা যাচাই করেছি। আমরা দেখেছি, শৌচাগার ব্যবস্থার (স্যানিটেশন) উন্নয়নে আধুনিকীকরণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি, এই কর্মসূচিকে সফল করতে প্রয়োজন সুদৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার। এর মাধ্যমেই আধুনিক সুযোগসুবিধা এবং জনস্বাস্থ্য শিক্ষা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

বিশ্বের জনসংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে ৯৬০ কোটিতে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই জনসংখ্যার প্রায় ৬৬ শতাংশই শহুরে এলাকায় বাস করবে। এর অর্থ হল, জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় আরও প্রায় ২৪০ কোটি বাড়বে। শহরের জনসংখ্যা বাড়বে ১২ শতাংশ। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জন্মহার কমলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও বেশ বেশি (চন্দ্রশেখর, ২০১৩)। উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম হলেও বিশ্বের মোট শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৫৩ শতাংশ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিবাসী। এই বিস্ফোরণ এবং শহরায়নের জেরে শৌচাগার ও নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, যার প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্যের ওপর।

অধিকাংশ বিকাশশীল দেশেই সরকারি কর্মসূচি ও নীতিসমূহ যে শৌচালয় ও নিকাশি ব্যবস্থার মৌলিক সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তা বোঝা যায় একটি পরিসংখ্যানেই। ১৯৯০ থেকে ২০০৮—এই আঠারো বছরে বিশ্বের মাত্র ৭ শতাংশ মানুষের কাছে এই সুবিধা পৌঁছেছে। ১৯৯০ সালে এই সুবিধা পেতেন বিশ্বের জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ। ২০০৮ সালে তা হয়েছে ৬১ শতাংশ। এখনও বিশ্বের প্রায় ২৬০ কোটি মানুষ শৌচালয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সমস্যার এই ব্যাপকতার জন্যই ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শৌচালয়ের সুবিধা না পাওয়া মানুষজনের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়।

শৌচালয় ব্যবস্থার এই অপ্রতুলতার সঙ্গে একাধিক আর্থিক ও সামাজিক বিষয় জড়িত। জল ও শৌচাগার সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অপ্রতুলতার জন্য প্রায় ৫৪০০ কোটি ডলার নষ্ট হয়, যা ২০০৬ সালের হিসাবমতো ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জল ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প, ২০১১)-এর ৬.৪ শতাংশ। এর প্রায় ৭২ শতাংশই স্বাস্থ্যজনিত কারণে। নড়বড়ে শৌচাগার ব্যবস্থার সামাজিক কুফল এখনও সেভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। এ সংক্রান্ত তথ্য অসম্পূর্ণ ও অনথিবদ্ধ।

ভারতে ৬৫ কোটির কাছাকাছি মানুষ শৌচাগারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই সমস্যার মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনগুলিকেও উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি কর্মসূচিগুলিতে মূলত গোষ্ঠীভিত্তিক প্রচারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর প্রধান লক্ষ্য হল ২০১৭ সালের মধ্যে প্রকাশ্যে মলত্যাগ বন্ধ করা। এজন্য চাপ সৃষ্টি ও লক্ষ্যপূরণকারীদের পুরস্কৃত করার দ্বিমুখী কৌশল নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য, দেশের এক হাজারটি শহরকে পরিচ্ছন্ন করা এবং মাথায় করে মল বহনের অমানবিক প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন। এই কর্মসূচির সাফল্য ও ধারাবাহিকতা নির্ভর করছে সামাজিক কাঠামোগত শক্তিগুলির সঙ্গে এর মেলবন্ধনের ওপর। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় পরিবারগুলিতে শৌচাগার ব্যবস্থা যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তা খুঁজে বের করা।

তৃতীয় জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিমাপ, বিশ্লেষণ ও ফলাফল

তাত্ত্বিকভাবে বললে, শৌচাগার ব্যবস্থা নির্ভর করে আধুনিকীকরণের প্রসার, দারিদ্র্যের মাত্রা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং শিক্ষাগত স্তরের ওপর। শৌচাগার ব্যবস্থার মানকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। শৌচাগারের সুবিধা আদৌ নেই, খাটা পায়খানা এবং ফ্লাশযুক্ত শৌচাগার। কোন ভাগে কতজন রয়েছেন, তা সারণি-১-এ দেখানো হয়েছে। নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫১% মানুষ

ফ্লাশযুক্ত শৌচাগার ব্যবহার করেন। ৪০% মানুষের কাছে কোনওরকম শৌচাগারের সুবিধাই পৌঁছায়নি। নমুনা সমীক্ষায় ২৯টি রাজ্যে ফ্লাশযুক্ত শৌচালয় থাকার যে হার মিলেছে, সারণি-২-তে তা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের শীর্ষস্থানীয় চারটি রাজ্য হল কেরল, দিল্লি, সিকিম এবং মিজোরাম। একদম শেষে রয়েছে রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও ওড়িশা।

শৌচাগার ব্যবস্থা যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তাদের ৯টি মাপকাঠিতে মাপা হয়েছে। এদের মধ্যে ৫টি—নলবাহিত জল, বিদ্যুৎ, টিভি, পেশার ধরন এবং এইচ আই ভি সচেতনতা—আধুনিকীকরণের মাত্রার সঙ্গে জড়িত। নলবাহিত জল, বিদ্যুৎ ও টিভি বাড়িতে থাকা বা না থাকা থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবারের জীবনযাত্রায় আধুনিক সুবিধাগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এইচ আই ভি সম্পর্কিত জ্ঞান দিয়ে পরিমাপ করা যায় আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সচেতনতা, যা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। ধর্মীয় বিশ্বাসকে 'ডামি' উপাদান দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দু এবং অহিন্দু। দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও তার ওপরের স্তরকে ০ এবং বাকিদের ১ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সারণি-৩-এ এই ভাগগুলি রয়েছে। চতুর্থ সারণিতে তিনটি নির্ভরশীল উপাদানের সাপেক্ষে ৯-টি স্বাধীন উপাদানের বিভাজন দেখানো হয়েছে। রিগ্রেসনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে পঞ্চম সারণিতে। ভিত্তি বিভাগ ধরা হয়েছে শৌচাগারের সুবিধা না থাকাকে। প্রথম পর্বে কোনও সুবিধা না থাকার সাপেক্ষে রাখা হয়েছে ফ্লাশযুক্ত শৌচালয়কে। দ্বিতীয় পর্বে শৌচালয় না থাকার সঙ্গে খাটা পায়খানাকে রাখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যাঁদের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই তাঁদের তুলনায় যাঁদের বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, তাঁদের ফ্লাশযুক্ত শৌচাগার থাকলে তাঁরা তিনগুণ বেশি ভাগ্যবান।

শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের থেকে বেশি হলে, বাড়িতে নলবাহিত জল, টেলিভিশন থাকলে, কর্মসূত্রে আধুনিক ক্ষেত্রে বা কায়িক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত হলে এবং এইডস সচেতনতা থাকলে তাঁদের ফ্লাশযুক্ত শৌচাগার থাকার সম্ভাবনা বেশি।

সারণি-১
নির্ভরশীল উপাদানের সংখ্যা ও শতাংশের নিরিখে তার ভাগ
নিকাশির মাত্রা (মোট সংখ্যা ১,২৪,৩৮৫)

নিকাশির ভাগ	বিবরণ	সংখ্যা
কোনও সুবিধা নেই	মাঠেঘাটে শৌচ	৫০,২৯৮ (৪০.৫%)
খাটা পায়খানা	সমস্ত ধরনের খাটা পায়খানা	৯,৮৭৮ (৭.৯%)
ফ্লাশ	বিভিন্ন ধরনের ফ্লাশযুক্ত শৌচাগার	৬৪,০৯৬ (৫১.৫%)

সারণি-২
বিভিন্ন রাজ্যের সংগৃহীত নমুনায় ফ্লাশযুক্ত শৌচাগারের শতাংশ

রাজ্য	নমুনায় ফ্লাশযুক্ত শৌচাগারের শতাংশ	স্থান
কেরল	৮৮.৩	২৯.০
দিল্লি	৮৭.৯	২৮.০
সিকিম	৭৮.২	২৭.০
মিজোরাম	৭২.১	২৬.০
মহারাষ্ট্র	৬৯.৩	২৫.০
নাগাল্যান্ড	৬৬.৫	২৪.০
গোয়া	৬৫.৯	২৩.০
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬২.৫	২২.০
পঞ্জাব	৬২.০	২১.০
পশ্চিমবঙ্গ	৬১.৯	২০.০
উত্তরাঞ্চল	৫৭.০	১৯.০
তামিলনাড়ু	৫৩.৭	১৮.০
গুজরাত	৫৩.১	১৭.০
মণিপুর	৫১.৩	১৬.০
হিমাচলপ্রদেশ	৫০.৯	১৫.০
মেঘালয়	৫০.৮	১৪.০
মধ্যপ্রদেশ	৪৮.৪	১৩.০
ত্রিপুরা	৪৭.৮	১২.০
হরিয়ানা	৪৫.৪	১১.০
অসম	৪২.৭	১০.০
উত্তরপ্রদেশ	৪১.৭	৯.০
অরুণাচলপ্রদেশ	৩৬.৮	৮.০
কর্ণাটক	৩৬.৬	৭.০
বিহার	৩৪.৬	৬.০
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৩.৪	৫.০
রাজস্থান	৩২.০	৪.০
ঝাড়খণ্ড	২৯.০	৩.০
ছত্তিশগড়	২৪.১	২.০
ওড়িশা	১৯.৬	১.০

সাধারণভাবে হিন্দুরা শৌচাগারের ব্যবহারে তেমন উৎসাহী নন বলে যে ধারণা রয়েছে, আমাদের সমীক্ষার ফল তাকেই সমর্থন করছে। আমরা দেখেছি, শৌচালয়ের সুবিধা নেই এমন হিন্দু পরিবারের সংখ্যা অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। আবার বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, নলবাহিত জল যাঁদের বাড়িতে রয়েছে, তাঁদের ফ্লাশযুক্ত শৌচাগার ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। স্বল্প শিক্ষা ও স্বল্প আয়ের নিম্ন আর্থসামাজিক

সারণি-৩
শৌচ সংক্রান্ত সচেতনতার সঙ্গে জড়িত নির্বাচিত কয়েকটি উপাদানের পরিসংখ্যান

উপাদানের নাম	বর্ণনা	মূল্য	সংখ্যা (%)
শিক্ষা	প্রাথমিকের বেশি	১	৬৬৮৪৮ (৫৩.৭)
	প্রাথমিক অথবা তার নীচে	০	৫৭৫২৫ (৪৬.৩)
নিরপদ জল	পাইপের জল/বোতলের জল	১	৯৯৩৮২ (৭৯.৯)
	অন্যান্য উৎস	০	২৪৯৯০ (২০.১)
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ পৌঁছেছে	১	৯৫৭৬৪ (৭৭.০)
	বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি	০	২৮৫৯৮ (২৩.০)
টেলিভিশন	বাড়িতে TV আছে	১	৭১০৮১ (৫৭.১)
	TV নেই	০	৫৩৩০৪ (৪২.৯)
হিন্দু	হিন্দু	১	৮৯৯৫৭ (৭২.৪)
	অন্য ধর্ম	০	৩৪২৭০ (২৭.৬)
সম্পদ	দরিদ্র বা দরিদ্রতম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত	১	৩১৭২৯ (২৫.৫)
	মধ্যবিত্ত বা তার উঁচুতে	০	৯২৬৫৬ (৭৪.৫)
আধুনিকতা	সঙ্গী আধুনিক পেশায় নিযুক্ত	১	৩৩৪৬০ (২৬.৯)
	সঙ্গী আধুনিক পেশায় নিযুক্ত নন	০	৯০৬৩৪ (৭২.৯)
কায়িক পরিশ্রম	কায়িক পরিশ্রমের কাজে যুক্ত	১	৩৪৩৮৫ (২৭.৭)
	কায়িক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কাজে যুক্ত	০	৮৯৭২৯ (৭২.৩)
এইডস সচেতনতা	এইডস সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে	১	৭১০২৫ (৫৭.১)
	এইডস সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বা অতি স্বল্প ধারণা	০	৫৩৩৬০ (৪২.৯)

সারণি-৪
শৌচ সচেতনতার সঙ্গে স্বাধীন উপাদানগুলির সম্পর্ক

উপাদান	যে ধরনের শৌচ ব্যবস্থা রয়েছে				
	কোনও সুবিধা নেই %	খাটা পায়খানা %	ফ্লাশ ব্যবস্থা %	মোট	পিয়ার্সন কাই স্কোয়্যার (P value)
প্রাথমিক শিক্ষায় বেশি শিক্ষিত	২৩.৫	৭.৪	৬৯.২	৬৬,৭৯৭	১৯,০৫০ (০.০০০)
নলবাহিত জল/বোতলের জল ব্যবহারকারী	৩৫.৮	৬.৫	৫৭.৭	৫৭,২৯৬	৭,৫৬০ (০.০০০)
বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে	২৮.৪	৭.৫	৬৪.০	৯৫,৬৮৭	২৭,৫৯০ (০.০০০)
বাড়িতে টেলিভিশন আছে	২০.৪	৬.২	৭৩.৪	৭১,০২০	৩২,৪৪০ (০.০০০)
হিন্দু	৪৬.১	৫.২	৪৮.৭	৮৯,৮৭৮	৬,০৯০ (০.০০০)
দরিদ্র বা দরিদ্রতম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত	৮৪.৫	৯.২	৬.২	৩১,৬৯৩	৩৭,৪৭০ (০.০০০)
আধুনিক পেশায় নিযুক্ত	২২.৯	৬.৫	৭০.৬	৩৩,৪৫২	৬,৮১৯ (০.০০০)
কায়িক পরিশ্রমের কাজে যুক্ত	৪৫.৩	৭.৫	৪৭.২	৩৪,৩৫৩	৪৫৯ (০.০০০)
এইডস সচেতনতা রয়েছে	২৬.০	৮.৪	৬৫.৬	৭০,৯৭১	১৪,৮৯০ (০.০০০)

শ্রেণির কাছে শৌচালয়ের সুবিধা এখনও সেভাবে পৌঁছায়নি।

উপসংহার

আধুনিকীকরণের জেরে জনস্বাস্থ্য ও শৌচাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়, আমাদের সমীক্ষার ফলাফল প্রচলিত এই ধারণাকেই সমর্থন করছে। শৌচাগার ব্যবস্থার উন্নতিতে সামাজিক কাঠামোগত বহুমুখী উপাদাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে ভারতে এ সংক্রান্ত যে দুটি প্রচারাভিযান চলছে, সেই 'সম্পূর্ণ অনাময় কর্মসূচি' এবং 'মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এ প্রকাশ্যে মলত্যাগের অভ্যাস বন্ধ করতে বাড়িতে শৌচাগার বানিয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব শৌচাগার আদৌ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা এক বড়ো প্রশ্ন। আবার শৌচাগার ব্যবহারের ফলে রোগের সংক্রমণ কমে বলে

সারণি-৫
ন-টি নির্বাচিত উপাদানের সাপেক্ষে শৌচাগার ব্যবস্থার রিগ্রেসন

উপাদান	বি	এস ই বি	ওয়াল্ডস্ সি স্কোয়ার	পি মূল্য	ই এক্স পি (বি)	সি এল উপরে	সি এল নীচে
ফ্লাশযুক্ত শৌচালয় বনাম শৌচালয়ের সুবিধা না থাকা							
ইনটারসেপ্ট	-১.৮২৫	.০৩৪	২৮৯২.০	০.০০০			
শিক্ষা	.৯২৮	.০১৮	২৬৫৫.০	০.০০০	২.৫৩০	২.৪৪২	২.৬২১
নিরাপদ জল	.৮৮৭	.০২১	১৭৩১.০	০.০০০	২.৪২৭	২.৩২৮	২.৫৩১
বিদ্যুৎ	১.১৭৭	.০২৭	১৯১১.০	০.০০০	৩.২৪৫	৩.০৭৮	৩.৪২১
টেলিভিশন	.৯৩২	.০১৯	২৪২৬.০	০.০০০	২.৫৪১	২.৪৪৮	২.৬৩৭
হিন্দু	-১.০৮৭	/.০২০	৩০৯০.০	০.০০০	.৩৩৭	.৩২৫	.৩৫০
সম্পদ	-২.০৬৭	.০২৮	৫৪৭৬.০	০.০০০	.১২৭	.১২০	.১৩৪
আধুনিক	.৮১৩	.০২০	১৬১৭.০	০.০০০	২.২৫৫	২.১৬৮	২.৩৪৬
কায়িক	.৪২০	.০১৯	৪৬৪.৭	০.০০০	১.৫২২	১.৪৬৫	১.৫৮২
এইডস সচেতনতা	.৪৪১	.০১৮	৬২২.৫	০.০০০	১.৫৫৪	১.৫০১	১.৬০৯
খাটা পায়খানা বনাম শৌচালয়ের সুবিধা না থাকা							
ইনটারসেপ্ট	-১.০৩৮	.০৪০	৬৭৯.৮৪৬	০.০০০			
শিক্ষা	.৩৬৪	.০২৭	১৮৪.৯২৬	০.০০০	১.৪৪০	১.৩৬৬	১.৫১৭
নিরাপদ জল	-.২০২	.০২৬	৬০.০০৩	০.০০০	.৮১৭	.৭৭৭	.৮৬০
বিদ্যুৎ	.৪৪৯	.০৩১	২১১.২৫৯	০.০০০	১.৫৬৬	১.৪৭৪	১.৬৬৪
টেলিভিশন	.২৪৯	.০২৯	৭৪.৪৯৬	০.০০০	১.২৮৩	১.২১৩	১.৩৫৮
হিন্দু	-১.৭০৩	.০২৪	৪৮৩৩.০	০.০০০	.১৮২	.১৭৪	.১৯১
সম্পদ	-.৩৮৩	.০৩১	১৫৭.৭৯৫	০.০০০	.৬৮২	.৬৪২	.৭২৪
আধুনিক	.২৭১	.০৩১	৭৮.৬২৯	০.০০০	১.৩১১	১.২৩৫	১.৩৯২
কায়িক	.০০২	.০২৮	.০০৫	০.৯৪৪	১.০০২	.৯৪৮	১.০৫৮
এইডস সচেতনতা	.৫৩২	.০২৬	৪০৬.৪৫২	০.০০০	১.৭০২	১.৬১৬	১.৭৯২

যে ধারণা করা হয়, তা এখনও যথেষ্ট পরীক্ষিত নয়। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে শৌচাগার ব্যবস্থাকে মানুষের অর্থপূর্ণ ব্যবহারগত পরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আমাদের সমীক্ষায় সামাজিক কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক বেশ কিছু উপাদান নেওয়া হয়েছে, যেগুলি শৌচাগার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা এবং পেশার প্রকৃতি এ সংক্রান্ত সচেতনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্কুলের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমের বাজারও এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অসংগঠিত থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রে গেলে শ্রমের বাজারের গঠনগত উপাদানের পরিবর্তন হয়, তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শৌচাগার ব্যবস্থার ওপর।

আমরা আগেই বলেছি, নড়বড়ে শৌচাগার ব্যবস্থার সামাজিক প্রভাব নিয়ে তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই সমীক্ষায় সে বিষয়ে আলোকপাত না করা হলেও জনস্বাস্থ্যের কারণে এ নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। যথাযথ শৌচাগার পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতা, বেসরকারি ক্ষেত্রের সামনে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। তবে এক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত থাকায় বেসরকারি পরিষেবার ওপরেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রায়শই সরকারি সংস্থাগুলি পরিকল্পনা রূপায়ণ, নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। এর সুযোগ নিয়ে অনেক সময়ে বেসরকারি সংস্থাগুলি শহরের অননুমোদিত জায়গায় শৌচাগার পরিষেবা চালায়। সৃষ্টি হয় দূষণ ও নোংরার। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়, এমনকি তাঁরা প্রান্তিক সামাজিক অবস্থানেও পৌঁছে যেতে পারেন (আগরওয়াল, ২০১৪)। সবশেষে বলি, তরুণতম প্রজন্ম জনস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। পুরোনো ধ্যানধারণা না পালটালে সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে, ব্যাহত হবে সামাজিক একতা। ❑

[লেখকদ্বয় টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক'-এ যথাক্রমে অধ্যাপক ও গবেষক।
email: pillai@uta.edu
rupal.parekh@mavs.uta.edu]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি

সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভারতে রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ এবং অত্যধিক মৃত্যুহারের মূলে রয়েছে শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহার কম হওয়া। অপ্রতুলতা। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও শৌচাগার সমস্যার সমাধানের উপর সমীক্ষা ও গবেষণার কাজ হয়েছে প্রচুর। শৌচাগার ব্যবহারের পথে অন্তরায় কী কী, সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজও হয়েছে বিস্তর। কিন্তু স্থান ও অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহারের প্রকৃত সত্যটি খুঁজে দেখার চেষ্টা হয়েছে নামমাত্র। **গ্রেগরি পিয়ার্স**-*এর এই নিবন্ধে স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের বিষয়টি জেলা পর্যায়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে স্থান ও অবস্থানগত ভিন্নতা ও তারতম্যের প্রেক্ষাপটে।*

শৌচাগার ব্যবহারের সংখ্যা ও মাত্রা শোচনীয়ভাবে কম হওয়ার কারণে ভারতে ভয়ংকর ও বিপজ্জনক রোগব্যাধির প্রকোপ যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পেয়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। বিশ্ব জনসংখ্যার মধ্যে উপযুক্ত স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনধারণের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের বাসই ভারতে। সঠিকভাবে বলতে গেলে সারা পৃথিবীর যত মানুষ উপযুক্ত শৌচাগারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই ভারতীয় নাগরিক, যাদের সংখ্যা ৬ কোটিরও বেশি। খোলা মাঠে বা উন্মুক্ত স্থানেই তাদের প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে ফেলতে হয়। শৌচাগারের অভাব এবং তা ব্যবহারের সংখ্যা অত্যধিক কম হওয়ায় ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বছরে হ্রাস পেয়েছে ৬.৪ শতাংশ হারে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে সমীক্ষা ও গবেষণার কাজ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি তথা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনধারণের উপায়ের পথে অন্তরায় কী এবং শৌচাগার ব্যবহারের ঘটনা এত কম হওয়ার কারণই বা কী, সে সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখনও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

দেশের জেলাস্তরে ও জেলা ভেদে শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে ফারাক বা তারতম্য রয়েছে তার স্থান ও অবস্থানগত বিশ্লেষণ ও কৃতকৌশলগত উপায় অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। বিশ্ব জুড়ে স্থান ও অবস্থানগত যে স্বাভাবিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, শৌচাগার ব্যবহারজনিত যে আচরণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার মূল কিন্তু প্রোথিত জেলাস্তরেই। এ ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে স্থান ও অবস্থানগত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রকাশ, যে সমস্ত জেলায় পাঁচ বছর বয়সের আগেই শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি সেখানেই শৌচাগারের হাল বা সংখ্যা খুবই আশঙ্কাজনক। শৌচাগার ব্যবহারের সঙ্গে উচ্চমানের আর্থসামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যে সম্পর্ক রয়েছে, তা হিসাবের মধ্যে ধরেও স্থান ও অবস্থানগত একটি মডেল বা আদর্শের কথা বিবেচনা করা হয় শৌচাগার ব্যবহার সম্পর্কে সমীক্ষা ও গবেষণার কাজে। এই সমস্ত শৌচাগারের অবস্থান এবং জেলা পর্যায়ে এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা থেকে প্রাথমিকভাবে শৌচাগার সম্পর্কে এক বাস্তব চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। রাজ্যস্তরে অবশ্য এত খুঁটিনাটি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

শৌচাগার সম্পর্কে স্থান ও অবস্থানগত সমীক্ষার যে সমস্ত ফলাফল বা বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে, তা মূলত গ্রাম বা সন্নিহিত অঞ্চলের ব্যবস্থা-অব্যবস্থার ওপরই আলোকপাত করেছে। কখনও বা রাজ্য বা তার বাইরের পরিধিকেও সমীক্ষায় স্থান দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে (মণিকুট্টী ১৯৯৮; চেম্বার্স ২০০৯)। তবে ক্ষুদ্রাকারেই হোক বা বৃহদাকারে, সাম্প্রতিককালে জেলা পর্যায়ে স্যানিটেশন (যার মধ্যে শৌচাগারের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকে) সম্পর্কে কিছু কিছু বই বা তথ্যপুস্তিকা বেরোতে শুরু করেছে। ভারত সরকার দেশের ৯৫ শতাংশ জেলাতেই পূর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা অভিযান (TSC) চালিয়ে আসছে। এর আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয় রাজ্যগুলির অনুকূলে। এই অভিযানের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরে এই বরাদ্দের অর্থ পৌঁছে যায় জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে, যাতে দেশের সমস্ত গ্রামে উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কাজকর্ম অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগের ঘটনা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়। তবে এই কাজের মূল রাশ ও নিয়ন্ত্রণ থাকে জেলা কর্তৃপক্ষের হাতেই।

ইউনিসেফ-এর ২০০৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে শৌচাগারের অভাব বা তা ব্যবহারজনিত অপ্রতুলতার কারণ খতিয়ে দেখার ঘটনা ছিল খুবই কম। জেলাভিত্তিক বা জেলা অনুযায়ী TSC বরাদ্দের (২০১২) ফলে শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি ও শিশুমৃত্যুর হার সম্পর্কে সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছেন স্পিয়ার্স। অন্যদিকে স্টপনিটজ্‌কি (২০১২) এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত ভারতের জেলাগুলিতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য শৌচাগার নির্মাণের সংখ্যা সেরকমভাবে বৃদ্ধি পায়নি। আবার, শৌচাগার নির্মাণে উৎসাহ দিতে এই অভিযানে (২০১৩) সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অন্যভাবে বিষয়টি

সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দ্বিধার ভাব পোষণ করেছেন হিউসো ও বেল, ঘোষ ও কর্নক্রস। ২০০১ ও ২০১১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলে ধরে এঁরা এই মত পোষণ করেছেন যে রাজ্য ও জেলাস্তরে শৌচাগার ব্যবহারের বিষয়টি বিশেষভাবে সমর্থিত ও প্রভাবিত হয় নারী সাক্ষরতা ও নগরায়ণ দ্রুত সম্ভব হয়ে ওঠার ওপর (২০১৩)। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে স্থান ও অবস্থানগত যে ফারাক বা তারতম্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সব ক-টি তথ্যপুস্তক বা তথ্যপঞ্জির একটি পরিপূরক হিসেবেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

শৌচাগার ব্যবহার : জেলা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

ভৌগোলিক দূরত্ব, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও অবস্থান ইত্যাদি অবলম্বন করে শৌচাগার ব্যবহার সম্পর্কে সমীক্ষা বা গবেষণার কাজ খুব একটা যে হয়েছে, তা নয়। শৌচাগার বা স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে ফেলার উপায় সম্পর্কে স্থান ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য এবং ২০১১ সালের সিং, পাঠক ও চৌহান এবং ২০১২ সালের কুমার, সিং ও রাই-এর সমীক্ষার যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা অসংগত নয়।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা শৌচাগারের অপ্রতুলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা খুব একটা কঠিন বিষয় নয়। বিশেষ করে উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে ফেলার অভ্যাসের যে একটা নেতিবাচক ও অস্বাস্থ্যকর দিক ও প্রভাব রয়েছে তা ২০০২ সালের কর্ণ ও হ্রদ এবং ২০০৯ সালের জর্জের সমীক্ষা প্রতিবেদনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদি কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ির লোকজন খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক কাজকর্মের অভ্যাস বা তাগিদ থেকে বিরত না হয় তাহলে তা থেকে রোগজীবাণু সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে সন্নিহিত ও পারিপার্শ্বিক এলাকার বসবাসের স্থানগুলিতে।

প্রতিটি জেলা হল রাজ্য প্রশাসনের এক-একটি অংশ যা গড়ে ওঠে বেশ কিছু শহর ও গ্রাম নিয়ে। জেলা ভেঙে মোট বসবাসকারীর সংখ্যা কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ হতে পারে। তাই জেলাভিত্তিক শৌচাগার ব্যবহার সম্পর্কে কোনও মতামত বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্র খুবই সীমিত। স্পষ্টতই জেলা পর্যায়ে শৌচাগার ব্যবহারের বিষয়টিকে শুধুমাত্র ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করলে চলবে না, বরং স্থান ও অবস্থান ভেঙে শৌচাগারের চাহিদা ও জোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখেই তা ভেবে দেখতে হবে। সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও আচরণের ওপর শৌচাগারের চাহিদা অনেকাংশে নির্ভর করে আর শৌচাগার নির্মাণের চাহিদাপূরণে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাব্যক্তিরা। এ ব্যাপারে বর্তমানে বিভিন্ন জেলার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে চার ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তা থেকেই জেলা পর্যায়ে একটি সুস্পষ্ট বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়।

জেলা পর্যায়ে শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে ফারাক বা তারতম্য রয়েছে তা থেকেই কোনও অঞ্চলের বাড়িগুলির সংস্কার বা পরিস্থিতির সামাল দেওয়া সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং জেলা সীমানা বরাবর শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থান বা অবস্থানগত যে ফারাক রয়েছে তার মাপ বা পরিমাপের বিষয়টি কম বা বেশি মাত্রার হতে পারে। অন্যদিকে জেলা ভেঙে রাজ্য পর্যায়ে শৌচাগারের চাহিদাপূরণের পার্থক্যটা সহজেই নজরে পড়ে। ভারতের বর্তমান প্রশাসনিক সীমানা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক এবং তা পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকারই সম্ভাবনা বেশি। তাই শৌচাগার ব্যবহারের সংখ্যা বা মাত্রা সাংস্কৃতিক দিক থেকে বা চাহিদার তারতম্যের দিক থেকেই ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যে সমস্ত নাগরিক রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের সীমানা ছাড়িয়ে এর সঙ্গে যুক্ত তাদের নিরিখেই এই পরিমাপ সম্ভব।

পরিশেষে, শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থান ও অবস্থানগত যে বিভেদ তা থেকে কোন জেলায় কীরকম অগ্রগতি, হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে। TSC সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যপুস্তক থেকে যা জানা গেছে তা হল, জেলা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সহায় সম্পদ বণ্টনের ওপর শৌচাগারের চাহিদা পূরণ এবং তা ব্যবহারের বিষয়টি নির্ভরশীল। তবে যে কোনও জেলা সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা এবং এ সম্পর্কিত অভিযান জোরদার করে তোলার মাধ্যমে শৌচাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারে। কোনও একটি জেলা এ ব্যাপারে অগ্রগতির নজির সৃষ্টি করলে তা থেকে উৎসাহিত হবে সন্নিহিত অন্যান্য জেলাগুলিও। সন্নিহিত ও নিকটবর্তী জেলাগুলির এই যে উন্নয়নের সম্পর্ক তা কোনও একটি রাজ্যের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। অন্যদিকে এ সম্পর্কিত নীতি রচয়িতারা পছন্দের দিক থেকে বেছে নেওয়া জেলাগুলির অনুকূলেই তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে পারেন বা প্রয়োজনীয় সহায়সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে যে ভেদ বা ফারাক দেখা যায় সে সম্পর্কে স্থান ও অবস্থানগত সম্পর্ক খতিয়ে দেখতে TSC একটি যুক্তিসংগত বাস্তব প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে দিয়েছে।

পন্থাপদ্ধতি বা মাধ্যম

২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের জেলাভিত্তিক বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার (DLHS-III) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলায় যে সমস্ত পরিবার শৌচাগার ব্যবহার করে থাকে তাদের তুলনামূলক আলোচনা এই নিবন্ধের মূল বিষয়। মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত পরিবার শৌচাগার ব্যবহার করে না, তারা প্রাকৃতিক কাজকর্মের জন্য এমন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত যেখানে বর্জ্যের মজুত বা নিষ্কাশন পদ্ধতি অপর্যাপ্ত। নয়তো তারা উন্মুক্ত স্থানে এই সমস্ত কাজকর্ম সারতে অভ্যস্ত। আরও তিনটি পৃথক তথ্যসমৃদ্ধ সমীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, যাতে ২০০১ সালের জাতীয় জনগণনা কর্মসূচি সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন এলাকার জমির পরিমাণ এবং লোকবসতি ঘনত্ব সম্পর্কে পরিসংখ্যানের হদিস মিলেছে।

স্থান ও অবস্থানগত ভেদ বা ভিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের বেছে নিতে হবে। আন্তঃজেলা

পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থান ও অবস্থানগত যে ফারাক রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েও একটি জেলার সঙ্গে আর-একটি জেলা এ ব্যাপারে কিভাবে যুক্ত, তা চিহ্নিত করে ফেলতে হবে। এই পরীক্ষানিরীক্ষা বা অনুসন্ধানের কাজে "Queen Weighting" কৌশলই সবথেকে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। কারণ কোনও জেলার ওপর নীতিনির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের প্রতিবেশী অধিবাসীদের প্রভাব থাকতে বাধ্য। তারা সীমানা বরাবরই বাস করুক বা অন্য কোনও স্থানে তাদের মধ্যে যোগসূত্র ঘটুক, এই সম্ভাবনা থাকবেই। একের সঙ্গে অপরের বৈশিষ্ট্যে মিল বা পারস্পরিক সম্পর্ক পরিমাপের ক্ষেত্রে বিশ্বস্বীকৃত 'Moran I'-এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে স্থান ও অবস্থানগত পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি পরিমাপ করা হয়। LISA হল আর-একটি পদ্ধতি, যা কয়েকটি জেলার মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মিল ও অমিলের অনুসন্ধান করে।

ফলাফল ও বিশ্লেষণ

যে সমস্ত জেলা শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই স্তর বা পর্যায়ে রয়েছে সেগুলির অবস্থান মোটামুটি কাছাকাছিই থাকে—এই সত্যটা উঠে এসেছে Moran I 0.75 থেকে, যা 0.01 পর্যায়ে খুবই তাৎপর্যময়। আবার LISA I থেকে প্রমাণিত যে সমস্ত জেলায় শৌচাগার ব্যবহারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, সেগুলিরও অবস্থান পাশাপাশি ও কাছাকাছি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এ ছাড়াও সুদূর উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও জেলাগুলির এই ধরনের অবস্থান নজর কাড়ার মতো। অন্যদিকে উত্তর-মধ্য ভাগে শৌচাগার ব্যবহারের সংখ্যা কম হওয়ায় সেগুলিরও অবস্থান সন্নিহিত জেলাগুলিতে।

স্থান ও অবস্থানগত নৈকট্য যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তা স্বীকার করে নেওয়ার পর ভৌগোলিক সম্পর্ক এক্ষেত্রে কতটা শক্তিশালী ভূমিকা নিতে পারে তার ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকেও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। মনে রাখতে হবে, শৌচাগার সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি পূর্বশর্ত হল পর্যাপ্ত জলের জোগান। তবে এক্ষেত্রে নেতিবাচক দিকটিই বিশেষভাবে নজরে এসেছে (ব্ল্যাক ও ফয়সেট ২০০৮; জর্জ ২০০৯; গাঙ্গুলী ২০০৮)। কারণ আয় বা উপার্জনগত পরিসংখ্যান ভারতে সবসময় পাওয়া যায় না। তবে মানুষের আর্থিক সংগতি বা মর্যাদা চিহ্নিত করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ (LNG) কতকগুলি পরিবারে রয়েছে তার শতাংশের হিসেবে। মানুষের এই আর্থিক সংগতিকেই শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মাপকাঠি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন ডিটন ও গ্রশ (২০১১)।

এক্ষেত্রে মাপকাঠি বিচারের আর-একটি রাস্তা হল জেলার দারিদ্র্যসীমার নীচে (বিপিএল) বসবাসকারী পরিবারগুলির সংখ্যা বা শতাংশের হারকে ভিত্তি ধরে। বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারগুলিকে বিপিএল কার্ড দেওয়া হলেও এই ব্যবস্থায় ত্রুটি বা গলদ থেকে যেতে পারে (বেস্‌লে, ২০১১)। তাই শৌচাগার ব্যবহারের সঙ্গে বিপিএল কার্ড ব্যবহারের বিষয়টি যুক্তিসংগত হবে না। কোনও জেলার মোট ভূখণ্ড ও বসবাসের ঘনত্বকে নগরায়ণের একটি মাপকাঠি বা ভিত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তবে এ সম্পর্কে মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিন্তু কোনও সমতা নেই। কারণ অপেক্ষাকৃত বড় বড় শহরগুলিতেই অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠির ভিত্তিতেই শৌচাগার ব্যবহারের মাত্রা সম্পর্কে একটা দিশার হদিস পাওয়া সম্ভব। কারণ মোটামুটিভাবে ব্যয়সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই সমস্ত অঞ্চলে বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। যে সমস্ত অঞ্চলে মানুষের আয় বা উপার্জন খুবই কম সেই সমস্ত স্থানে নিকাশি বা নিষ্কাশন ব্যবস্থা সফল ও কার্যকর করতে ব্যয়ের মাত্রা অনেক গুণ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, ঘনবসতি এলাকায় প্রাথমিক শৌচাগার প্রযুক্তি সংস্থাপনের পথে বাধা বা অন্তরায়ও রয়েছে প্রচুর (মারা ও ইভানস্, ২০১১)। তাই জনবসতির ঘনত্ব এবং শৌচাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের একটি সীমারেখা টানার কাজ নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য।

উপসংহার

এই নিবন্ধকে যদি একটি বীক্ষণ বা সমীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তা হল শৌচাগার ব্যবহারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলার ওপর নির্ভর করে। সেইসঙ্গে এটাও পরিষ্কার যে, যে সমস্ত জেলা শৌচাগার ব্যবহারের দিক থেকে একেবারে পিছনের সারিতে, সেই সমস্ত অঞ্চলে পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুমৃত্যুর হার অনেক অনেক গুণ বেশি। এ ছাড়াও, আর্থসামাজিক মাপকাঠির হিসাব ছাড়াও এবং রাজ্যে সাফল্যের হারের তারতম্য তথা TSC-এর কাজকর্মের বাইরেও আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্থান বা অবস্থানগত ভিন্নতা।

সমীক্ষা ও গবেষণার ফলাফল থেকে যে চিত্রটি আমরা তুলে ধরতে পারি তা হল, স্থান ও অবস্থানগত দিক বা প্রবণতার বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট জেলা, শহর বা তহশিল এবং কৃষি জলবায়ুর ভিন্নতা বা সাদৃশ্যের নিরিখে খতিয়ে দেখতে পারি। এই প্রসঙ্গে আর-একটি সত্য ঘটনা হল যে, শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেলার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও TSC কর্মসূচিটির আরও সংস্কার ও সংশোধন প্রয়োজন।

আলোচনা বা বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে কৃষি জলবায়ু অঞ্চলকে চিহ্নিত করে শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। রাজ্য পর্যায়ের বিশ্লেষণে হয়তো ভারতের অঞ্চল ভেদে সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ ও প্রথার বিষয়টি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। তবে এ কথা সত্য যে, শহরাঞ্চলে শৌচাগার ব্যবহারের হার বা মাত্রা গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। তবে সেইসঙ্গে এটাও সত্যি যে পর্যাপ্ত শৌচাগার ও অনাময় ব্যবস্থা সুলভ হলেও অনেক শহর এলাকাতেই তার যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় না। এই কারণে শহরাঞ্চলেও স্বাস্থ্য সময়ে সময়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে।❑

[লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের UCLA Luskin School of Public Affairs-এর সঙ্গে যুক্ত।
email: gspierce@ucla.edu]

ভারতীয় শহরাঞ্চলে অনাময়

বিকাশের উপাখ্যানের উলটো দিক

দেশের শহরগুলিতে সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ভাবনা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই। তবুও কেন আশানুরূপ অগ্রগতি হল না, বিভিন্ন সরকারি নীতি ও প্রকল্পের বিশ্লেষণ করে তার উত্তর খুঁজেছেন **তৃষা আগরওয়ালা।** *সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা তুলে ধরার পাশাপাশি এই নিবন্ধে রয়েছে সম্ভাব্য সমাধানের ইঙ্গিত।*

কেবল অর্থনৈতিক মাপকাঠিই নয়, কোনও দেশের প্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে মানবোন্নয়ন সূচকগুলিও যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা এখন সকলেরই জানা। কিন্তু চীনের পরবর্তী বিশ্বশক্তি হিসেবে যে ভারতের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে যে এই কথা খাটবে না, তা দেশের সামাজিক সূচকগুলির দুরবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। UN-IWHE-র সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে যত সংখ্যক মানুষ শৌচালয় ব্যবহার করেন, তার থেকে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি। ভারতে এখনও ৬২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ মাঠেঘাটে মলত্যাগ করেন। শৌচালয়ের সুবিধা পৌঁছায়নি, বিশ্বে এমন মানুষের ৬০ শতাংশেরই বাস ভারতে। অপ্রতুল অনাময় ব্যবস্থার জন্য ভারতের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৩৮০ কোটি ডলার, যা ২০০৬ সালে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬.৪ শতাংশের সমান (জল ও শৌচাগার কর্মসূচি, ২০০৭)। পানীয় জল ও অনাময় সংক্রান্ত মন্ত্রক ২০২০ সালের মধ্যে দেশে মাঠেঘাটে মলত্যাগ সম্পূর্ণ বন্ধ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় (২০১০ সালের জুলাই) জল ও অনাময়ের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই স্বীকৃতি একে শিক্ষা, খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকারের সঙ্গে এক সারিতে এনে দিয়েছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং উন্নত শৌচাগারের ব্যবস্থা, দারিদ্র্যদূরীকরণ ও মানবিক অধিকার আদায়ের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির সঠিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

ভারতের শহরগুলিতে অনাময় ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা থেকেই পানীয় জল এবং অনাময় সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলির রূপায়ণ শুরু হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় শৌচালয় স্থাপনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, শহরে তা পুরসভা ও রাজ্যের। কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রকে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। এটা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি, এই ক্ষেত্রের জন্য সরকারি ব্যয় শুধু যে ১ শতাংশের কম তাই নয়, ২০০৮ সালে ০.৫৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে তা হয়েছে ০.৪৫ শতাংশ।

অনাময় তাই ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির অন্যতম। দেশের শহুরে জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের কাছেই নিরাপদ অনাময়ের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়নি। মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ নাগরিক নিকাশি ব্যবস্থা ও বর্জ্য জল পরিশোধন ব্যবস্থার আওতায় এসেছেন। অথচ নগরায়ণের হার ২০০১ সালের ২৭.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে হয়েছে ৩১.২ শতাংশ (জনগণনা ২০১১)। বহু শহরেই এখনও অনেকে প্রকাশ্য স্থানে মলত্যাগ করেন। এতে পরিবেশদূষণের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কাও থেকে যায়।

শহরে অনাময় বিষয়ক নীতি ও প্রকল্পসমূহ

শহরের অনাময় ব্যবস্থার একটা সার্বিক ছবি পেতে হলে এ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কয়েকটি নীতি ও প্রকল্প সম্বন্ধে নীচে বলা হল।

★ জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর পুনর্নবীকরণ মিশন (JNNURM) :
  (ক) শহুরে দরিদ্রদের মৌলিক পরিষেবা (BSUP);
  (খ) রাজীব আবাস যোজনা (RAY);
  (গ) সংযুক্ত আবাসন বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি (IHSDP)।
★ শহুরে স্যানিটেশন নীতি, ২০০৮।
★ জাতীয় শহুরে বাসিন্দা ও আবাসন নীতি, ২০০৭।
★ সংযুক্ত কম খরচের অনাময় কর্মসূচি (ILCS)।

কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর পুনর্নবীকরণ মিশনে শহুরে এলাকায় জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো স্থাপন, শহরে বাস করা দরিদ্র মানুষের কাছে মৌলিক পরিষেবাগুলি পৌঁছে দেবার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী অনুসারে পুর কর্তৃপক্ষগুলিকে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করে তোলাও এর উদ্দেশ্য। জল সরবরাহ ও অনাময় ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলি স্থানীয় স্তরে কার্যকর করা সুশাসনের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

JNNURM-এর আওতায় থাকা শহরগুলির নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (City Development Plan—CDP) প্রস্তুত করার কথা। এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে JNNURM-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। দেখা গেছে, সব শহরই এটি প্রস্তুত করেছে, কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ে সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। এজন্য যে ক্ষমতার প্রয়োজন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে তা দেওয়া হয়নি। এটি কিন্তু ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের পরিপন্থী।

BSUP প্রকল্পে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের কাছে জল, স্যানিটেশন-সহ মৌলিক সুবিধাগুলি পৌঁছে দেবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য সম্পদ সৃষ্টি ও সম্পদ পরিচালনার মধ্যে কার্যকর সংযোগ সুনিশ্চিত করা দরকার, যাতে এই প্রকল্পগুলির জন্য অর্থের জোগানের অভাব না হয়। তবে জল ও শৌচাগার ব্যবস্থার জন্য পৃথক তহবিল গঠনের কোনও কথা এখানে বলা হয়নি।

RAY-র লক্ষ্য হল 'বস্তিমুক্ত ভারত'। বস্তিগুলিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক নাগরিক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার পাশাপাশি আরও বস্তি যাতে তৈরি না হয়, সেই গভীরতর সমস্যার মোকাবিলাতেও এই প্রকল্পের আওতায় কাজ করা হয়। সংস্কারমুখী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শহরের দরিদ্র মানুষের কাছে জল ও শৌচাগার ব্যবস্থা পৌঁছে দেবার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখানেও এজন্য পৃথক কোনও তহবিলের সংস্থান রাখা হয়নি।

নিরাশ্রয়দের মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা করতে নতুন বাড়ি নির্মাণের পাশাপাশি IHSDP-র আওতায় গোষ্ঠী শৌচাগার, স্নানাগার, নিকাশি ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলা হচ্ছে। হাতে নেওয়া হয়েছে সংকীর্ণ রাস্তা চওড়া করা এবং রাস্তায় আলো লাগানোর কাজও। সর্বাত্মক নগর পরিকল্পনাকে মূলমন্ত্র করে বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের কাজকেও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান কোথা থেকে আসবে, তা নিয়েও স্পষ্ট দিশানির্দেশ রয়েছে এখানে।

জাতীয় নগর অনাময় নীতি ২০০৮, শহুরে ভারতকে গোষ্ঠী নেতৃত্বাধীন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার লক্ষ্যে শহরগুলিকে বাসযোগ্য করে তুলতে এবং সবার কাছে শৌচাগারের সুবিধা পৌঁছে দিতে চায়। এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহারগত পরিবর্তন আনা, প্রকাশ্যে মলত্যাগ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, শহর জুড়ে সংযুক্ত অনাময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সেগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা। এখানেও এই নীতি প্রণয়নের সময়ে ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রতিটি রাজ্য নিজস্ব নগর স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা কৌশল ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ তাঁদের বসবাসের স্থান নিয়ে খুব চিন্তিত। এই ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। উচ্ছেদ হবার ভয় সর্বক্ষণ তাঁদের তাড়া করে বেড়ায়। তাঁরা যেসব এলাকায় থাকেন, সেখানে পানীয় জল ও অনাময় ব্যবস্থার সুযোগ সাধারণত থাকে না। বস্তিগুলিতে অপ্রতুল পরিষেবার জন্য সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন মহিলারা, তাঁদেরই আবার জল সংগ্রহ ও পরিবারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায়িত্ব নিতে হয়। অনাময় ব্যবস্থাপনা নীতি এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলে। কিন্তু জল ও অনাময় স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা রূপায়ণের দায়িত্বে যে বহুবিধ সংস্থা রয়েছে, তাদের মোকাবিলা কীভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে এই নীতি নিশ্চুপ।

জাতীয় শহুরে বাসিন্দা ও আবাসন নীতি ২০০৭, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ন্যায্য মূল্যে জমি, আশ্রয় ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াকে সুনিশ্চিত করতে চায়। একইসঙ্গে এই নীতি, আবাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণের কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের পক্ষপাতী। মহিলা পরিচালিত পরিবার, একক মহিলা, কর্মরতা মহিলা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা মহিলাদের জল, অনাময় ব্যবস্থা ও মৌলিক পরিষেবা দেওয়ার ওপর এই নীতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এটিই একমাত্র নীতি, যার নির্দেশিকায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চোখে পড়ে।

আবাসন ও দারিদ্র্যদূরীকরণ মন্ত্রক শহর এলাকার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যে ILCS নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল খাটা পায়খানাগুলিকে পাকা শৌচালয়ে রূপান্তরিত করা এবং নতুন শৌচাগার নির্মাণ করা। এর মাধ্যমে শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন তো হবেই, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ যেটা, তা হল, মাথায় করে মলবহনের অমানবিক প্রথা বিলুপ্ত হবে।

নীতি ও প্রকল্পগুলিতে অনাময় ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বারবার বলা হলেও প্রকল্পগুলির টাকার জোগান কীভাবে হবে, তা স্পষ্ট নয়। ILCS একমাত্র কর্মসূচি, যেখানে বরাদ্দকৃত অর্থ চিহ্নিত করা যায়। সারণি-১-এ দেখানো হয়েছে এই বরাদ্দ অত্যন্ত কম, চলতি বছরে তা আরও কমানো হয়েছে। এই তথ্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশে এখনও ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার খাটা পায়খানা আছে, যেখান থেকে মাথায় করে মল বহন করা হয়।

নগর অনাময় স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা নীতি ও ILCS ছাড়া অন্য কোনও নীতি বা প্রকল্পে জল সরবরাহ ও অনাময় ব্যবস্থার কথা সরাসরি বলা হয়নি। সবসময়ই এগুলিকে জুড়ে দেওয়া হয় দরিদ্রদের জন্য আবাসন অথবা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির সঙ্গে।

সারণি-১
ILCS কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫
			BE	**RE**	**BE**	**RE**	**BE**
৫৫	১০৬.০১	৬৯.৭৬	২৫	১০০	১২৫	২২	৫

সূত্র : ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট, খণ্ড-২।

নগরদারিদ্র্য ও অনাময় ব্যবস্থা

নগরদারিদ্র্যের নগ্ন রূপ দেখা যায় শহরের বস্তিগুলিতে। সেখানে পরিচ্ছন্নতার হাল কেমন, তা সারণি-২ থেকে স্পষ্ট হবে। বস্তিগুলিকে নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত, এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

অনাময় সমস্যার মোকাবিলায় নগর কর্তৃপক্ষ, গোষ্ঠীগুলি এবং বেসরকারি সংগঠন কীভাবে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে, তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী তার এক চমৎকার নিদর্শন। বস্তিবাসীরা এখানে গোষ্ঠী পরিচালিত শৌচালয় ও স্নানাগার ব্যবহার করেন (Water Aid India, 2008)।

বস্তুতপক্ষে বস্তিগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্পন্ন করে তুলতে কিন্তু বিপুল অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। এর জন্য দরকার বস্তিবাসীদের সমস্যার প্রতি নগর কর্তৃপক্ষের সংবেদনশীল মনোভাব, তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, কাজের প্রতি গোষ্ঠীগুলির নিষ্ঠা এবং বেসরকারি সংগঠনগুলির সহায়তা। শৌচাগারগুলি গোষ্ঠী পরিচালিত হওয়ায় এর মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং গোষ্ঠী উন্নয়নের কাজেও গতি আসে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র (IDRC) জাগরী এবং Women in Cities International-এর মাধ্যমে একটি সমীক্ষা করেছিল। সমীক্ষার বিষয় ছিল, 'এশীয় শহরগুলিতে জল ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার ও সুবিধা (২০০৯-১১)'। এতে দেখা গেছে, ২০১১-১২ সালে দিল্লি সরকার, জে.জে. কলোনির বাসিন্দাপিছু

সারণি-২
বস্তিগুলিতে পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত প্রধান কয়েকটি মাপকাঠি
(শতাংশের হিসাবে)

মাপকাঠি	নথিভুক্ত বস্তি	অনথিভুক্ত বস্তি
শৌচাগারের কোনও ব্যবস্থা নেই	১৬	৪২
নিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই	১১	৪৫
জঞ্জাল অপসারণের কোনও ব্যবস্থা নেই	১১	৩৮

সূত্র : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ৬৯তম রাউন্ড।

২০১১-১২ সালে জল সরবরাহের জন্য মাত্র ৩০ টাকা এবং শৌচাগারের জন্য ৮০ টাকা খরচ করেছে। জল সরবরাহ ও অনাময় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে দিল্লিতে বহু সংস্থা থাকায় কারোরই কোনও দায়বদ্ধতা নেই। অর্থবরাদ্দের এই দুরবস্থা বুঝিয়ে দেয়, সমস্যার মোকাবিলায় রাজনৈতিক সদিচ্ছার কতটা অভাব।

উপসংহার

ভারতের বিকাশ উপাখ্যান, অনাময় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে এসে থমকে যায়। বস্তির জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলায় জল ও অনাময় ব্যবস্থার মতো মৌলিক পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। শৌচালয় অনাময় ব্যবস্থাপনার একটি অংশমাত্র। এ ছাড়াও রয়েছে নিকাশি ব্যবস্থা, জলীয় ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। সবক্ষেত্রেই নগর কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

বস্তিগুলিতে সুষ্ঠু ও নিরাপদ অনাময় ব্যবস্থাপনা চালু করা গেলে সবথেকে বেশি সুফল পাবে শিশু ও মহিলারা। 'অনাময়ের অধিকার' নিয়ে খুব বড় পরিসরে ধারাবাহিক প্রচারাভিযান চালানো দরকার। মাথায় করে মল বহনের জঘন্য অমানবিক প্রথা যাতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। অনাময় ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগাতে হবে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তিকে।

অনাময় ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলিকে আরও অর্থপূর্ণ করে তুলতে বস্তিবাসীদের জমির অধিকার, জীবিকার সুযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপরও জোর দিতে হবে (পাণ্ডা ও আগরওয়ালা, ২০১৩)। প্রকল্পগুলিতে যথাযথ অর্থবরাদ্দ এবং এগুলির কার্যকর রূপায়ণ একান্ত আবশ্যক। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বহু কোটি টাকার যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা করেছে, তা অত্যন্ত সন্তোষজনক এক পদক্ষেপ। অনাময় ব্যবস্থাপনাকে আমরা একটা 'নোংরা' শব্দ বলে দূরে সরিয়ে রাখবে, না কি এটি দেশের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হবে— একমাত্র সময়ই তার উত্তর দেবে।❑

[লেখক গবেষক।
email: trisha14@gmail.com]

WBCS-2013 : Gr. A/B/C/D INTERVIEW

The Final Step to Enter Your Dream World
Think Before You Leap...

সুসন্নিবদ্ধ জ্ঞান আর প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব—এই হলো ডব্লুবিসিএস অফিসারদের যোগ্যতার মাপকাঠি। অভিনন্দন, আপনারা প্রথম ধাপে সফল হয়েছেন। এইবার যেটুকু বাকী রইল সেটা কিন্তু বই পড়ে পাওয়া যায় না,—সেটা হলো চলায়, বসায়, ওঠায়, কথায় কীভাবে বিনয় ও আত্মবিশ্বাসের আভা ছড়ানো যায়,—সেই রহস্যকে আত্মস্থ করা,—ইংরাজীতে যাকে বলে **'grooming'**। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর এই ক্ষেত্রে সাফল্যের হার বিস্ময়কর! বিশেষজ্ঞরা সযত্ন প্রশিক্ষণে হাতে কলমে গড়ে তোলেন প্রার্থীদের। মক ইন্টারভিউ আর গ্রুমিং সেশনে নিখুঁত হয়ে ওঠে তারা। সাক্ষাৎকারের দিন সমাসন্ন,—প্রয়োজন এখন প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তের সদ্ব্যবহার। যোগ্য, সফল, ডব্লুবিসিএস দিগন্তে প্রোজ্জ্বল এক ঝাঁক নক্ষত্রতুল্য ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যের শাণিত করুন নিজেকে। হয়ে উঠুন আমাদেরই আরো একজন। পূর্বসূরীরা কী বলছেন পড়ে নিনঃ

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে আমি শিখেছি এই ধরনের ইন্টারভিউ-এর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। কতখানি সৎ ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে নিজের বক্তব্যকে উপস্থিত করা যায়, কীভাবে অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনে নিজের ধৈর্য ধরে রাখতে হয় এবং সর্বোপরি প্রশ্নকর্তার সঙ্গে বাদানুবাদে না গিয়েও কীভাবে নিজের যুক্তিতে দৃঢ় থাকতে হয়। এখানে ভিডিও রেকর্ডিং-এর সাহায্যে এও দেখানো হয়, ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় আমাদের শারীরিক ও বাচনভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত। একটার পর একটা মক ইন্টারভিউ দিয়ে আমি আমার খুঁতগুলোকে সংশোধন করেছিলাম। — **অভিষেক রায়**, ডিএসপি-২০১০

One can tide over the written test by dint of diligence, consistency and guidance. But to win the laurels finally one has to be groomed properly and this can be achieved only by the beacon of the wise. This fortunately, I have derived from my alma mater– Academic Association. – **Tapan Sarkar**, Executive-2012

ইন্টারভিউতে কল পাওয়ার পরই সাফল্যের ব্যাপারে একবগ্গা হয়ে উঠি। চাকরিটা আমার চাই-ই, এই অ্যাটিটিউড নিয়ে প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সব সময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করেছি, ভয়-ভীতিকে মাথাচাড়া দেবার সুযোগ দিইনি। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে সদ্য পাশ করা ডব্লুবিসিএস, গ্রুপ-'এ' এবং 'বি' অফিসারদের কাছ থেকে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ টিপস পেয়ে খুব উপকৃত হয়েছি। তাঁদের সামনে বার বার ইন্টারাভিউ দিয়ে এক দিকে যেমন নিজের ভুল ত্রুটি শুধরে নিতে পেরেছি, অপর দিকে তেমন ভরপুর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। যথেষ্ট ইম্প্রেসিভ ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য নিজের প্রস্তুতির পাশাপাশি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর গ্রুমিং ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। —**শালিনী ঘোষ**, ডিএসপি-২০১২

প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আমার স্ট্রেস ইন্টারভিউ হয়েছিল। বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল যেগুলির উত্তর আমি দিতে পারিনি, তাই বলে আমি ঘাবড়ে যাইনি। মানসিক স্থিরতার সাথে সাথে মাথাটাকে ঠাণ্ডা রেখেছিলাম আর অপেক্ষা করেছিলাম আমার কমফোর্ট জোনের প্রশ্নের জন্য। এসবই আমি করতে পেরেছিলাম অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন -এর সৌজন্যে। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এ বারংবার মক ইন্টারভিউ মনের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল সঠিক মাত্রার আত্মবিশ্বাস, এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই রচিত হয়েছে আমার সাফল্যের বুনিয়াদ।

—**চিত্তজিৎ বসু**, এক্সিকিউটিভ-২০১২

I ought to mention about Academic Association. It's Mock Interview Test and lectures not only helps me breaking the ice,identifying my strengths and weaknesses & corrects them, developed the speaking skills, handling of adverse situations in the interview board etc. but also facilitated interaction with some previous champions of WBCS from whom I learnt a lot.

– **Kunal Barnabas**, DSP-2011

সত্যি কথা বলতে কি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর ইন্টারভিউ কোচিং পদ্ধতি আমার চোখ খুলে দেয়। এখানকার ইন্টারভিউ-এর প্রত্যেকটি সেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিডিও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট-এর মক ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। এছাড়াও প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট-এর স্ট্রং এবং দুর্বল পয়েন্টগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মক ইন্টারভিউ-এর সময় এখানে বিগত বৎসরের ডব্লুবিসিএস টপার-এর সামনে মক ইন্টারভিউ দেওয়া আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের চিন্তাভাবনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ রূপায়ণ সত্যিই প্রশংসনীয়। — **সংলাপ ব্যানার্জি**, এক্সিকিউটিভ-২০১১

ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতিটাই আসল। ইংরাজিতে কথা বলার দুর্বলতা থাকলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সর্বদা টু দ্য পয়েন্ট উত্তর দিতে হবে। চালাকি না করে সরাসরি সত্যি কথা বলা দরকার। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এ বার বার মক ইন্টারভিউ দিয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি রপ্ত করা ছাড়াও আমার ইংরাজির প্রতি ভীতি কেটে যায়, ফ্লুয়েন্টলি ইংরাজিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করি। বায়োডাটার বিভিন্ন প্রশ্ন কিংবা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বিশ্লেষণাত্বক বেশ কিছু প্রশ্ন আমি কমন পেয়ে যাই—যার ফলশ্রুতি আমার গ্রুপ-'এ' তে সিলেকশন। ---**সুরজিত কুমার রায়**, ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই-২০১২

প্রিলিম-২০১৫ মক টেস্ট

আপনি কি ডব্লুবিসিএস-২০১৫ প্রিলি পরীক্ষায় বসছেন? আপনার প্রস্তুতি সঠিক পথে চলছে কিনা তা জেনে নেওয়া একান্তই জরুরি। বারংবার মক টেস্ট দিয়ে নিজের ভুলগুলো শুধরে নিন, আর নিজের নেট স্কোরকে রাখুন কাট অফের ওপরে। একমাত্র আমাদেরই সুপরিকল্পিত এবং স্ট্যান্ডার্ড মক টেস্টগুলি পারে এ বছর আপনার প্রিলির বাধাকে অতিক্রম করাতে। মক টেস্ট প্যাকেজে থাকছে—

- ☑ ১০-১২টি ২০০ নম্বরের হুবহু প্রিলির অনুরূপ মক টেস্ট।
- ☑ প্রতিটি মকটেস্টের পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল।
- ☑ সাফল্যের টিপস সংক্রান্ত স্পেশাল ক্লাশ।
- ☑ নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণ, আপশন নির্ণয়ের ওপর স্পেশাল ক্লাশ।
- ☑ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ নোটস।
- ☑ ৬০টিরও বেশি ক্লাশ টেস্ট।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

9830770440

9674478644

Website : www.academicassociation.in ▪ Centre : Uluberia-9051392240 • Birati-9674555451 • Darjeeling-9832041123

অপুষ্টি, অপরিচ্ছন্নতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সারা বিশ্বে শৌচাগারের অভাবে খোলা মাঠে মল-মূত্র ত্যাগ, পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব ও প্রসবকালীন সুচিকিৎসার অভাবের কারণে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। আর সেই সমস্ত সমস্যা শুধুমাত্র দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যেই সীমিত নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সব শ্রেণীর মানুষ। সেইসঙ্গে মহিলাদের প্রতি অযত্ন, অবহেলা ও কন্যাসন্তানদের প্রতি অনীহাও এর অন্তর্ভুক্ত। দেখা যায় নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, যা অর্থনীতিকে ব্যাহত করে। সমাজে দেখা দেয় নানাবিধ সামাজিক রোগ এবং শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি—এর নিদান কী? লিখছেন **মিতালি পালধি।**

গত এক দশকে আমাদের দেশ অর্থনীতির দিক থেকে যথেষ্টই উন্নতি করেছে। প্রতি বছর আর্থিক বিকাশের গড় হার প্রায় ৮ শতাংশ। এই উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহাকাশযাত্রা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সামগ্রিক উন্নতির নির্দেশক হিসেবে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানের দিক থেকে পৃথিবীর অনেক পিছিয়ে পড়া অনুন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, আমাদের অবস্থান ঠিক কোথায়! অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল সমানভাবে পৌঁছায়নি সমাজের বহু মানুষের কাছে। অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি আজও আমাদের দেশের মানুষ, বিশেষত, শিশু ও মহিলাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত, যে কোনও দেশের বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন মানবসম্পদের উন্নয়ন, যা তার আর্থিক সমৃদ্ধির ভিত্তি। দীর্ঘকালীন অপুষ্টি, মানবসম্পদের সঠিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি, খাদ্য সুরক্ষা, গণবণ্টন ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত স্তরে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও শিশু ও মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টির দীর্ঘস্থায়ী প্রকোপ আমাদের অবাক করে। এমনকি অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল পরিবারের সদস্য বিশেষত, শিশুরাও এর শিকার। আমাদের অনেক প্রতিবেশী দেশ এমনকি, আফ্রিকার অনেক অনুন্নত দেশ, যেমন—কঙ্গো, জিম্বাবোয়ে বা সোমালিয়ার তুলনায় দেশবাসীর পুষ্টির মানের নিরিখে পিছিয়ে রয়েছি আমরা। বিশ্বের ৩টি অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুর মধ্যে একটি বাস করে ভারতে।

খুব সংগত কারণেই প্রশ্ন জাগে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নানা প্রকল্প, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচিগুলি কি তাহলে সঠিকভাবে রূপায়িত করা যায়নি? অপুষ্টি দূর করতে বা সুস্বাস্থ্যের ভিত গড়তে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি কি ঠিকভাবে সর্বস্তরের মানুষের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না! নাকি মানুষের মধ্যে এসব পরিষেবা গ্রহণ করার আগ্রহই নেই। অথচ খাতা-কলমের হিসাব কিন্তু অন্য কথা বলছে। আমাদের দেশে অপুষ্টি প্রতিরোধে রয়েছে শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম কল্যাণমূলক প্রকল্প, যাতে তাদের পুষ্টির ওপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়। এর জন্য গৃহীত হয়েছে "সুসংহত শিশু বিকাশ পরিষেবা প্রকল্প", যা সারা দেশ জুড়ে রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু, সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় পরিপূরক পুষ্টিকর আহার, প্রতিষেধক, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান নির্ণয়, পুষ্টি শিক্ষার মতো পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও গত তিন দশকে অপুষ্টির চালচিত্রের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না কেন?

ভারতে অপুষ্টির সামগ্রিক চিত্র

সাম্প্রতিক কালে ভারতের ১১২টি জেলায় Naandi Foundation-এর অপুষ্টি সংক্রান্ত HUNGAMA (Hunger & Malnutrition, Report, December 2011) সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শতকরা ৪২.৫টি পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম

সারণি-১

দেশের নাম	বয়সের তুলনায় কম ওজন (Underweight) (শতাংশ)	বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা (Stunted) (শতাংশ)
ভারত	৪৩	৪৮
বাংলাদেশ	৩৬	৪১
নেপাল	২৯	৪১
পাকিস্তান	৩২	৪৪
শ্রীলঙ্কা	২১	১৭
জিম্বাবোয়ে	০০	০০
কঙ্গো	১০	৩২
সোমালিয়া	১১	৩০

সূত্র : The state of world's Children 2014, UNICEF (2008-12)

(underweight)। ওই একই বয়সের ৫৯টি শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় বেশ কম (stunting) এবং ১০০টির মধ্যে ১১.৪টি শিশু বয়স অনুযায়ী খুবই রোগা (wasting)। এই সমীক্ষার ফলাফলে এটাই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের অর্ধেকই অপুষ্টিতে আক্রান্ত। ইউনিসেফের হিসাব অনুসারে (সারণি-১) প্রতিবেশী রাষ্ট্র এমকি আফ্রিকা মহাদেশের শিশুদের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতীয় শিশুরা ওজন ও উচ্চতায় বেশ পিছিয়ে আছে। 'Stunting' বা কম উচ্চতা সাধারণত chronic বা দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি নির্দেশ করে থাকে। অর্থাৎ, ভারতীয় শিশুরা acute ও chronic দু'রকমের অপুষ্টিতেই আক্রান্ত। ভারতের প্রায় ৬.৫ কোটি পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশু বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বা stunting-এর সমস্যায় আক্রান্ত। HUNGAMA রিপোর্টে এটাও প্রতিফলিত যে, কম ওজন ও উচ্চতার সমস্যা শুরু হচ্ছে শিশুদের ২ বছর বয়সের মধ্যেই। অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হলে এটা সত্যি যে, আফ্রিকার দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশ বা এশিয়ার অনেক দেশই উন্নত, কিন্তু পুষ্টির মানের ক্ষেত্রে সে

সারণি-২
বিভিন্ন দেশের তালিকা যেখানে মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে

দেশ	সংখ্যা
ভারত	৬২.৬০ কোটি
ইন্দোনেশিয়া	৬.৩০ কোটি
পাকিস্তান	৪ কোটি
নেপাল	১.১৫ কোটি
চীন	১.১৪ কোটি
ইথিওপিয়া	৩.৮ কোটি
কম্বোডিয়া	৮.৬ কোটি
নাইজেরিয়া	৩.৪০ কোটি

উৎস : WHO, Water, Sanitation & Health, 2010.

উন্নতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বিজ্ঞানীরা একে 'Asian Enigma' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সবথেকে অবাক করা তথ্য হচ্ছে, ভারতে প্রতি তিনটি কম উচ্চতার শিশুর মধ্যে একটি উচ্চবিত্ত পরিবারভুক্ত। এক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া যায়, উচ্চবিত্ত পরিবারে "খাদ্য সুরক্ষা", "জোগান" এবং "খাদ্য" তাদের "আয়ত্তের মধ্যে" থাকার মতো বিষয়গুলি নিশ্চিত। সুতরাং এই সমস্ত পরিবারে শিশুর যথাযথ যত্নের বিষয়টিও সুনিশ্চিত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অপুষ্টির কবল থেকে শিশুরা মুক্তি পাচ্ছে না। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব মতো ভারতে প্রতি বছর ২১ লক্ষ শিশু তাদের পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা যায় এবং সংক্রমণ ও অপুষ্টি এইসব মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। কম উচ্চতার (stunted) শিশুদের মৃত্যু হারও যথেষ্ট বেশী। পাঁচ বছরের কমবয়সি ১০ লক্ষ শিশু প্রতি বছর মারা যায়, যাদের উচ্চতা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। কম উচ্চতা নিয়ে যেসব শিশু বেঁচে থাকে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় নানা অসুখে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা যেমন বেশি থাকে, তেমনই এদের বৌদ্ধিক বিকাশও যথাযথভাবে হয় না। এমনকি এদের কর্মক্ষমতাও কম হয়। সাধারণত শিশুর দৈহিক উচ্চতা কম হলে ভবিষ্যতে এদের মধ্যে নানা ক্রনিক অসুখ, যেমন—উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কাও বেশি থাকে।

আসলে পুষ্টির বিষয়টি যেমন জটিল, তেমনই বহুমাত্রিক। শুধুমাত্র পুষ্টিকর আহার, পরিবারে খাদ্য সুরক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতা, শিক্ষা, প্রতিষেধক, চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ ইত্যাদি অপুষ্টি প্রতিরোধে সক্ষম নয়। ২০০৯-১০ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, গ্রামে শতকরা ৯৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে প্রায় সমসংখ্যক মানুষই দুবেলা পেট ভরে খেতে পান, তবে পরিমাণগতভাবে ঠিক হলেও গুণগত মানের দিক থেকে তা কতটা সঠিক সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ শতাংশে নেমে এলেও অপুষ্টিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা তেমনভাবে হ্রাস পায়নি। বহুদিন ধরে পৃথিবীব্যাপী অপুষ্টির রহস্য ভেদ করার জন্য নানা দেশে নানা গবেষণা চলছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিক পুষ্টির বিষয়টি শুধুমাত্র খাওয়ার (তা পরিমাণ বা গুণগত মানের দিক থেকে যথেষ্ট হলেও) ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সেই খাবারের পুষ্টি উপাদানগুলি শরীরে কীভাবে সদ্ব্যবহার হচ্ছে, তার ওপর।

ভারতীয় শিশুদের দীর্ঘকালীন অপুষ্টির জন্য শুধু খাদ্যের অভাবই দায়ী নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যথাযথ স্যানিটেশন ও দূষিত পানীয় জলের কারণে প্রায় সময়েই শিশুদের ক্ষুদ্রান্ত্রে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া, পরজীবীর সংক্রমণ হয়ে থাকে। ফলে শিশুর ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পুষ্টি উপাদানগুলির শোষণ ব্যাহত হয়। এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালেও পুষ্টির অভাব হয়েই থাকে। এটা আজ প্রমাণিত যে, অপুষ্টির সঙ্গে সংক্রমণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। শরীরে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হলে অনেক ক্ষেত্রেই খুব সংগত কারণে সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকে এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানগুলি, যেমন—প্রোটিন ও ক্যালোরির। সুতরাং এ অবস্থায় প্রোটিন ও ক্যালোরির মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি শরীরের গঠন ও বৃদ্ধির কাজে না লেগে, অ্যান্টিবডি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে শিশুর শারীরিক ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। জন হপকিন্‌স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের জীন হামফ্রের মতে, যখন এ ধরনের সমস্যা শিশুর জন্মের প্রথম দু-বছরের মধ্যে হয় তখন তা শিশুর ওজন ও উচ্চতা এবং মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই ক্ষতি অপূরণীয়।

অপরিচ্ছন্নতা ও অপুষ্টি

অপুষ্টি সংক্রান্ত নানা সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে, ভারতীয় শিশুদের ক্রনিক অপুষ্টি, বিশেষত কম উচ্চতাসম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ১৬ কোটির ওপর পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার জন্য দূষিত পানীয় জল, পরিচ্ছন্নতার অভাব ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী এবং এই কারণে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয় আমাদের দেশে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, যথাযথ

স্যানিটেশনের অভাবে শিশুর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি থাকলেও সবসময় সে কারণে বাহ্যিকভাবে কোনও রোগলক্ষণ (অন্ত্রের রোগ ইত্যাদি) প্রকাশ নাও পেতে পারে।

ভারতীয় শিশুদের উচ্চতা ও অন্যান্য অপুষ্টির বিষয় সম্পর্কিত গবেষণায় (ডীটন ২০০৭, তারোজি ২০০৮, জয়চন্দ্রন অ্যান্ড পান্ডে ২০১৩) দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবই অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলি তৈরি করে। হামফ্রে (২০০৯) দেখিয়েছেন, দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য মলমূত্রাদিতে থাকা নানা ধরনের জীবাণুর (মল সংক্রমণঘটিত বা এফ টি আই) দ্বারা সংক্রমিত হয় শিশুরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ সালে ভারতে ২৪ কোটি শিশুকে মানুষের মলমূত্রাদিতে মিশে যাওয়া নানা ধরনের পরজীবী, যেমন—জিয়ার্ডিয়া, অ্যাসকারিস, হুককৃমির (যা অন্ত্র থেকে রক্ত শোষণ করে) প্রতিরোধে প্রতিষেধক কিমোথেরাপি দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা বা অপ্রতুল স্যানিটেশনের জন্য যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো enteropathy। খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের কারণে যেসব অসুখে মানুষ আক্রান্ত হয় তা হল ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি, পোলিও, কলেরা, হেপাটাইটিস, টাইফয়েড ইত্যাদি)। এসবের জীবাণু অন্ত্রে বাসা বাঁধার ফলে পুষ্টি উপাদানের শোষণ ব্যাহত হয়। এর ফলে খাদ্যের অনুপুষ্টি (micronutrients) উপাদানগুলি ঠিকভাবে শোষিত না হওয়ার জন্য যে সমস্যা আমাদের রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে তা হল রক্তাল্পতা। ৩ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে ৭০ শতাংশই রক্তাল্পতার শিকার, যা শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

অপুষ্টি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র খাদ্যের অভাব নয়, ভারতীয় শিশুদের কম উচ্চতার মতো অপুষ্টিজনিত সমস্যা তৈরি হচ্ছে মলমূত্রে থাকা নানা জীবাণু দ্বারা জল ও পরিবেশদূষণের কারণে। সঠিক স্যানিটেশন বিধি পালন না করার জন্য আরও একটি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। প্রতি বছর ডায়ারিয়ার কারণে প্রায় ২,১২,০০০ টি পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশু মারা যায়। বারবার ডায়ারিয়া যেমন শিশুর শরীরে জলশূন্যতা তৈরি করে, তেমনই নানা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব ও তৈরি হয়। ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৫০ শতাংশ অপুষ্টি হয় ঘনঘন ডায়ারিয়া, অন্ত্রে কৃমি বা অন্যান্য FTI সংক্রমণের জন্য এবং এর জন্য দায়ী হল দূষিত জল, যথাযথ স্যানিটেশনের অভাব ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডীন স্পীয়ার্স তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ভারতে খোলা জায়গায় মলত্যাগ ও তদ্‌জনিত দূষণ শিশুদের 'কম ওজন' ও 'কম উচ্চতার'-র জন্য বহুলাংশে দায়ী। স্পীয়ার্স আরও বলেছেন যে, ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় যেখানে মানুষ শৌচাগার ব্যবহার করেন না, সেইসব এলাকায় সংক্রমণজনিত শিশুমৃত্যুর হার বা শিশুদের কম "উচ্চতাসম্পন্ন" হওয়ার হার যথেষ্ট বেশি। প্রকৃতপক্ষে শিশুর উচ্চতার বিষয়টি অনেকাংশেই নির্ভর করে তার বংশগতি, জিনগত কার্যক্ষমতা, শৈশবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানের ওপর, যা তাকে বংশগতি অনুসারে স্বাভাবিক উচ্চতায় পৌঁছতে সাহায্য করে। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে শিশুর সঠিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যথাযথ পুষ্টি ও সুস্থ পরিবেশের কারণে শিশু তার বংশগতির ধারা অনুযায়ী, বয়সানুযায়ী সঠিক উচ্চতা পায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে, "নীট পুষ্টি", কম হওয়া নানা অসুস্থতা ও সর্বোপরি যথাযথ স্যানিটেশনের অভাবে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ভারতের মতো জনবহুল দেশ, যেখানে জনঘনত্ব অনেক বেশি, সেখানে শিশুদের বৃদ্ধি, এমনকি বৌদ্ধিক বিকাশও ব্যাহত হয় খোলা জায়গায় মলত্যাগ ও তদ্‌জনিত সংক্রমণের কারণে।

২০০৪-০৫ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ও ২০০৫-০৬ সালের NFHS(iii) সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, ভারতে অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হল যথাযথ স্যানিটেশনের অপ্রতুলতা এবং পানীয় জল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব। ২০১২ সালে ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি যুগ্ম সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ সালে সারা পৃথিবীতে ১৫ শতাংশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১৯ শতাংশ মানুষ কোনও রকম শৌচাগার ব্যবহার না করে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে থাকেন। এ বিষয়ে ভারতের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। ২০১১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ৫৩ শতাংশ পরিবার

ভারতে ও প্রতিবেশী দেশে খোলা জায়গায় মলত্যাগের চিত্র

- ৫৩ শতাংশ পরিবার খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন। (জনগণনা-২০১১)
- বাংলাদেশে মাত্র ৪ শতাংশ, নেপালে ৩৫ শতাংশ ও পাকিস্তানে ২৩ শতাংশ মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন। (DHS-২০১১)
- ভারতে গ্রামাঞ্চলে ৮৯ শতাংশ বাড়িতে কোনও শৌচাগার নেই। (জনগণনা-২০১১)
- সারা পৃথিবীতে যত মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন তার ৬০ শতাংশের বাস ভারতে। (ইউনিসেফ/হু)

অর্থাৎ ৬০ কোটিরও বেশি মানুষ কোনও শৌচাগার ব্যবহার করেন না, খোলা জায়গায়,

সারণি-৩
ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে খোলা জায়গায় মলত্যাগের চিত্র (Census 2011)

রাজ্য	গ্রাম (শতাংশে)	শহর (শতাংশে)
কেরল	৫.৬	১.৭
মণিপুর	১২.৩	২.৩
মিজোরাম	০.৯	১২.৯
সিকিম	১৪.৯	২.২
ত্রিপুরা	১৫.৪	১.৩
গোয়া	২৭.৪	৯.৫
পঞ্জাব	২৮.১	৫.৪
হিমাচলপ্রদেশ	৩২.৫	৬.৯
অসম	৩৮.৫	৫.০
হরিয়ানা	৪২.৩	৮.৮
অরুণাচলপ্রদেশ	৪৪.৩	৬.৭
উত্তরাখণ্ড	৪৫.০	৪.৭
পশ্চিমবঙ্গ	৫১.৩	১১.৩
তামিলনাড়ু	৭৩.৩	১৬.২
উত্তরপ্রদেশ	৭৭.১	১৪.৪
ওড়িশা	৭৭.১	৩৩.২
ঝাড়খণ্ড	৩১.০	৭৯.৯
বিহার	৮১.৪	২৮.৯
মধ্যপ্রদেশ	৮৬.৪	২২.৫

চিত্র-১
খোলা জায়গায় মলত্যাগ, দারিদ্র্য ও অপুষ্টির সম্পর্ক

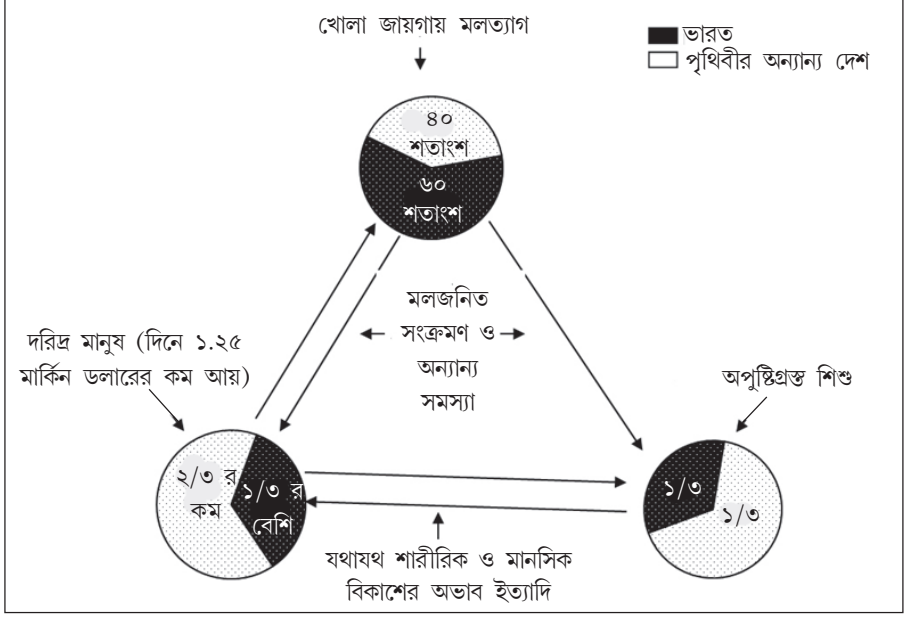

সূত্র : রবার্ট চেম্বারস, গ্রেগর ভন মেডিয়াজা (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি, ২২ জুন, ২০১৪)

'মাঠে' মলত্যাগ করেন এবং খুব লজ্জাজনক ব্যাপার হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এই বিষয়ে 'সর্বপ্রথম' স্থান আমাদের। গ্রামে ৬৯ শতাংশ মানুষ এখনও খোলা মাঠেই মলত্যাগ করে থাকেন।

এ বিষয়ে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবথেকে শোচনীয় অবস্থা বিহার এবং উত্তর প্রদেশের। সারা পৃথিবীতে যত মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন, তার মধ্যে ১২ শতাংশ উত্তরপ্রদেশের মানুষ।

২০১১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রামে মাত্র ৩০ শতাংশ বাড়িতে শৌচাগারের সুবিধা আছে। আবার ২০১২ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৪০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারগুলির নিজস্ব শৌচাগার আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রতিবেশীদের সঙ্গে শৌচাগারের সুবিধা ভাগ করে নিচ্ছেন, অর্থাৎ সেটি সাধারণ শৌচাগার। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করার ব্যাপারটি অতি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। কারণ এর ফলে মাটি যেমন দূষিত হচ্ছে, তার সঙ্গে জল ও বাতাসেও দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে। মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষের শরীর থেকে নির্গত মল-মূত্রে প্রচুর রোগজীবাণু থাকে যা আবার অন্য মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। মানুষের শরীরে প্রতি গ্রাম বর্জ্যে থাকতে পারে ১ কোটি ভাইরাস, ১০ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া, ১০০০ পরজীবী এবং ১০০ পরজীবীর ডিম।

এই সমীক্ষায় এ-ও জানা গেছে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের বহু মানুষ জানিয়েছেন যে, বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করা খরচসাপেক্ষ তাই তারা মাঠেই বা খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে থাকেন। শতকরা ৪০টি ক্ষেত্রে বাড়িতে শৌচাগার থাকলেও পরিবারের অন্তত ১ জন সদস্য 'মাঠেই' যেতে পছন্দ করেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল, যত মানুষের ওপর সমীক্ষা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অর্ধেকই জানিয়েছেন যে, খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং পুরো ব্যাপারটা তাদের কাছে বেশ উপভোগ্য। শহরে প্রায় ৬৩.৯ শতাংশ পরিবারে শৌচাগার আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই শৌচাগারগুলি ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না। খুব সংগত কারণেই এটা বলা যায় যে, শৌচাগার ঠিকমতো ব্যবহার ও পরিষ্কার করার মতো ন্যূনতম জ্ঞান না থাকার কারণে সেগুলি সংক্রমণ ছড়ানোর উৎস হয়ে ওঠে। ডীন স্পিয়ার্স-এর মতে, খোলা জায়গায় মলত্যাগ করা সবারই সমস্যা ডেকে আনছে, কেন-না ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই অভ্যাস সামগ্রিকভাবে এলাকায় পরিবেশদূষণ ছড়াচ্ছে এবং সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছোট শিশুরা। এই বিষয়টিকে স্পীয়ার্স 'Public Bad' হিসেবে অভিহিত করেছেন। স্পীয়ার্সের গবেষণায় আর-একটি তথ্য উঠে এসেছে। ভারতে শহরাঞ্চলে ধনী পরিবারের ২.৫ শতাংশ শিশু, যারা শৌচাগার ব্যবহার করে তারাও কম উচ্চতার সমস্যায় আক্রান্ত। তাদের গড় উচ্চতা অন্যান্য দেশের শিশুরা, যারা খোলা মাঠে শৌচকার্য করে তাদেরই মতো। অর্থাৎ এরা সামগ্রিক দূষণের 'spill over effect'-এর শিকার। তবে শুধুমাত্র অনাময় ব্যবস্থাই নয়, সঙ্গে দূষিত পানীয় জল পানও অপুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যদিও ২০১২ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রামে ৮৮.৫ শতাংশ পরিবারে ও শহরে ৮৯.৬ শতাংশ পরিবারে পর্যাপ্ত পানীয় জলের জোগান রয়েছে। কিন্তু জোগান এক ব্যাপার, ও সেই জল কতটা নিরাপদ সেটা আলাদা বিষয়। ল্যান্সেট-এর একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভারতে গ্রামাঞ্চলে ৬০ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৪১ শতাংশ বাড়ির জলই দূষিত। অপরিস্রুত বা অশোধিত জল পান, অপ্রতুল স্যানিটেশন ব্যবস্থা—এসবই শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখা গেছে, এইসব ক্ষেত্রে শিশুদের একই বয়সের অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় প্রায় ১ সেন্টিমিটারের মতো কম হয়। বিভিন্ন দেশের ওপর করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা তিন বছরের কমবয়সি শিশুদের উচ্চতা ০.৮-১.৯ সেমি. পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম। চেকলেয়েত (২০১১) ও লুন (২০১২) তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, উন্নত স্যানিটেশন সম্ভবত মলমূত্রজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকে, যার জন্য অন্ত্রে পুষ্টি উপাদানগুলি সঠিকভাবে শোষিত হয়। ফলে তা শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়।

যথাযথ স্যানিটেশনের অভাবে যে শুধুমাত্র শিশুরা অপুষ্টিতে আক্রান্ত হচ্ছে তাই নয়, দেশের অর্থনীতির ওপরেও এর যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ২০১০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের জল ও অনাময় প্রকল্পের প্রতিবেদনে জানা গেছে, শৌচাগারের

অপ্রতুলতা বা শৌচাগার ঠিকমতো ব্যবহার না করার কারণে ২০০৬ সালে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি ডি পি) ৬.৪ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মাথাপিছু এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২১৮০ টাকা। অন্যদিকে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে একই কারণে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষতির মাত্রা ছিল মাত্র ১-২ শতাংশের মতো।

স্যানিটেশন ও পুষ্টির বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত না করলে পুষ্টি সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে, ভারতে অপুষ্টি প্রতিরোধে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে স্যানিটেশনের মতো বিষয়টিকে কখনোই সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও যেসব এলাকায় পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি-র মতো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, সেইসব এলাকায় কিছুটা উন্নতিও লক্ষ করাও গেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দিকটি এখনও পর্যন্ত জনগণের কাছে সামগ্রিকভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দিয়েছেন, যাতে প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার তৈরি করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু শৌচাগার সঠিকভাবে ব্যবহার করা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখার বিষয়টাও মানুষকে জানাতে হবে। বাড়ির শৌচাগার যেন ছাগলের, পোষা কুকুর, বিড়ালের 'আঁতুড় ঘরে' পরিণত না হয়।

সত্যি কথা বলতে কী, জোগানচালিত শৌচালয়ের ব্যবস্থা মানুষের অভ্যাসে উপযুক্ত পরিবর্তন বা উন্নতি আনতে পারেনি। এটা একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের মধ্যে শৌচাগার ব্যবহারের চাহিদা তৈরি করতে না পারলে অবস্থার উন্নতি করা অসম্ভব। এই চাহিদা কীভাবে তৈরি করা যাবে, তা নিয়ে নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে একেবারে গ্রাম সংসদ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভাবনাচিন্তা করতে হবে। শৌচাগার নির্মাণে সরকারি সাহায্য নিয়ে, তা তৈরি করে ব্যবহার না করা হলে, বোধ করি কিছু কঠোর সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। সত্যি বলতে গেলে এটা ঘটনা যে, অনেকের মধ্যেই সরকারি সহায়তায় শৌচাগার নির্মাণের বিষয়টি সরকারের কাছ থেকে মূলত অনায়াসে কিছু আর্থিক সহায়তা পাওয়া বা সরকারি ভরতুকি পাওয়ার জন্য, উন্নত অনাময় ব্যবস্থা বা তা ব্যবহারের জন্য নয়।

জনগণের মধ্যে খুব সাধারণ কিছু স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন—হাত ধোয়া। মলত্যাগের পরে, রান্না করা ও খাওয়ার আগে হাত ধোওয়া অনেক অসুখ প্রতিবোধ করতে পারে। WASH (Water, Sanitation ও Hygiene)-এর বিষয় সর্বত্র প্রচার করা দরকার। ইউনিসেফ-এর মতে, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো খুব সাধারণ ব্যাপার ৪৪ শতাংশ ডায়ারিয়াজনিত অসুস্থতা কৃমি সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম। এমনকি জন্মের সময় শিশুমৃত্যুর হার প্রায় ১৯ শতাংশ কমিয়ে আনা যায় যদি, যিনি প্রসব করাচ্ছেন তিনি সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রসব করান। এইসব ব্যবস্থা শুরু করা দরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে। ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা, যারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসে তাদের মধ্যে ও স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হাত ধোওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে একদিকে যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অপুষ্টি প্রতিরোধে পরিপূরক আহার ও স্কুলের দ্বিপ্রাহরিক আহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে সংক্রামক অসুখ-বিসুখও অনেকাংশ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আবার মানুষের মধ্যে জুতো পায়ে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে হুককৃমি সংক্রমণজনিত রক্তাল্পতা আমরা অনেকটাই প্রতিরোধ করতে পারবো।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং দেশকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে রাষ্ট্রসংঘের "সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য"-এ পৌঁছতেই হবে আমাদের। যদিও ২০১৫-র মধ্যে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়নের প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো খুব কঠিন। কিন্তু প্রয়াসটা চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখা দরকার, ভারতের "উন্নয়ন" যাতে সর্বতোভাবে "ভারতবাসীর উন্নতির" সমার্থক হয়ে উঠতে পারে।❑

[লেখক পুষ্টি বিশেষজ্ঞ।
email: palodhimitali@gmail.com]

বিজ্ঞপ্তি

এই সংখ্যার বিভিন্ন প্রবন্ধে ইংরেজি "স্যানিটেশন" শব্দটির অর্থ অনুযায়ী একাধিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—পরিচ্ছন্নতা, অনাময়, নির্মলীকরণ, স্বাস্থ্যবিধান ইত্যাদি। সম্পাদকমণ্ডলীর মতে সে শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা প্রয়োজন, তাই পালটানো হয়নি। পাঠক যেন বিভ্রান্ত না হন—তাই এই বিজ্ঞপ্তি।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নির্মলীকরণের ভূমিকা

কয়েকটি বিষয়

পরিচ্ছন্নতা বা নির্মলীকরণের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি জড়িত? এ-ও কখনও সম্ভব? আপাতদৃষ্টিতে কেমন সংগতিহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল, সরকারের তরফ থেকে একাধিক কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকলেও তা ব্যবহার করার মতো শিক্ষা ও সচেতনতা সবার নেই। তবু আমরা পাই 'গঙ্গাদেবীপল্লী'-র দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তে আমরা কবে উদ্‌বুদ্ধ হব? লিখছেন **ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য।**

পৃথিবীর প্রায় সব কল্যাণকামী রাষ্ট্র তার নাগরকিদের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখতে জনস্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। আর বলাই বাহুল্য যে, জনস্বাস্থ্যের অন্যতম যে দুটি ক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল, জনগণকে সুপেয় জল সরবরাহ করা এবং একই সাথে নির্মলীকরণের যথাযোগ্য সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা। একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে, পৃথিবীর প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি শিশুমৃত্যুর কারণ হল ডায়ারিয়া। দেখা গেছে যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলিতে হাসপাতালে ভর্তি অর্ধেক রোগীর ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া, চোখ ও চামড়ার প্রদাহ ও সংক্রমণ, ম্যালেরিয়া, কলেরা বা টাইফয়েড— এই সকল রোগের কারণে চিকিৎসার প্রয়োজন হচ্ছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সমস্ত রোগগুলির মূলে রয়েছে অশুদ্ধ ও অপেয় জলের ব্যবহার ও নির্মলীকরণের যথাযথ সুব্যবস্থার অভাব।

এখন দেখা যাক যে, নির্মলীকরণ বলতে কোন কোন বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার নির্দেশিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্মলীকরণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

(ক) মানবদেহের মলমূত্র ইত্যাদির নিরাপদ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের শেষে তা বর্জ্য হিসেবে নির্মোচন;

(খ) আবর্জনাদির পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া গ্রহণ;

(গ) গৃহস্থালির নোংরা জলের যথাযোগ্য নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষেত্রবিশেষে তা পুনর্ব্যবহারের উপাযোগী করে তোলা;

(ঘ) বন্যা ইত্যাদির কারণে জমা জলের যথোপযুক্ত নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) ভূগর্ভস্থ নর্দমার ময়লার উপযুক্ত সাফাই ও তার প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারযোগ্যকরণ;

(চ) শিল্পজাত বর্জ্যের সংগ্রহ ও তার যথোপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ; এবং

(ছ) মানবশরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কিছু পদার্থ, যেমন—হাসপাতালের বর্জ্য বা বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিকের নিয়ন্ত্রণে যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনাকরণ।

এ কথা এখন বহুজনগ্রাহ্য যে, কোনও দেশের জনসাধারণের সার্বিক সুস্থ থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে নির্ভর করে সেই দেশে সুপেয় জলের সরবরাহ ও যথাযথ নির্মলীকরণ ব্যবস্থার মানের ওপর। বলা বাহুল্য যে, একটি দেশ সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হবে যদি তার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী সুস্থ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল থাকে, কারণ একটি সুস্থ-সবল মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণ দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা আশা করা যায়, একজন দুর্বল, অশক্ত, রোগজীর্ণ কর্মীর কাছ থেকে সেই কর্মক্ষমতা আশা করা যায় না। পরিণামে দেশের উন্নয়ন সঠিক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে না, দেশকে বহুসংখ্যক রুগ্ন ও অশক্ত মানুষের দায়ভার বহন করতে হয়। নির্মলীকরণের কাজে ব্যবহৃত অর্থ কিন্তু আবার ঘুরপথে দেশকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মহানির্দেশক ড. মার্গারেট চানের বুদাপেস্ট কনফারেন্সে (৯ অক্টোবর, ২০১৩) বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

''ব্যাবহারিক জীবনে নীচু মানের নির্মলীকরণ ব্যবস্থা, অপরিষ্কার তথা অপরিশুদ্ধ জলের ব্যবহার এবং সার্বিক অপরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বাস্থ্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে— মানুষকে নির্জীব, নিস্তেজ ও বলহীন করে। পরিবেশের অন্য কোনও কিছুই এগুলির মতো এত ব্যাপক ক্ষতিসাধক নয়। স্বাস্থ্যের ওপর এর ফলাফল পরিমাপযোগ্য, এমনকি এর দাম হিসাব করা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, মানুষকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও উৎপাদনশীল রাখার জন্য এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য যদি এক ডলার খরচ করা হয়, তবে ওই খরচের প্রতিদান হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে সাড়ে পাঁচ ডলার ফেরত আসবে।''

নির্মলীকরণের সমকালীন বিষয়সমূহ

২০০২ সালে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের 'বিশ্ব পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন' শীর্ষ সম্মেলনে দেশের উন্নয়নে নির্মলীকরণের সবিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের যে বিপুল সংখ্যক মানুষদের মধ্যে নির্মলীকরণের ন্যূনতম মৌলিক সুবিধাগুলি পৌঁছায়নি, তার অর্ধেককে উক্ত পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা হবে। নির্মলীকরণ এবং তৎসংক্রান্ত আচার-আচরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সুবিধা পাওয়া যায়। আর এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মানুষ যদি তার প্রয়োজনের ন্যূনতম নির্মলীকরণের সুবিধা না পায় তবে সে মনুষ্যেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। তাই এ বিষয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের তার নাগরকিদের উক্ত পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আছে। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী উক্ত লক্ষ্যপূরণ সফল হলে বিশ্বের প্রায় ১৪৭ কোটি মানুষ (পৃথিবীর মোট

জনসংখ্যার ২০ শতাংশ) উপকৃত হবে এবং সুষ্ঠু নির্মলীকরণ ব্যবস্থার সুবাদে বার্ষিক প্রায় ৬৫০০ কোটি মার্কিন ডলার (টাকার অঙ্কে প্রায় ৩,৯০,০০০ কোটি) অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করা সম্ভব হবে।

বিগত দশকের মাঝামাঝি একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে, এশিয়ার এক বিশাল সংখ্যক মানুষ পানীয় জল ও উপযুক্ত নির্মলীকরণ ব্যবস্থার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। হিসেবে প্রকাশ যে, এশিয়ার প্রায় ৭১ কোটি মানুষ সুপেয় জল পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং প্রায় ১০৯ কোটি মানুষ উপযুক্ত নির্মলীকরণ পরিষেবার বাইরে আছেন। এশিয়া মহাদেশের অন্যতম এক বৃহৎ দেশ ভারতবর্ষও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় এই উপমহাদেশের বিশাল সংখ্যক মানুষকে যদি সুস্থ, সবল ও নীরোগ হিসেবে নবজন্ম দান করতে পারা যায়, তবে ভারতে উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের এক ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা যাবে। এর পরিণতিতে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটবে। একবিংশ শতাব্দীতে এই মানব সম্পদের সম্যক ব্যবহার ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাই এক বড় চ্যালেঞ্জ।

নির্মলীকরণ ও সামাজিক উন্নয়ন

এ কথা জানা আছে যে আমাদের দেশে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়। উক্ত সংশোধনী আইনের এগারো তপশিলি ২৯টি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলা আছে, যা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়ণ করতে হবে। উক্ত তপশিলের ১১তম ও ২৩তম বিষয়গুলি হল যথাক্রমে পানীয় জল ও নির্মলীকরণ সংক্রান্ত। আগেই বলা হয়েছে যে, দুটি বিষয়ই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একটি যেন অন্যের পরিপূরক। নির্মলীকরণের সুবিধাগুলি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন মানুষজনকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা যাবে। পানীয় জলের সরবরাহ এবং উপযুক্ত নির্মলীকরণের সুব্যবস্থা কীভাবে এক সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা করতে পারে, এ বিষয়ে একটি ঘটনার কথা তুলে ধরা যেতে পারে। স্থান হল অধুনা তেলেঙ্গানার ওয়ারঙ্গল জেলার গঙ্গাদেবীপল্লী গ্রাম। সেটা ছিল গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশক। পাত্রপাত্রী হচ্ছেন ওই গ্রামের সাধারণ মানুষজন। ওই সময়কালে গঙ্গাদেবীপল্লী ছিল খুবই ছোট একটা গ্রাম, যেখানে কম-বেশি ৩০০টি ঘর-পরিবার বাস করত। গ্রামটি সর্বার্থেই অনুন্নত। সেখানে না ছিল কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা, না ছিল উন্নত নির্মলীকরণের বন্দোবস্ত। প্রকৃতির ডাকে মানুষজন মাঠঘাট ব্যবহার করত। গ্রামের শিশুদের লেখাপড়ার কোনও পাট ছিল না। শিশুশ্রমিক হিসেবে অনেকেই হয় তুলো চাষের কাজে নতুবা বস্ত্রমিলে নিযুক্ত হত। সবচাইতে খারাপ অবস্থা ছিল গ্রামের মহিলাদের। যেহেতু গ্রামে কোনও পানীয় জলের উৎস ছিল না, গ্রামবাসীদের প্রায় এক কিমি দূরের এক উৎস থেকে (ইঁদারা) পানীয় জল সংগ্রহ করতে হত। গ্রামের মহিলারা রাত প্রায় তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে ওই ইঁদারা থেকে জল আনতে যেতেন। যে যত আগে যেতে পারতেন তার জল পাওয়াটা ততনিশ্চিত হত, নতুবা শেষের দিকে পরিষ্কার জলের পরিবর্তে ঘোলা জল পাওয়া যেত, যা পানের অযোগ্য।

দিনের পর দিন এই অসহনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে গ্রামের মানুষজন বুঝতে পারলেন কিছু একটা করা প্রয়োজন, নতুবা শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাশার অন্ধকারে ডুবে থাকবে। প্রথমেই অনুভূত হল যে অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। ওই ব্যাপারে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অনুঘটকের ভূমিকা পালনে রাজি হল। গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্পের মোট খরচের ১৫ শতাংশ গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে সংগ্রহ করলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প অনুযায়ী বাকি ৮৫ শতাংশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে—এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক বেছে নিয়ে গঠিত হল এক জল কমিটি। উৎসাহিত গ্রামবাসীরা মাত্র দু-মাসের মধ্যে প্রায় ৬৫০০০ টাকা সংগ্রহ করলেন। বাকিটা তো ইতিহাস।

কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম জলাধারটি তৈরি হল। প্রতিটি বাড়িতে জল সংযোগের ব্যবস্থা করা হল। সুষ্ঠু জল ব্যবহারের জন্য কমিটি একটি নির্দেশিকা তৈরি করলেন যা প্রতিটি পরিবার মানতে বাধ্য থাকবে। যেমন—আধ-ইঞ্চি ব্যাসের জলের পাইপ জল সংযোগের জন্য ব্যবহার করা হবে, জলের কল মাটি থেকে চার ফুট ওপরে থাকবে, ব্যবহার করা জল জমা করে তা দিয়ে বাড়ির সামনে ছোটখাটো সবজি খেতে জলসেচন করা যাবে ইত্যাদি। জল কমিটির সুপারিশ হল যে, কেউ যদি উক্ত নিয়ম ভঙ্গ করে তবে সেই পরিবারের জলের সংযোগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং একমাত্র ১০০ টাকা জরিমানা ও প্রয়োজনীয় মুচলেকা দিয়ে পুনরায় সংযোগ নেওয়া যাবে। জল উত্তোলনের যন্ত্রপাতির ভবিষ্যতে মেরামতির জন্য ছোটখাটো যন্ত্রাংশ কমিটি নিজের কাছে মজুত রেখে দিল।

পরবর্তীতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন গঙ্গাদেবীপল্লীকে এক মডেল হিসেবে তুলে ধরতে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। জলে ফ্লুরাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর দূষিত পদার্থ দূরীকরণের জন্য টাটা সংস্থা বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দান করেছে। এর ফলে পানীয় জলের গুণমান বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। তবে বিশুদ্ধ জলের জোগান অব্যাহত রাখতে গ্রামবাসীদের প্রতি ২০ লিটার পিছু এক টাকা মূল্য দিতে হয়।

জল সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি গ্রামটি নির্মলীকরণের বিষয়েও যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ২০০০ সালে স্থানীয় পঞ্চায়েত তথা গ্রামসভা নির্মলীকরণের বিশেষ প্রকল্প "নিজস্ব পাকা পায়খানা" (ISL) গঙ্গাদেবীপল্লীতে রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচিত করে একটি কমিটি গঠন করা হল। এই বন্দোবস্ত হল যে, কমিটির কাছে নির্মাণের জন্য ইট, বালি, সিমেন্ট ও আনুষঙ্গিক অনাময় সামগ্রী আসবে এবং কমিটির তত্ত্বাবধানে গ্রামের প্রতিটি ঘরে পায়খানা তৈরি হবে।

ঠিক তিন মাসের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যকর পাকা পায়খানা তৈরির কাজ শেষ হল। কিন্তু দেখা গেল যে পুরনো অভ্যাস ত্যাগ না করে প্রায় সবাই আগের মতো উন্মুক্ত মাঠে মাঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ব্যস্ত। পায়খানাগুলি কিছুটা যেন 'স্টোর রুমে' পরিণত। বিভিন্ন সময়ে প্রচার, উদ্‌বুদ্ধকরণ অভিযান কোনও কিছুই কাজে এল না। অবশেষে আসরে অবতীর্ণ হল

গ্রামসভা। গ্রামসভার নিদান ছিল, আইন ভঙ্গকারীদের ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং জরিমানার টাকা নির্মলীকরণের কাজে ব্যবহৃত হবে। প্রায় তিন বছর লেগেছিল গ্রামবাসীদের প্রচলিত কু-অভ্যাস ত্যাগ করতে।

পরিণামে আজ গঙ্গাদেবীপল্লী আদর্শ গ্রাম হিসেবে পরিগণিত। ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী এই গ্রামে শতকরা ১০০ শতাংশ মানুষ সাক্ষর, ১০০ শতাংশ শিশুই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, প্রতিটি গৃহেই জল ও বিদ্যুতের সংযোগ আছে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর পাকা পায়খানার ব্যবস্থা করা গেছে। এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা গ্রহণ করেছে প্রতিটি পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় প্রতি পরিবারই কিছু না কিছু সঞ্চয় করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ নির্মলীকরণ অভিযান

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে নির্মলীকরণের আন্দোলন শুরু হয় বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের গোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের হাত ধরে। তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় এই সংস্থা গ্রামীণ এলাকায় প্রথম নির্মলীকরণ প্রকল্পের সূচনা করে। অতি অল্প খরচে কীভাবে গ্রামের মানুষকে শৌচাগার ও তৎসংক্রান্ত নির্মলীকরণের সুবিধা দান করা যায়, তা বাস্তবে রূপদানের পথিকৃৎ হল লোকশিক্ষা পরিষদের এই প্রকল্পটি। প্রকল্প শুরুর মাত্র দু-বছরের মধ্যে জেলার প্রায় ১৯০০০ পরিবারের জন্য পাকা পায়খানা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। মেদিনীপুরের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্য সরকার নির্মলীকরণের এক সার্বিক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং ১৯৯৩-৯৪ অর্থবর্ষে সমগ্র রাজ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ যে, ২০০৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সারা রাজ্যে ৭২, ৪৭, ৯১৫টি পরিবারে নির্মলীকরণের এই সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

পরিবারের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নির্মলীকরণ অভিযান শুরু করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে মেয়েদের বিদ্যালয় ছুট হবার অন্যতম এক কারণ হচ্ছে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শৌচালয় না থাকা। একই সঙ্গে যে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে শৌচালয় ব্যবহার করবার সুবিধা পায়, তারা তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের বোঝাতে পারে যে বাড়িতে শৌচালয় থাকার কী সুবিধা। ওই ব্যাপারে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দুটি প্রকল্প চালু করে। প্রথমটি হল সার্বিক নির্মলীকরণ অভিযান এবং অপরটি জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প। প্রথমটিতে বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণে বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং এই প্রকল্পে প্রতি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম দুটি শৌচালয় তৈরির কথা বলা আছে। একটি হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের জন্য; অন্যটি শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্তত একটি শৌচালয় নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।

ওই প্রসঙ্গে "নির্মল গ্রাম পুরস্কারের" বিষয়টি উত্থাপন করা প্রয়োজন। ২০০১ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি দেশের মধ্যে প্রথম পঞ্চায়েত সমিতি হিসেবে ঘোষিত হয়, যেখানে ১০০ শতাংশ মানুষকে নির্মল শৌচাগারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। পরে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যে মোট ৩৩টি পঞ্চায়েত সমিতি ওই রূপ নির্মল ব্লক হিসেবে ঘোষিত হয়ে "নির্মল গ্রাম পুরস্কার" পেয়েছে। এ যাবৎ এক হাজারের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতকে "নির্মল গ্রাম পুরস্কারে" ভূষিত করা হয়েছে।

"নির্মল ভারত অভিযান" হল কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম এক প্রকাশ, যার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন করে জল ও মলবাহিত রোগমুক্ত এক জীবনযাত্রার পথে উন্নীতকরণ। এই কর্মসূচিতে প্রতিটি বাড়িতে ও সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং জনবহুল স্থানে শৌচাগার নির্মল রাখা, পানীয় জলের গুণগত মান রক্ষা করা ছাড়াও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্বের সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের নাম পরিবর্তিত হয়ে ২০১২-১৩ আর্থিক বছর থেকে "নির্মল ভারত অভিযান" শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত ১০০ দিনের কর্মপ্রকল্পকেও নির্মল ভারত অভিযানের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলা এই প্রকল্পে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে, যার আশু লক্ষ্য হল গ্রামীণ এলাকায় সমস্ত পরিবারকে পরিবর্তিত কৌশলে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের আওতায় আনা, যাতে করে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকৃতপ্রস্তাবে "নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত" হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

উপসংহার

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রামভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানে ভারতের বাকি অংশের থেকে ব্যাপক পিছিয়ে আছে। তাদের না আছে পোশাক-পরিচ্ছদ, না আছে ঘরবাড়ি, এমনকি পানীয় জল ও শৌচাগারের অধিকার যে ব্যক্তিমানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার সে-কথা ভাবতেও তারা ভুলে গেছে। এ ছাড়া দেখা গেছে যে, গ্রামের মধ্যে এক বড় পুকুর বা জলাশয় অথবা বড় কোনও ইঁদারাকে সবাই পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ তার বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণে সকলেই উদাসীন, বহু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে এই কাজে এগিয়ে আসতে হয়। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যদি কোনও প্রকল্পে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, তাদের মতামত অনুযায়ী এবং তাদের প্রদেয় আংশিক চাঁদায় যদি প্রকল্প রূপায়িত হয়, তবে গ্রামবাসীরা ওই প্রকল্পকে নিজেদের বলে ভাবতে শেখে এবং তার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হয়। গঙ্গাদেবীপল্লীর মানুষদের কাছ থেকেও প্রথমে ৬৫,০০০ টাকা চাঁদা তোলা হয়েছিল, যার পরিণামে প্রকল্পটি সাফল্য পায়। নির্মলীকরণের কাজেও জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে নির্মলীকরণের জন্য গ্রামে কী কী করা দরকার, সে বিষয়ে গ্রাম সংসদের সভায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রস্তাব এবং এলাকার মানুষকে ওই প্রকল্পের অঙ্গীভূত করা—এই দুটি বিষয়ই নির্মলীকরণ অভিযানের গতি যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পারবে। আর বারেবারেই তো এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সুস্থ, সুন্দর, নীরোগ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষজন দেশের এক প্রধান সম্পদ, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনে এরাই প্রধান চালিকাশক্তি।❑

[লেখক : অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার, গ্রামোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভূতপূর্ব অধ্যাপক, এন আই আর ডি, হায়দ্রাবাদ।
e-mail: uday.rdmku@gmail.com]

স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলন—একটি সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

সরকার উদ্যোগ নিয়ে এগোবে আর জনগণ তার পদচিহ্ন অনুসরণ করবে—নেতৃত্বে সরকার আর অনুগামী হিসেবে নাগরিক। যে কোনও উন্নয়ন অভিযানের ক্ষেত্রে এই ধরনের চিত্রটাই আমরা সাধারণত কাম্য বলে মনে করি। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারি সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে কেন? পরিচ্ছন্নতার মতো সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সেইসঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সাংগঠনিক সমর্থন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন **চণ্ডী চরণ দে।**

পাঁচ হাজার বছরের সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা উৎকৃষ্ট ছিল। এই সভ্যতা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে মৌর্য ও গুপ্ত যুগেও অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যুগ যুগ ধরে শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা ভারতীয় জীবন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বৈদিক যুগ থেকেই শুচিতা, স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষার প্রতি ভারতবর্ষে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যেসব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে এটা প্রমাণিত যে, ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই শুচিতা, স্বাস্থ্যবিধান এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা ও অভ্যাস গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুচিতা রক্ষার জন্য সে যুগে স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নির্দিষ্ট শিক্ষা বা অনুশাসন মেনে চলা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। কারণ এই শিক্ষা যেমন একদিকে সমাজের জন্য কল্যাণকর তেমনি ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। সেসময় শুচিতা তথা স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা ধার্মিক, সামাজিক, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রেক্ষাপটে দেখা হত।

বেদ মানে হল জ্ঞান। ভারতবর্ষের মুনি ঋষিদের যুগ যুগ ধরে আহরিত জ্ঞানের সমাবেশই হল বেদ। বেদের জ্ঞানই ছিল বৈদিক মানুষ ও সমাজের ধারক-বাহক। বেদের নির্দেশিত শিক্ষা ও রীতিনীতি মেনেই মানুষ ও সমাজ উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই বৈদিক শাস্ত্রে স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মানুষের আচরণের প্রতি বিশেষ শিক্ষা-নির্দেশাবলি লিপিবদ্ধ করা আছে। এই বিষয়ে মনু সংহিতার চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে সহজ ভাষায় কী করণীয় তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতের এই সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের স্রোতে হারিয়ে যায়। তাই স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কাল থেকেই এই শিক্ষা পুনরায় দেশের মানুষের মধ্যে চালু করার জন্য ভারতের মনীষীগণ প্রচেষ্টা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে গান্ধীজির প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজি স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতাকে স্বাধীনতার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাই স্বাধীনতার পর থেকেই স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবেও স্বাস্থ্যবিধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বিষয়ে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে আসছে। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সদস্য দেশ যাতে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সে বিষয়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্যবিধানের সংজ্ঞা

স্বাস্থ্যবিধানের বহুলগ্রাহ্য সংজ্ঞাটি হল—Sanitation is some measures and apparatus for preservation of Public Health। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'স্বাস্থ্যবিধান হল এমন কিছু বিধি এবং ব্যবস্থাসমূহ, যা মেনে চললে জনস্বাস্থ্য রক্ষিত হবে।' অর্থাৎ পরিবেশ হবে নিরাপদ, যা সুস্থ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনের অনুকূল।

স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা জীবনধারা উন্নয়নের একটি প্রয়াস

স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শৌচাগার তৈরি নয়। নিজের বাড়িতে শৌচাগার তৈরি এবং ব্যবহারের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। মূলত স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে উন্নততর জীবনে উত্তরণের প্রচেষ্টা। স্বাস্থ্যবিধান একটি জীবনধারা। মানুষের শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এই জীবনধারা তৈরি হয়। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা ও অভ্যাস চালু হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কেন-না শিশুকাল থেকে এই অভ্যাসগুলি রপ্ত হলে জীবনভর চলতে থাকবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের জ্ঞান হওয়ার দিন থেকেই পরিবার ও সমাজ থেকে এইসব শিক্ষা পেয়ে যাবে। আলাদাভাবে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না।

সার্বিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যবিধানের গুরুত্ব

সার্বিক উন্নয়নের মানচিত্রে স্বাস্থ্যবিধান একটি অবিচ্ছেদ্য কর্মসূচি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ৮০ ভাগ অসুখের মূল কারণগুলি হল যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস তথা স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষের চেতনার অভাব ও কিছু ভুল ধারণা এবং সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে প্রতিষেধক টীকা না নেওয়া।

আমাদের দেশে সাধারণত অপরিচ্ছন্নতা-জনিত এবং জল ও মলবাহিত রোগে মানুষ বেশি ভোগে। যেসব রোগগুলি আমাদের দেশে বেশি হয় সেগুলি হল—ডায়ারিয়া, আন্ত্রিক, কলেরা, আমাশয়, রক্ত আমাশয়, জিয়ার্ডিয়া, জন্ডিস (হেপাটাইটিস-এ এবং ই), টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, কৃমি (গোলকৃমি, হুককৃমি, সুতাকৃমি, ফিতাকৃমি ইত্যাদি), পোলিয়ো, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, এনসেফেলাইটিস, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, ট্র্যাকোমা (চোখের রোগ) এবং নানারকম চর্মরোগ, ইত্যাদি।

প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় ১৫ লক্ষ শিশু ডায়ারিয়াজনিত রোগের কারণে মারা যায়। এইসব রোগগুলিতে আমাদের দেশের শিশুরা সবথেকে বেশি ভোগে এবং মারা যায়। ভারতবর্ষে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সি ৪ লক্ষ শিশু মারা যায়। এটি শিশুমৃত্যুর হার বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ। এইসব রোগে প্রতি ৮০ সেকেন্ডে একজনের মৃত্যু হয়। জনগণনার (২০১১) রিপোর্ট অনুসারে ভারতে শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার) ৪৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে তা ৩১ জন। পৃথিবীর ৫ বছরের কমবয়সি মোট শিশুমৃত্যুর ২২ শতাংশ ভারতে হয়। বছরে একটি শিশু গড়ে ৫ বার ওইসব রোগে ভোগে, ফলে অপুষ্টি ও রক্তাল্পতাজনিত রোগে আক্রান্ত হয় এবং রোগপ্রবণ হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের হাসপাতালগুলির আউটডোরে (বহির্বিভাগে) চিকিৎসার জন্য আসা রোগীর প্রায় ৫০ শতাংশ রোগীই জল ও মলবাহিত রোগে আক্রান্ত। হাসপাতাল-গুলির প্রায় ৩২.২ শতাংশ শয্যায় জল ও মলবাহিত রোগী ভর্তি থাকে। ফলে অন্য কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগী জায়গা পায় না। একটি পরিবারের মোট চিকিৎসা ব্যয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ খরচ হয় জল ও মলবাহিত রোগের চিকিৎসায়। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী একজন মানুষের এইসব রোগের চিকিৎসা বাবদ খরচ হয় প্রায় ১০০ টাকা। ভারত সরকারের হিসাব, বছরে এভাবেই গ্রামের মানুষের কষ্টার্জিত প্রায় ৬,৭০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের জল ও স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতবর্ষে জল, মল এবং অপরিচ্ছন্নতাজনিত রোগের কারণে ব্যক্তিপিছু বছরে ২,১৮০ টাকার ক্ষতি হয়। উন্নয়নশীল দেশে এই ধরনের ক্ষতি সার্বিক উন্নয়নের পরিপন্থী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অন্য একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, জল, মল ও অপরিচ্ছন্নতাজনিত রোগের কারণে বিশ্বে বছরে ১৮ কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়। স্বাস্থ্যবিধানের সঙ্গে আর্থিক উন্নয়নের একটি গভীর যোগ রয়েছে। অপরিচ্ছন্নতাজনিত এবং জল ও মলবাহিত রোগগুলি একটি দারিদ্র্যচক্র (চিত্র ১) তৈরি করে। ফলে দরিদ্র মানুষকে দরিদ্রতম অবস্থায় ঠেলে দিতে এগুলি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। একজন দরিদ্র মানুষ যখন ডায়ারিয়াজনিত রোগে আক্রান্ত হয়, তখন লাগাতার কয়েকদিন কাজকর্ম করতে পারে না। ফলে পরিবারের আয় বন্ধ হয়ে যায় অথবা আয় কমে যায়। কিন্তু চিকিৎসার ব্যয়, যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ খরচা বেড়ে যায়। যদি পরিবারটির সঞ্চয় না থাকে, তবে তাদের যেটুকু সম্পদ থাকে তা বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধার তারা শোধ করতে পারে না, ফলে সেই সম্পদটুকুও হাতছাড়া হয়ে যায়। এই সময়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের খাদ্যে টান পড়তে পারে। ফলে তারা অপুষ্টির শিকার হতে পারে। রোগগুলি যেহেতু সংক্রামক, তাই অন্য সদস্যদের ওই রোগগুলিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ও অনেক সময় তারাও ওইসব রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তি যদি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হয় তখন সমস্যা আরও গম্ভীর হয়ে যায়। পরিবারের দারিদ্র্য বাড়তে থাকে। স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে এইসব রোগ কমানো এবং দারিদ্র্যচক্র ভাঙা সম্ভব। এর ফলে একদিকে যেমন পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় কমবে, অন্যদিকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বাবদ ব্যয়ও প্রভূত পরিমাণে কমানো যাবে। যদি স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায় এবং পরিচ্ছন্নতা অভ্যাসের উন্নয়ন ঘটানো যায়, তাহলে হাসপাতালে জল ও মলবাহিত রোগে আক্রান্ত রোগীর ভিড় কমবে, ফলে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। ঘনঘন জল ও মলবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে অপুষ্টিজনিত রোগ বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে আমাদের দেশে অপুষ্টিজনিত রোগ কমানো সম্ভব হবে। স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস উন্নয়ন তাই জরুরি।

স্বাধীন ভারতে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি

ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির সূচনা স্বাধীনতার পূর্বেই গান্ধীজির হাত ধরে শুরু হয়েছিল। সেটি ছিল একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং স্বনির্ভর কর্মসূচি। গান্ধীবাদী জীবনধারায় স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই সরকারি ভাবে এই কর্মসূচিকে স্থান দেওয়া হলেও ১৯৮৬ সালেই প্রথম জাতীয় স্তরে গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির (সেন্ট্রাল রুরাল স্যানিটেশন প্রোগ্রাম) সুনির্দিষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়। যদিও এটি শুধুমাত্র অনুদানভিত্তিক পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণের কর্মসূচি ছিল। অন্যভাবে দেখলে এটি ছিল সরকারি সরবরাহ নির্ভর, উচ্চহারে অনুদান নির্ভর, উপর থেকে চাপানো, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ রোহিত প্রকল্প। লক্ষ্যমাত্রা ছিল গ্রামীণ ভারতের একটি খণ্ডিত জনসংখ্যা। শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলিকে এই কর্মসূচির আওতায় আনার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক বরাদ্দ ছিল অতি সামান্য। ফলে এই কর্মসূচির ফল চোখে পড়ত না।

চিত্র ১ : রোগ ও দারিদ্র্যচক্র

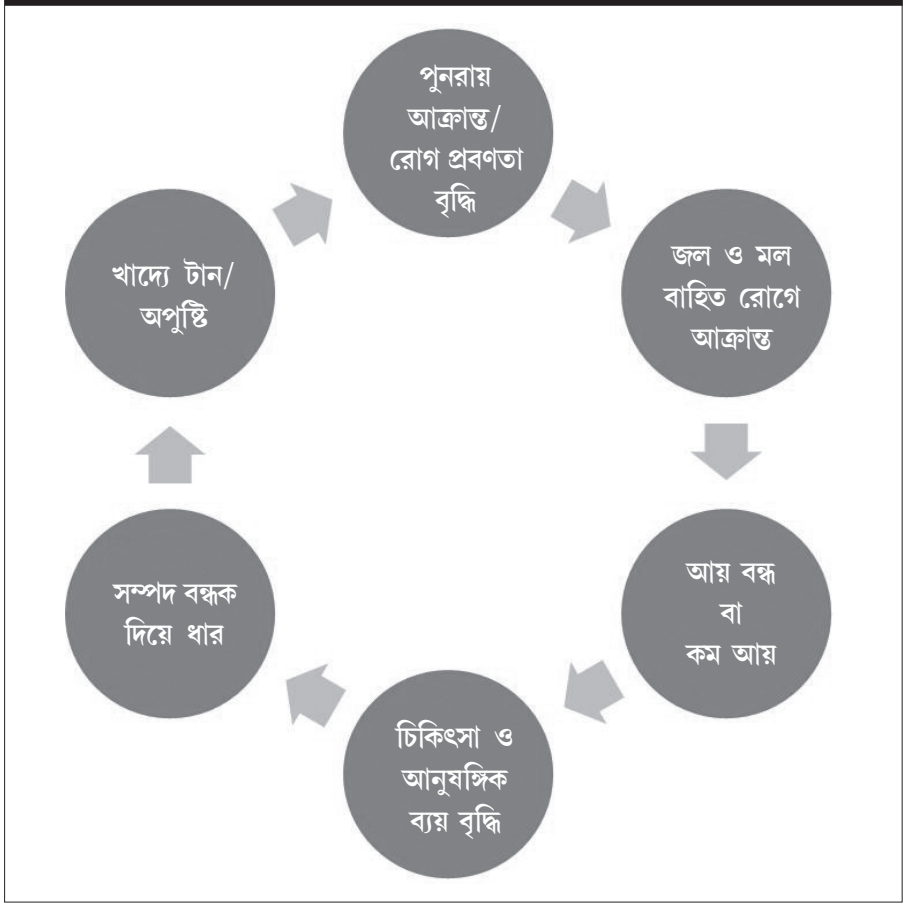

যেহেতু এটি অনুদান নির্ভর শৌচালয় নির্মাণ কর্মসূচি ছিল, তাই আর্থিক বরাদ্দ অনুসারে শৌচালয় নির্মাণ করাই ছিল সরকারি বিভাগের মূল কাজ। পরিবারগুলি যাতে নির্মিত শৌচালয়গুলি নিয়মিত ব্যবহার করে, সে বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার কোনও কর্মসূচি ভাবা হয়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা যায়, ওই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত শৌচাগারগুলির প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ শৌচাগার হিসেবে ব্যবহার করেনি। অন্য কাজে ব্যবহার করেছে। দেখা গেছে, কোনও কোনও পরিবার শৌচালয়টিকে ঘর হিসেবে ব্যবহার করেছে কিন্তু শৌচাগার হিসেবে গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ, শৌচালয় ব্যবহার যে স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণের সময় গুরুত্ব পায়নি।

মেদিনীপুর স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলন

ভারতবর্ষে ১৯৯০ সালে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার জন-আন্দোলন এবং স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা ও প্রসার নির্ভর নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন ক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ (নরেন্দ্রপুর), মেদিনীপুর জেলা পরিষদ ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি চালু করে। এটি ছিল দেশের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগে স্বাস্থ্যবিধান উন্নয়নের প্রথম এবং বৃহৎ প্রচেষ্টা।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে চাহিদা সৃষ্টি করা। এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে স্বাস্থ্যবিধানের সামগ্রী তৈরি ও ব্যবহার করতে আগ্রহী করা। স্বাস্থ্যবিধানের বিভিন্ন ব্যবস্থা, যেমন— পারিবারিক শৌচাগার, স্নানের চাতাল, সার/আবর্জনা গর্ত, উন্নত চুল্লি ইত্যাদি নিজ খরচে তৈরি করে ব্যবহার-অভিমুখী করানো। স্বাস্থ্যবিধানের বিভিন্ন অভ্যাস, যেমন—পায়খানার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নিয়মিত নখ কাটা, জুতো পরে বাইরে যাওয়া ইত্যাদি অভ্যাস গড়ে তোলা।

এই জন-আন্দোলনমুখী স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে ১৯৯০-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১,২৩,০০০ পরিবার নিজ ব্যয়ে পারিবারিক শৌচাগার তৈরি করেছিল। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতসহ ১৪৩টি গ্রামের সকল ঘরে নিজ ব্যয়ে শৌচাগার তৈরি হয়েছিল এবং গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রামকে 'মলমুক্ত গ্রাম' হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সেসময় বি পি এল পরিবারে শৌচাগার নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদানের সুযোগ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মেদিনীপুর জেলা পরিষদ তা দেওয়া বন্ধ রেখেছিল। কারণ তারা মনে করতেন, অনুদান ছাড়াও পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মানুষের স্বশক্তিতে নির্ভর করে এমন কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়। মানুষও এই উদ্যোগে শামিল হয়েছিল। তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও এই চেষ্টাকে বিশেষ সহযোগিতা করা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে যুবগোষ্ঠীকে সংযুক্ত করে। পরিষদের একটি নিজস্ব উন্নয়ন কাঠামো আছে। এই পরিকাঠামোয় গ্রাম পর্যায়ে থাকে একটি অনুমোদিত ক্লাব। একটি এলাকার ৩০-৪০টি ক্লাবের সমন্বিত সংস্থা হল একটি গুচ্ছসমিতি। স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি পরিচালনায় মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১১০০ গ্রামীণ যুব ক্লাব ও ১৪টি গুচ্ছসমিতি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিল। এই ক্লাব ও গুচ্ছসমিতিগুলি জন-অভিযানমুখী স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল। প্রথম দিকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এই কর্মসূচিতে তেমনভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন না করলেও ১৯৯৫ সাল থেকে মুখ্য ভূমিকা পালনের দায়িত্বে আসে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, সেসময় থেকেই গ্রাম ও ব্লক পঞ্চায়েতের সঙ্গে লোকশিক্ষা পরিষদের গ্রামীণ যুব ক্লাব ও গুচ্ছসমিতিগুলির একটি সুসম্পর্ক তৈরি হয়, যা এখনও অব্যাহত।

মেদিনীপুরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯২-৯৩ সালেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ১৪টি ব্লকে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে। পরবর্তীকালে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান প্রকল্প রূপায়ণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার ও অনুমোদন করেছে। তাই রাজ্যে এই কর্মসূচি পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যেমন স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা ও চেতনা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও রূপায়ণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত 'স্যানিটারি মার্ট'-কে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকে 'প্রোডাকশন সেন্টার' ও 'স্যানিটার মার্ট' পরিচালনার জন্য প্রথম পছন্দ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বাছা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৯৯ শতাংশ ব্লকে স্যানিটারি মার্ট পরিচালনা করে কোনও না কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে নির্বাচন করে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে মেলবন্ধন দৃঢ় করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলায় পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গেছে। মেদিনীপুর জেলায় ১৯৯০ সালে যেখানে মাত্র ৪.৭৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে শৌচালয় ছিল, ২০১১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তা বেড়ে হয়েছে ৮৯ শতাংশ। জেলার ৯০ শতাংশ মানুষ শৌচাগার ব্যবহার করে। ৯০ শতাংশ মানুষ শৌচের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়।

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান

ভারত সরকার ১৯৯৮ সালে যখন সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান (টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেন) কর্মসূচির রূপরেখা রচনা করে, তখন মেদিনীপুর ও পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে তার অনেকগুলি কর্মধারা গ্রহণ করা হয়। কারণ ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি রূপায়ণে মেদিনীপুরেই প্রথম জন-অভিযানমুখী কর্মধারার সফল প্রয়োগ হয়। যে কর্মধারাগুলি সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানে গ্রহণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি হল—

১. স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিকে প্রকল্প হিসেবে না দেখে অভিযান হিসেবে গ্রহণ করা।

২. স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা ও চেতনা কর্মসূচির উপর গুরুত্ব আরোপ এবং এই কর্মসূচির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রকল্পের মোট বরাদ্দের মধ্যে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া।

৩. প্রকল্প পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অংশগ্রহণের সুযোগ নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

৪. আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির শৌচাগার তৈরির জন্য অনুদান কম রাখা ও পরিবারগুলিকে অর্থ/শ্রম/জিনিসপত্র দিয়ে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা, যাতে তারা মনে করে শৌচাগারটি তাদের সম্পদ।

এই প্রকল্পকে শুধুমাত্র পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও শৌচাগার নির্মাণের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ২০০৪-২০০৫ সাল থেকে নির্মল গ্রাম পুরস্কার দেওয়া শুরু করেছে। পঞ্চায়েত ও অন্যান্য সংস্থা গ্রামীণ এলাকায় এই অভিযানে যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে, তাদের প্রচেষ্টা ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়াই নির্মল গ্রাম পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্যবিধানের বর্তমান স্থিতি

২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট-এ জানা গেছে, ভারতবর্ষের মোট ১২১ কোটি ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪২২ জন জনসংখ্যার প্রায় ৬৭ শতাংশ এখনও বাইরে মলত্যাগ করে। পশ্চিমবঙ্গের মোট ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৩৬ জন জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ মানুষ বাইরে মলত্যাগ করে। আমাদের রাজ্যের মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৭ হাজার ১৮৬টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৭৩ লক্ষ ৬ হাজার ৮৩৪টি পরিবারে শৌচাগার নেই। রাজ্যের মোট ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৪টি শহুরে পরিবারের মধ্যে ৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৯০টি পরিবারে শৌচাগার নেই।

শৌচাগার নির্মাণ ও শৌচাগার ব্যবহারের মধ্যে অনেক ফারাক থাকে। ইউনিসেফ ও বিশ্ব ব্যাংকের জল ও স্বাস্থ্যবিধান শাখার জয়েন্ট মনিটরিং সমীক্ষা রিপোর্ট (২০১২) থেকে জানা গেছে, সরকারি প্রকল্পের আওতায় যত শৌচালয় তৈরি হয়েছে তার মাত্র ৩৩ শতাংশ মানুষ নিয়মিত ব্যবহার করে। (চিত্র-২)।

নির্মল ভারত অভিযান

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যবিধান অবস্থার আসল চিত্র ২০১১ সালের জনগণনায় ধরা পড়ে। এই চিত্র জানার পর ভারত সরকার ২০১২ সালে নির্মল ভারত অভিযান কর্মসূচি ঘোষণা করে। নির্মল ভারত অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয় ২০২২ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের সকল পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও সামুদায়িক স্থানে শৌচাগার নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হবে। এ ছাড়াও তরল ও কঠিন বর্জ্যপদার্থের স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথা হয়। এই প্রকল্পে পারিবারিক শৌচালয় তৈরির জন্য অনুদান বাড়িয়ে দশ হাজার টাকা করা হয়। এই দশ হাজার টাকার মধ্যে ৪৬০০ টাকা দেওয়ার কথা ছিল নির্মল ভারত অভিযান থেকে।

এই কর্মসূচিতে শৌচাগার তৈরির কাজে কিছুটা গতি এলেও যে হারে কাজ করলে ২০২২ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের যত পরিবারে মোট শৌচালয় তৈরি করতে হবে তার তুলনায় সংখ্যটা অত্যন্ত নগণ্য। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থাপনা, পরিকাঠামো তৈরি করা ও নজরদারি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি তা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। বিশেষ করে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজ প্রায় একেবারেই এগোয়নি।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লক্ষ্য

২০১৪ সালে স্বচ্ছ ভারত মিশন নামে চালু হয়েছে। মূল লক্ষ্য একটি পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যবিধানসম্মত ভারতবর্ষ গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি নাগরিক ন্যূনতম মানবিক অধিকারের অঙ্গ হিসেবে যথেষ্ট নিরাপদ জল ও নিরাপদ শৌচাগার ব্যবহারের অধিকারী হবেন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করবেন। ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে শিশুমৃত্যু হ্রাস, দারিদ্র্যদূরীকরণ, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রবেশদ্বার হিসেবে গণ্য হবে। পারিবারিক

চিত্র ২ : পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির গ্রামীণ এলাকার মাঠেঘাটে মলত্যাগ করা পরিবারের সংখ্যা (শতাংশে)

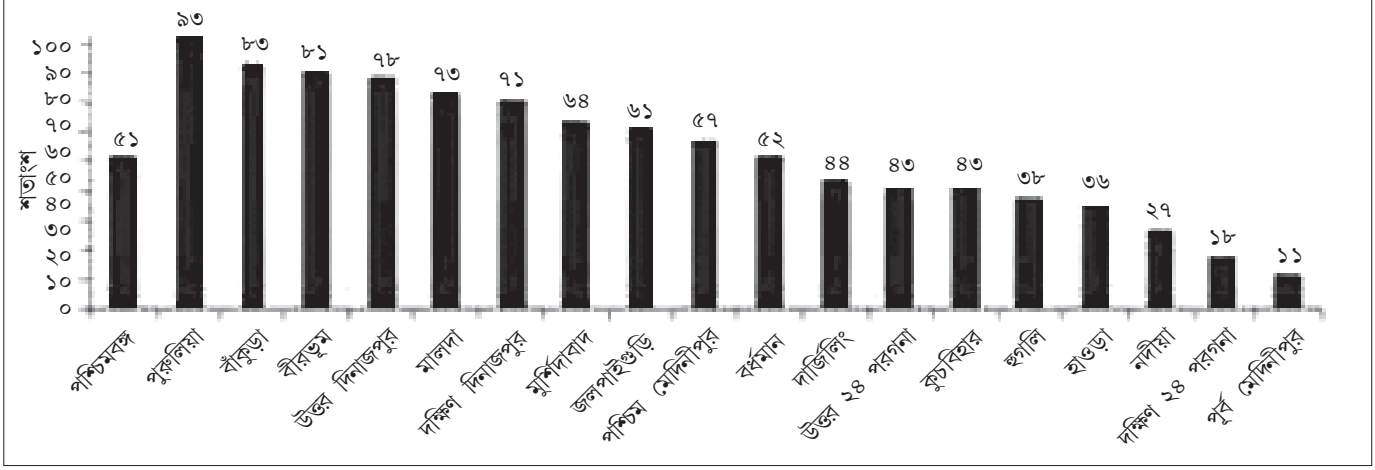

শৌচালয় নির্মাণের জন্য অনুদান বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করে শৌচালয়ের সঙ্গে জল রাখার ব্যবস্থা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আগামী ২০১৯ সালের অক্টোবরের মধ্যে ভারতের সব বাড়ি, স্কুল, হাটবাজার, বাস স্ট্যান্ড ও অন্যান্য লোক সমাগমের জায়গায় শৌচালয় পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তরল ও কঠিন আবর্জনার স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলার কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন। যুগ যুগ ধরে মানুষের যে অভ্যাসগুলি তৈরি হয়ে গিয়েছে, তা বদল করে নতুন অভ্যাসে সকল মানুষকে অভ্যস্ত করার কাজ দল, মত, জাতিধর্মনির্বিশেষে সমবেত উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও সমস্ত স্তরের সংগঠন ও ব্যক্তিকে এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারিভাবে কর্মসূচিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ সারা দেশে বিশেষভাবে সাড়া ফেলেছে।

শৌচাগার থাকা এবং ব্যবহার যে সম্মানজনক সেটা বোঝাতে না পারাটা একদিকে যেমন রূপায়ণকারীদের ব্যর্থতা এবং অপেশাদারিত্বের নজির, তেমনি ভারতবাসী হিসেবে প্রত্যেকটি নাগরিকের লজ্জা।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি

স্বচ্ছ ভারত মিশনে বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি রূপায়িত হলে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পড়ুয়াদের মধ্যে সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে অত্যন্ত সহায়ক হবে। বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থাগুলি তৈরি ও ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। নিরাপদ পানীয় জলের নিরন্তর সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যায়। পড়ুয়াদের পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় হয়। নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায়। পড়ুয়াদের সু-অভ্যাস গড়ে ওঠে।

ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিকসহ সমস্ত বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন সারা দেশে চালু হওয়ার পর থেকে একটি সময়নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনের ১৯ ও ২৫ ধারায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি সর্বজনীন 'মানক' তালিকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আইন চালু হওয়ার ৩ বছরের মধ্যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে সেই মানক তালিকা অনুসারে উন্নীত করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষার সেই মানকগুলির মধ্যে অন্যতমগুলি হল—শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনে বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক এবং পর্যাপ্ত সংখ্যায় শৌচালয়, প্রস্রাবাগার, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, সবসময় যথাযথ পরিমাণে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। এই আইনে আনন্দদায়ক ও অংশগ্রহণমূলক কাজের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের বিষয়টিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা তাই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় পাঠক্রমেও এই বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে প্রধান হল বিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়ে সচেতন করা, উদ্‌বুদ্ধ করা ও অভিযানে শামিল করা। প্রধান কাজ ছিল সকলের কাছে গিয়ে তাদের প্রশিক্ষিত করা, উদ্‌বুদ্ধ করা ও অভ্যাস গঠনে উদ্যোগী করা। উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে একটি সুংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। এই পরিকল্পনায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

হাত ধোয়ার গুরুত্ব

নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া একটি স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস। এই অভ্যাসটি সকলের মেনে চলা উচিত। ঘনঘন পেটের অসুখের

অন্যতম কারণ (৪৪ শতাংশ) সাবান দিয়ে হাত না ধোয়া। তাই পায়খানার পর এবং খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া জরুরি। কেন-না মলের সাথে নানারকম রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে। সাবান দিয়ে হাত ধুলে জীবাণু হাত থেকে বেরিয়ে যায়। নইলে খাবার সময় তা পেটে চলে যায়। ফলে নানারকম পেটের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গেছে শৌচের পর, বাচ্চার মল পরিষ্কার করার পর, খাওয়ার আগে, রান্নার আগে এবং খাবার পরিবেশন করার আগে সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধুলে ডায়ারিয়া, কৃমি ইত্যাদি বিভিন্ন পেটের অসুখ ৪৪ শতাংশ কম হয়। নিউমোনিয়া ও শ্বাসনালির রোগের সংক্রমণ ২২ শতাংশ কম হয়। ভাইরাসজনিত রোগ, যেমন— সোয়াইন ফ্লু এবং চোখের রোগের সংক্রমণ কমে যায়। পেটের রোগ কমে, ফলে শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। চর্মরোগ কম হয়। ছাত্রছাত্রীদের পেটের অসুখ কম হওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ে এবং পড়াশুনায় মনোযোগ বাড়ে।

কীভাবে সফলতা আসবে

স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলনের মূল করণীয় হল মানুষের মধ্যেকার সৎ ভাবনাকে জাগরিত করা, বর্তমানের কিছু ব্যাবহারিক অভ্যাসের পরিবর্তন সাধন করা এবং উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গ্রহণ করা। এটি সফলভাবে করতে হলে দরকার—

- কর্মসূচিকে পরিচালনার জন্য রাজ্য থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
- একটি প্রশিক্ষিত কর্মীদল গড়ে তোলা।
- সমস্ত স্তরের মানুষজনকে স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা অভিমুখী করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট চেতনা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা।
- উপযুক্ত সরবারহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে পরিবার যখন চাইবে তখন হাতের কাছে শৌচালয় ইত্যাদি তৈরির সামগ্রী ও প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রি পেয়ে যায়।
- প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি পরিকাঠামো ও কর্মীদল।
- সহায়ক একটি পরিমণ্ডল গড়ে তোলা।

যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার

শুধুমাত্র সরকারি বিভাগ বা পঞ্চায়েতের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের দীর্ঘলালিত অভ্যাসের পরিবর্তনই প্রধান কাজ। তাই দরকার সহযোগী সংস্থা। স্বাস্থ্যবিধানের কাজ রূপায়ণকারী সরকারি নির্দিষ্ট বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগ— যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ও শিশু কল্যাণ ইত্যাদিকে এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে শামিল করতে হবে।

অনুরূপভাবে স্বেচ্ছাসেবী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পূর্বে এই কাজে বিশেষ উৎকর্ষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি ব্লকে একটি করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানে পঞ্চায়েতের সহযোগী সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি সারা ভারতবর্ষের সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত 'স্যানিটারি মার্ট' ও 'প্রোডাকশন সেন্টার'গুলি শুধুমাত্র শৌচালয় সরবরাহ ও তৈরির কাজ করে না, তারা প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক চেতনা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টির কাজেও পঞ্চায়েতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গে যেসব জেলায় স্বাস্থ্যবিধানের কাজ ভালো হয়েছে, সেখানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা চেতনা প্রসার ও চাহিদা সৃষ্টির কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদও এই কাজে তাদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেছে ও বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সকল পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ কর্মসূচি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে জল-পরীক্ষাগার পরিচালনা ও গ্রামে গ্রামে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্যবিধান একটি ধারাবাহিক কর্মসূচি। স্বাস্থ্যবিধান উন্নত জীবনধারা প্রবর্তনের একটি নির্দিষ্ট উদ্যোগ। তাই এটি কোনও একটি সংস্থার দ্বারা সফলভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। চাই যৌথ উদ্যোগ। পঞ্চায়েতকেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কেন-না এটি রূপায়ণ করা পঞ্চায়েতের সংবিধান নির্দিষ্ট কাজ। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী/সামাজিক সংস্থা যেহেতু নিজ নিজ কাজের এলাকায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার, তাই স্বাস্থ্যবিধান অভিযানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অনিবার্য। সংস্থাটি শিশুকল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ইত্যাদি যে কোনও উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকুক না কেন, স্বাস্থ্যবিধান অবস্থার সুষ্ঠু উন্নয়ন না হলে ওইসব কর্মসূচির সুফল অধরাই থেকে যাবে।

সমবেত উদ্যোগ ছাড়া স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা আন্দোলন সফল করা সম্ভব হবে না। হাতে সময় খুবই কম, আর দেরি হলে ২০১৯ সালের মধ্যে 'স্বচ্ছ ভারতের' স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে শামিল করে এই কাজ সফল করতে। যতক্ষণ পর্যন্ত ১ জন মানুষও খোলা জায়গায় মলত্যাগ করবে, সুস্থ জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ হবে না। সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ❑

[লেখক সংযোজক, জল ও স্বাস্থ্যবিধান, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর।]

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

দেশের অগ্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

স্বাধীনতার পর সাত-সাতটি দশক অতিক্রান্ত প্রায়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতার নজির থাকা সত্ত্বেও এদেশের ভাগ্যে "উন্নয়নশীল"-এর তকমাটা ঘুচল না। যে দেশ মঙ্গল অভিযানে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে, সেই দেশে "স্বচ্ছ ভারত অভিযান"-এর সাফল্য নিয়ে এত সংশয় কেন? সমস্যার সমাধানসূত্রসহ সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরেছেন **কে এন পাঠক।**

গান্ধীবাদ তথা গান্ধীদর্শন অনুসরণ করেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা। ঐশ্বরিক নান্দনিকতার পরবর্তী পর্যায় হল স্বচ্ছতা—এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ব্যঞ্জনা ও সূচনা। বর্তমানে ৭৪ শতাংশ সাক্ষর মানুষের দেশ আমাদের ভারত। কিন্তু স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার সমস্যাটি এখনও বেশ উদ্‌বেগজনক। পর্যাপ্ত অনাময় ব্যবস্থার অভাব যে রোগব্যাধির মূল এবং উন্নত মানের অনাময় ব্যবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুন্দর-সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুত—এই সত্য আজ সারা বিশ্বেই স্বীকৃতি লাভ করেছে (সারা বিশ্বই স্বীকার করে নিয়েছে)।

এই সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত প্রস্তাবে যে সমস্ত দেশ স্বাক্ষর করেছে, তারা সকলেই অঙ্গীকারবদ্ধ ২০১৫ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলের অন্তত অর্ধেক এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শহরের একশো শতাংশ মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার। এর ফলে উন্নত স্বাস্থ্যবিধির অভাব রয়েছে—এ ধরনের গৃহস্থ বাড়িতে তা সম্প্রসারিত হবে এবং একই সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবহার্য বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যবিধির সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়া যাবে। এর আর-একটি সুফল হল শহরের উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে ফেলার কু-অভ্যাস বন্ধ করা যাবে। কিন্তু আমাদের দেশের সামগ্রিক অনাময় ব্যবস্থার ওপর সময়ে সময়ে যে সমস্ত সমীক্ষা চালানো হয়, তার রিপোর্টে কিন্তু একটি উদ্‌বেগজনক চিত্রই ফুটে ওঠে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' এবং 'ইউনিসেফ'-এর যৌথ তদারকি কর্মসূচির আওতায় ভারতে জলের জোগান এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। তাতে প্রকাশ সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্য ২০১৫-তে পৌঁছাতে ভারতে ২০৫৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ সম্পর্কে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল তার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশের ওড়িশায় এই লক্ষ্যপূরণে সময় লাগবে সবচেয়ে বেশি, ২১৬০ সাল পর্যন্ত।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সফল করে তুলতে কয়েকটি মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এগুলি হল—

(ক) সমস্ত বাসস্থানে জলের নিশ্চিত জোগান।

(খ) বাসযোগ্য সমস্ত এলাকায় ব্যক্তিগত এবং জনসাধারণের সকলের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার।

(গ) উপযুক্ত নিকাশিব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং জঞ্জাল অপসারণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন।

(ঘ) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রাথমিক সুযোগসুবিধার প্রসার।

(ঙ) স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সফল করে তুলতে জনসচেতনাতর প্রসার।

জলের জোগান

বর্তমান বছরের ১ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের বসবাসযোগ্য ১৬,৯৬,৬৬৪টি এলাকার মধ্যে মাত্র ১২,৪৯,৬৯৫টি এলাকায় মাথাপিছু প্রতিদিন ৪০ লিটার হিসেবে পানীয় জলের জোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বহু গ্রামকেই আজও পানীয় জলের জন্য নির্ভর করে থাকতে হয় গ্রামের পুকুর, জলাশয় সহ অন্য কোনও প্রাকৃতিক উৎসের ওপর। কিন্তু গরমের শুখা মরশুমে এই সমস্ত পুকুর বা জলাশয়ও জলশূন্য হয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের শহরগুলিতে নিকাশি ব্যবস্থার ওপর চাপ কতখানি, তা খতিয়ে দেখার বাস্তবসম্মত কোনও উপায় নেই। কারণ দেশের নাগরিকের জল আহরণের উৎস বা মাধ্যম যেমন ভিন্ন, তেমনি তাদের বর্জ্য নোংরা জল নিকাশির যে ব্যবস্থা, তাও অঞ্চলভেদে ভিন্ন প্রকৃতির। যেভাবে আমাদের দেশে বর্তমানে নিকাশিব্যবস্থার হিসাবনিকাশ করা হয়, তা এখনও পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে মোটামুটিভাবে হিসাব করে দেখা গেছে যে, শহর পুরকর্তৃপক্ষগুলি যে পরিমাণ জল সরকারিভাবে জোগান দেয়, তার প্রায় ৮০ শতাংশ ফিরে আসে ব্যবহৃত বর্জ্য নোংরা জল হিসেবে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০০৫-০৬-এর প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাইপলাইন মারফত জল সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মাত্র ১৮.৮ শতাংশ শৌচাগার।

শৌচাগারের সুযোগ ও ব্যবস্থা

বিশ্বের প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ শৌচাগারসহ উপযুক্ত অনাময়ের সুযোগ থেকে এখনও বঞ্চিত। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বাসই ভারতে। রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, দেশের প্রায় ৬২৬ মিলিয়ন নাগরিক কাছাকাছি কোনও শৌচাগারের সুযোগ না থাকায় উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারতে বাধ্য হন। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দফতরের (NSSO) ২০১২ সালের ৬৯তম সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের ৫৯.৪ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ এবং শহরাঞ্চলের ৮.৮ শতাংশ অধিবাসীদের নিজস্ব শৌচাগার বলতে কিছুই নেই।

উপযুক্ত নিকাশি ও বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা

মানুষের শরীর থেকে নির্গত বর্জ্যের অপসারণ ব্যবস্থা নিরাপদ না হওয়ার কারণে, বিশেষত শহরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশরক্ষা খাতে বেশ ভালোরকম অর্থ ব্যয় করতে হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ এই দুটি খাতে ব্যয় করতে হয়। শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জাতীয় নীতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত অনাময় ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে শহরে মোট নাগরিকদের ২২ শতাংশকেই নানাধরনের অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা, শিশু ও বয়স্ক মানুষ। এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, গৃহস্থালি ও পৌর আবর্জনা ঠিকমতো অপসারিত না হওয়ার কারণে ভারতে ভূপৃষ্ঠের ওপরের ৭৫ শতাংশ জলই দূষিত হয়ে পড়ে।

পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় প্রাথমিক সুযোগসুবিধা

পরিচ্ছন্ন ভারত অভিযানের সাফল্যের পূর্ব শর্তই হল জল সরবরাহ, হাত ধোয়ার সাবান, পাউডার বা তরল পদার্থ, উপযুক্ত নিকাশিব্যবস্থা এবং বর্জ্য ও জঞ্জাল অপসারণের সুযোগসুবিধার প্রসার ও সম্প্রসারণ। এই সমস্ত সুযোগসুবিধা কিছু কিছু মানুষ হয়তো পেয়ে থাকেন। আবার এমন কিছু মানুষও রয়েছেন, যাঁরা এই সমস্ত সুযোগসুবিধা পেলেও তার সদ্ব্যবহার করেন না বা বিষয়টিকে সেরকমভাবে গুরুত্ব বা প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করেন না। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি যাঁরা এই সমস্ত সুযোগসুবিধার জন্য ব্যয় করতে অপারগ বা এ সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই ধরনের নাগরিকদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১. জনসচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে উপযুক্ত অনাময় ব্যবস্থার সম্পর্কটি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, সে সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে বয়স্ক তথা প্রবীণ নাগরিক— সকলকেই সচেতন করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। স্কুল সহ সমস্ত ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যম সহ সমস্ত সামাজিক প্রচারমাধ্যমকেই এই সচেতনতা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যাতে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত এর বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

উপযুক্ত ও কার্যকর স্বাস্থ্যবিধান নীতি গড়ে তুলতে যে সমস্ত বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে নজর দিতে হবে, তার মধ্যে রয়েছে :

(১) জনসচেতনতার প্রসার।

(২) স্বাস্থ্যবিধির সামাজিক ও বৃত্তিগত বিভিন্ন দিক।

(৩) প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

(৪) সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি।

(৫) প্রযুক্তির সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার ও প্রয়োগ।

(৬) যাদের কাছে এখনও সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাদের কাছে তা ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া।

(৭) চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ফারাক দূর করা।

২. স্বাস্থ্যবিধির সামাজিক ও বৃত্তিগত দিক

মানুষকে দিয়ে হাতে বা মাথায় করে জঞ্জাল ও বর্জ্য সাফাই বন্ধ করতে আরও অনেক কিছু কাজ আমাদের এখন করতে হবে। দেশের স্যানিটেশনের কাজে যুক্ত কর্মীদের বৃত্তি বা পেশাগত ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষভাবে জরুরি। যে সমস্ত পরিবারে শৌচাগার বলতে কিছু নেই, তাদের জন্য উপযুক্ত শৌচাগার নির্মাণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার মধ্যে সমন্বয়

অনাময় ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি সংস্থার উচিত তার জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পুরোপুরি পালন করা। একই কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে আবার না ঘটে, সেই বিষয়টিও সুনিশ্চিত করতে হবে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ

সারা দেশ জুড়ে শুরু হওয়া এ ধরনের একটি জাতীয় কর্মসূচি সফল করে তুলতে MNREGS, MPLADS এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সংযুক্তিকরণ একান্ত জরুরি একটি পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে যে যে কাজ সম্ভব করে তোলা যায়, তার মধ্যে রয়েছে—

(ক) গৃহস্থ বাড়ি, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি, এবং সমষ্টির ব্যবহার্য স্থানগুলিতে শৌচাগার নির্মাণ।

(খ) প্রতিটি পরিবারের ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত শৌচাগার গড়ে তোলা। সমষ্টির জন্য ব্যবহার্য শৌচাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এককালীন অনুদান বা অর্থ মঞ্জুরির ব্যবস্থা।

(গ) আদর্শ গ্রাম যোজনা সহ অন্যান্য কেন্দ্র অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় ও যোগসূত্র স্থাপন। বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রকের মধ্যেও এই সমন্বয়সাধন বিশেষভাবে জরুরি।

স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন কাজ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাজকর্ম ও সংস্থাপনাগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন একান্তভাবে জরুরি। গৃহস্থ বাড়ি,

সমষ্টি এবং সকলের জন্য শৌচাগারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার, নিয়মিত দেখভাল এবং উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এই কাজ সম্ভব করে তোলা যেতে পারে। একই সঙ্গে শহরাঞ্চলের স্থানীয় পৌরসংস্থাগুলিকেও শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন, যাতে অনাময় সংক্রান্ত পরিষেবা তারা ঠিকমতো দিতে পারে।

সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ

দেশে উপযুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে ধাপে ধাপে কাজ করলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। শহরাঞ্চলের জন্য জাতীয় অনাময় নীতি অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি খাতে বিনিয়োগ যে কোনও ধরনের বর্জ্য নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করে তা শোধন বা অপসারণের কাজও নিশ্চিত করতে হবে।

প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার ও প্রয়োগ

আন্তর্জাতিক স্তরের বহু সংস্থাই জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধির বহু কার্যকরী সাজসরঞ্জাম ও কৃৎকৌশল উদ্ভাবন করেছে। সুলভ ইনটারন্যাশনাল-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যে সমস্ত ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি ও কৃৎকৌশল উদ্ভাবন করেছে তা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বঞ্চিত মানুষদের কাছে স্বাস্থ্যবিধানের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া

শহরের দরিদ্র মানুষ বা পাকাপাকিভাবে আশ্রয়ের বন্দোবস্ত নেই এ ধরনের মানুষরা অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও আরও নানারকম প্রতিবন্ধকতার জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষদের এই অভাব ও প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। শহরের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জাতীয় নীতিতে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এ খাতে বরাদ্দের অন্তত ২০ শতাংশ যেন শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের জন্য ব্যয় করা হয়। একই সঙ্গে গ্রামের অধিবাসীরা যাতে তাদের বসবাসের জায়গায় শৌচাগার নির্মাণ করে নিতে পারে, সেজন্য ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

ছোট ছোট শহরগুলির পক্ষে বর্জ্য নোংরা জলের শোধন তো দূরে থাক, উপযুক্ত নালা বা নিকাশিব্যবস্থা গড়ে তোলাও অসম্ভব। কারণ এই কাজে প্রয়োজন মূলধন বিনিয়োগ, যার সাহায্যে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। তার থেকেও বড় কথা হল, এ সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ব্যয়ভার বহন। বিদ্যুৎ বা জ্বালানি পরিশোধন ব্যবস্থা এবং পাম্পসেটের জন্য এক বিরাট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। বিনিয়োগের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা এই সমস্ত শহরের ধনী নাগরিকদের কাছ থেকে সবসময় পাওয়া যায় না, যদিও জলসহ অনাময় ব্যবস্থার বিভিন্ন সুযোগ তারা গ্রহণ করে থাকে। আধুনিক শহরগুলির বহু এলাকাই আজও ঠিকমতো নিকাশিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়। কারণ ওই সমস্ত এলাকার মানুষ বসবাস করে অনুমোদন ছাড়াই এবং অবৈধভাবে গড়ে ওঠা অঞ্চলে বা বস্তিতে, যেখানে সরকারি অনাময় ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় না।

চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনা

অনাময়ের সমস্যা নিরসনে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সংগতি সাধন বিশেষভাবে জরুরি। এর অর্থ হল যে সমস্ত এলাকায় এ সুযোগ এখনও পৌঁছায়নি সেই সমস্ত গ্রামে এই সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। একই সঙ্গে এই সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষদেরও এই ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে হবে, যাঁরা এখনও শহরের পৌর এলাকায় বাইরে রয়ে গেছেন।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ

এই কর্মসূচির সাফল্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজন ব্যাপক জনসমর্থন। এজন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সংস্থার মাধ্যমে রাজ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

নজরদারি ও মূল্যায়ন

রাজ্য, জেলা ও শহরে পর্যায়ে স্যানিটেশন কর্মসূচির বিষয়টি নিরন্তর দেখভাল করতে উপযুক্ত পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা গড়ে তোলা প্রয়োজন। নাগরিকদের নিয়ে গঠিত কমিটির পেশ করা রিপোর্টও খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে সফল জেলা ও শহরগুলির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা

জনস্বার্থে রূপায়িত হলেও স্যানিটেশনের কাজে আশাতীত সাফল্য দেখানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা ও শহরগুলিকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। পূর্ণ স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে যুক্ত বিভিন্ন জেলা ও শহরের মধ্যে এর ফলে এক সুস্থ প্রতিযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদি কর্মসূচি হিসেবে পরিচ্ছন্ন ভারত অভিযানের লক্ষ্যপূরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক রচিত "জাতীয় গ্রামীণ স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রকৌশল সূত্র ২০১২-২০২২" অনুসরণ করা যেতে পারে।

সহজ ঋণদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা

দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এক বিপুল সংখ্যক পরিবার তাদের বসবাসের স্থানে শৌচাগার নির্মাণ করতে অপারগ। তাই পানীয় জল ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত মন্ত্রক এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে সিকিউরিটি হিসেবে জমা রাখতে পারে, যাতে ওই মূলধনের সাহায্যে সমাজের দুর্বলতর মানুষদের নিজস্ব শৌচাগার নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়।

যোগাযোগ সূত্র ও কৌশল

এই কর্মসূচিকে সব দিক দিয়ে সফল করে তুলতে একটি জাতীয় যোগাযোগ কৌশল স্থির করা প্রয়োজন, যাতে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় যোগাযোগ কৌশল ব্যবস্থায় নমনীয়তা রক্ষার ওপর জোর দেওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং ধর্মীয় নেতাসহ অন্যান্য সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে তাঁরা স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কার্যকরভাবে সাধারণের মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটাতে পারেন। শৌচাগার নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে সামাজিক প্রচার-মাধ্যমকে যেমন ব্যবহার করা যেতে পারে, ঠিক তেমনিই ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমেও এ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটানো যায়। পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত জন, প্রতিবেশী এবং সহকর্মীরা মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে

যোগাযোগের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন।

যোগাযোগের আর-একটি কৌশল হিসেবে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে সেখানে স্যানিটেশন সম্পর্কে চলচ্চিত্র দেখানো যেতে পারে। প্রচারের একটি মাধ্যম হিসেবে পথনাটিকা, লোকসঙ্গীত, পুতুল নাটক ইত্যাদির আলাদা আলাদা গ্রুপ নিয়ে প্রতিটি ব্লকে একটি করে সাংস্কৃতিক দল গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ছাড়াও প্রতিটি গ্রামে সামাজিক বিপণন এবং সামাজিকভাবে উৎসাহ দানের জন্য অভিযান চালানো যেতে পারে। মানুষের আচরণগত অভ্যাস বদলে ফেলতে নতুন নতুন যোগাযোগ কৌশল উদ্ভাবন করা প্রয়োজন এবং অবশ্যই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের পথেই তা প্রয়োগ করতে হবে।

উৎসাহ দান কর্মসূচির বিকেন্দ্রীকরণ

স্যানিটেশনের কাজে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্ভব করে তুলতে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে এর ধারাকে নিরন্তর রাখা যায়। এ ছাড়াও যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এই কাজে আশাতীত সাফল্য দেখাবে তাদের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই যাতে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে জরুরি।

স্যানিটেশনের কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে উৎসাহ দিতে স্যানিটেশন ও জল সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত পরিদর্শকদের জন্য আর্থিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শুধুমাত্র শৌচাগার নির্মাণ করলেই চলবে না, সেখানে জলের জোগানও নিশ্চিত করতে হবে। যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত স্যানিটেশন গড়ে তুলে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তার ধারা অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তাদের জন্য পাইপ লাইন মারফত আরও বেশি করে জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এই সমস্ত কর্মসূচির বার্তা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে তৃণমূল স্তরে 'স্বচ্ছতা দূত' নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শৌচাগার নির্মাণে মানুষ যাতে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং দাবি পেশ করে তা নিশ্চিত করতে 'স্বচ্ছতা দূত'দের জন্য উৎসাহ দান কর্মসূচিও চালু করতে হবে। এর ফলে স্যানিটেশন কর্মসূচির আরও প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠবে।

গ্রামীণ জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত কমিটির সদস্যদের (VWHSC) বাধ্যতামূলকভাবেই বিভিন্ন রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী কমিটিতে স্থান দেওয়া উচিত। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে তাঁরাই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সফল রূপায়ণের কাজে যুক্ত থাকবেন।

সমষ্টির জন্য শৌচাগার

বিভিন্ন এলাকায় বাস স্ট্যান্ড এবং বাজার ছাড়াও সমষ্টির জন্য নির্মিত শৌচাগার ব্যবহার করে থাকেন প্রধানত নিজস্ব জমিজমা নেই এ ধরনের মানুষ এবং যাদের এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় কাজের সূত্রে যাতায়াত করতে হয় তারাই। এ ছাড়াও, জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের (NHAI) সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে সমষ্টির জন্য শৌচাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ছাড়াও পেট্রোল পাম্প, রেস্তোরাঁ এবং ধাবায় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা আবশ্যিক করতে সরকারি তরফে নির্দেশ জারি করা উচিত।

চেতনার প্রসার ও উন্মেষ

রাজ্য, জেলা তথা জাতীয় পর্যায়ে পূর্ণ স্যানিটেশনের চাহিদা সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের সচেতন করে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে, যাতে স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রাজনৈতিক দিক থেকে ভালোরকম সমর্থন আদায় করা যায়। শুধু তাই নয়, এই কর্মসূচি রূপায়ণে পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করতেও রাজনৈতিক সায় ও সমর্থন পাওয়ার বিষয়টিও বিশেষভাবে জরুরি।

প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে যাতে স্যানিটেশনের সুযোগ সম্প্রসারিত হয় তা নিশ্চিত করা প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের একটি বাধ্যতামূলক কাজ। এই মর্মে রাজ্য সরকারগুলির সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

এই অভিযানকে সফল করে তুলতে স্কুলপড়ুয়াদেরও উৎসাহিত করা উচিত। তারা হয়ে উঠতে পারে পরিবর্তনের দূত, কারণ এই অভিযানে তাদের ভূমিকা ও অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাথমিক পর্বে তারা শুধুমাত্র নিজেদের জীবনেই পরিচ্ছন্নতার নীতি প্রয়োগ করবে না, একই সঙ্গে তারা এই বার্তা বহন করে নিয়ে যাবে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে। শুধু তাই নয়, দেশের কোনও স্কুলই যাতে পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। সম্প্রতি রাজধানীতে আয়োজিত "আমার বিদ্যালয়—আমার কণ্ঠস্বর—শিশুদের জন্য মুক্ত সংসদ" শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এ কথাই বারংবার উঠে এসেছে যে স্কুলে স্যানিটেশন ও বিশেষ করে পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের অভাবই স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ। ওই অনুষ্ঠানে এই বিষয়টিই তুলে ধরা হয় যে স্কুলে পরিচ্ছন্নতার অভাবে অনেক ছাত্রছাত্রীই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। কোনও কোনও শিশু এই পরিচ্ছন্নতার অভাবে স্কুলে অসুস্থও হয়ে পড়ে। তাই তাদের অভিভাবকরা তাদের স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

সিকিম রাজ্যটিতে 'বাল পঞ্চায়েত'-এর যে ধারণা গড়ে উঠেছে তা দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এই বাল পঞ্চায়েত তাদের সহপাঠীদের স্কুলে হাজির হতে উৎসাহিত করে তোলে। স্কুলে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ছাড়াও সাফাই অভিযানেও তারা নিজে থেকেই শামিল হয়। এই কাজে তাদের শিক্ষকরাই আগে শামিল হতেন এবং অন্যদেরও অংশগ্রহণে উৎসাহ জোগাতেন। স্কুলে শৌচাগার নির্মাণে শিক্ষক, পঞ্চায়েত, ব্লক কর্মী এবং সমাজের অন্যদের সঙ্গে বাল পঞ্চায়েতের সদস্যরাও শামিল হয় তাদের শ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে। তাই স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সফল করে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও উদ্যমকে একটি প্রাক্‌শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মহিলাদেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ গৃহস্থালির পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি দেখভাল করেন মূলত তাঁরাই। তাই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে তাঁদেরও যে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তুলতে হবে। গৃহস্থালির কাজকর্মে

নিজেদের পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও পরিবারের শিশু ও বড়দেরও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করতে পারেন একমাত্র মহিলারাই।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের ৭০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারই শৌচাগারের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই মন্দির বা দেবালয় নির্মাণের থেকেও শৌচাগার গড়ে তোলা যে আরও বেশি জরুরি—এ কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সমস্ত গ্রামীণ পরিবারে শৌচাগারে সুযোগসুবিধা রয়েছে সেখানেও তা সঠিকভাবে বা পুরোপুরি মাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে না। রিসার্ভ ইন্সটিটিউট ফর কমপ্যাশনেট ইকনমিক্স (RICE) এ ব্যাপারে এক সমীক্ষায় দেখাচ্ছে যে, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে যে সমস্ত পরিবারে অন্তত একটি করে শৌচাগার রয়েছে, সেখানেও পরিবারের অন্তত একজন করে সদস্য তা ব্যবহার না করে বাইরের খোলা মাঠ বা উন্মুক্ত অন্য কোনও স্থানে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে ফেলতে অভ্যস্ত। বলতে গেলে এই ধরনের যে সমস্ত পরিবারে এই সমীক্ষা চালানো হয় তার ৪০ শতাংশেই এই মানসিকতা লক্ষ করা গেছে। সমীক্ষায় তাই বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র শৌচাগার নির্মাণে মানুষকে উৎসাহ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, একই সঙ্গে ওই শৌচাগার ব্যবহারে মানুষ যাতে ইচ্ছুক, আগ্রহী ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেজন্য তাদের আচরণগত পরিবর্তনও একান্ত জরুরি। শৌচাগার ও সুস্বাস্থ্য—এই দুটি বিষয় যে পরস্পর সংযুক্ত তা উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যেক নাগরিককেই।

দেখভাল ও নজরদারি

এই ধরনের একটি বিশাল কর্মসূচির দেখভাল ও নজরদারি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি একটি বিষয়। তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের প্রকৃত তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাই প্রয়োগ করা প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন ভারত অভিযানের ক্ষেত্রেও। বি পি এল কার্ড নম্বর এবং আধারকেও এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে পরিবার চিহ্নিত করার কাজে।

সুশীল সমাজের ভূমিকা

স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সফল করে তুলতে সুশীল নাগরিক সমাজেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কর্মসূচি রূপায়ণের অগ্রগতির ওপর নজর রেখে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব পালন করতে পারে সুশীল নাগরিক সমাজ।

দক্ষতা বৃদ্ধি

এই কর্মসূচি রূপায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টিও উপেক্ষিত হলে চলবে না। স্যানিটেশনের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য নাম করা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়সাধন করা যেতে পারে। আর এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার কাজ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় গ্রামোন্নয়ন সংস্থা যেভাবে গঠন করা হয়েছে, ঠিক সেই পথ অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের উচিত জল ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত একটি জাতীয় স্তরের সংস্থা গড়ে তোলা। এই সংস্থার কাজ হবে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার। এই ধরনেরই একটি প্রস্তাব ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ২০১২-১৭ সালের দ্বাদশ পরিকল্পনাকালের গৃহস্থালির জল ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে।

রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে একযোগে স্যানিটেশনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার প্রসার, পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে সার্বিক স্যানিটেশনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সরকারের প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থন। এ ছাড়াও কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির (CSR) পরিধির মধ্যে থেকে বড় বড় শিল্পোদ্যোগ সংস্থাগুলিরও উচিত এই কাজকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে আসা। CSR-এর আওতায় যে তহবিল রয়েছে তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত মাত্রায় শ্রমশক্তি ও অন্যান্য সমর্থন নিয়ে ২০১৯ সালের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যের বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে।❑

[লেখক যোজনা কমিশনের যুগ্ম উপদেষ্টা।
email: knp.pathak@gmail.com]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

মিশন নির্মল গ্রামবাংলা

গ্রামাঞ্চলেই ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ বসবাস করে এবং এই বিপুল জনগোষ্ঠীর বিকাশ ছাড়া জাতীয় উন্নয়নের চিত্রটি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। বলা বাহুল্য, এ যুক্তি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুজলা-সুফলা বাংলাকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তোলা কীভাবে সম্ভব হতে পারে জানাচ্ছেন **সুস্মিতা ঘোষ।**

'গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প', 'নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প', 'সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধান অভিযান', 'নির্মল ভারত অভিযান'—বিভিন্ন সময়ে নাম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' নামে পরিচিতি পেয়েছে। গ্রামের প্রতিটি পরিবারে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে পারিবারিক ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ ও তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই মিশন। আর স্বচ্ছ সুন্দর বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মিশন নির্মল বাংলা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

খোলা মাঠে বা যেখানে-সেখানে মলত্যাগের অভ্যাস একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি দূর করার জন্য ২০১৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের কোনও গ্রামের কোনও ব্যক্তি যাতে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ না করে, তার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। তৈরি হয়েছে মিশন নির্মল বাংলার ওয়েবসাইট (www.wbsanitation.org.in), যার শুভ সূচনা হয়েছে গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে। প্রত্যেক বছর ১৯ নভেম্বর দিনটি এখন 'ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে' হিসেবে পালিত হয়।

বিগত ১২ বছরে এই রাজ্যে গ্রামীণ এলাকায় পারিবারিক শৌচাগার তৈরি হয়েছে ৮০ লক্ষেরও বেশি। কিন্তু কমবেশি ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮১৩টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৬৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৩০টি পরিবারেরই পারিবারিক শৌচাগার ছিল না (সারণি-১)। ২০১২-র বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী সারা রাজ্যে ওই গণনার পরে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৮৫টি। এর মধ্যে ২০১৩-১৪ সালে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এরকম পরিবারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৯৬, আর ২০১৪-১৫ সালে (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৩০টি বাড়িতে পারিবারিক শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। সারা দেশের নিরিখে ২০১২-র বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী, যেখানে গ্রামীণ মোট পরিবারের সংখ্যা ১৮ কোটি ১২ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৮৪ থাকলেও শৌচাগারবিহীন পরিবারের সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৪৮টি। গণনার পরে সারা দেশে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৯৬টি পরিবারে। পরবর্তীতে ২০১৩-১৪ সালে শৌচাগার নির্মিত হয় ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৩৯টি পরিবারের জন্য এবং ২০১৪-১৫ সালে (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) ২০ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৪৯টি পরিবারের জন্য শৌচাগার নির্মিত হয় (সারণি-২)।

যে শৌচাগারগুলি অতীতে তৈরি হয়ে গিয়েছিল, অনেকাংশে দেখা গেছে তার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ব্যবহারই হয়নি। শৌচাগারগুলি স্বল্প মূল্যের হওয়ায় এর বেশি অংশই ভেঙে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে ৬০ লক্ষ নতুন শৌচাগারের পাশাপাশি নষ্ট হয়ে যাওয়া শৌচাগারগুলিকে নতুন করে গড়ে তোলার সমস্যা সামনে চলে আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে শৌচাগারের অভাবে স্কুলছুট না হয়, সেই ভাবনা থেকেও প্রতিটি স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অন্তত একটি করে আলাদা শৌচাগার নির্মাণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেই অনুযায়ী রাজ্যে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার শৌচাগার তৈরি করতে পারলেই এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হত। শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে যেমন ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত নির্দিষ্ট করা আছে, তেমনি ছাত্রছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি স্কুলে আনুপাতিক হারে শৌচাগার ও ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর এই হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে প্রায় ৬১ হাজার 'স্কুল টয়লেট ব্লক' তৈরি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতেও শিশুদের ব্যবহার-উপযোগী শৌচাগার নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির নিজস্ব জমি বা ঘর না থাকার জন্য, কোথাও বা বিতর্কিত জমিতে বা অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে কেন্দ্রের পরিকাঠামো ব্যবহার করার ফলে শৌচাগার নির্মাণের কাজটি ততটা গুরুত্ব সহকারে করা হয়ে ওঠেনি। তবে বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির যে পরিকাঠামো আছে, তার উপর ভিত্তি করে আগামী তিন বছরে ১১ হাজারেরও কিছু বেশি অঙ্গনওয়াড়ি শৌচাগার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই হাটবাজার, বাসস্ট্যান্ড, যেখানে নিয়মিত প্রচুর মানুষের সমাগম হয়, সেখানেও শৌচাগার নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রেও সারা রাজ্যে ১৫ হাজারেরও কিছু বেশি 'স্যানিটারি কমপ্লেক্স' তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সারণি-১

২০১২-র বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী সারা রাজ্যে পারিবারিক শৌচাগারের লক্ষ্যমাত্রা এবং সাফল্যের খতিয়ান (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	মোট পরিবারের সংখ্যা (গণনা ২০১২)	শৌচাগার বিহীন পরিবারের সংখ্যা			গণনার পরে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা	২০১৩-১৪ সালে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা	২০১৪-১৫ সালে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা
রাজ্য—পশ্চিমবঙ্গ			বিপিএল	এপিএল	মোট			
১	বাঁকুড়া	৭০৯৪৩১	২৩৫৫১০	২৪০৯৬৫	৪৭৬৪৭৫	৩০৫১	৪৪৯	২৬০২
২	বর্ধমান	১১৯৪৬৮১	১৯১৩১৬	২৪০৩৭৪	৪৩১৬৯০	৮৪৭০০	৪৪২৯২	৪০৪১০
৩	বীরভূম	৭১৭২০২	২৩৫১১০	২৫৮৮৯৪	৪৯৪৪০০৪	১৯৭৬৭	৬১৩০	১৩৬৩৮
৪	কুচবিহার	৬৭২১৯৯	১৬৩২২৩	১৫২৪৪৭	৩১৫৬৭০	৫৬১৭	২১৭	৫৪০১
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	৩২৮৬১০	৯৫৯৮৩	১০৫৭২৯	২০১৭১২	১৭৯৬৯	৯২৭৭	৮৬৯৩
৬	দার্জিলিং	১৪৪৪৯৪	৫৩৫৩০	৩০২২১	৮৩৭৫১	২৮৫	০	২৮৫
৭	হুগলি	৯৩৩২৫১	১৩১৬৪৫	১৪৬৬২৬	২৭৮২৭১	৬০৬২৩	১০৪৮৮	৫০১৩৫
৮	হাওড়া	৬৫৩৬০৯	৭৭৬৭১	১২৮৮০৫	২০৬৪৭৬	২৭৭৪	১৬০	২৬১৪
৯	জলপাইগুড়ি	৬৯৯৬৩২	১৬৯৬৬৭	১৬৫০০০	৩৩৪৬৬৭	৩২৫০	৫০	৩২০১
১০	মালদা	৭৭৩৯২৯	২১৫৮২৫	২৯২৮৩৫	৫০৮৬৬০	৫১০২০	৩৮৭৫৪	১২২৬৭
১১	পূর্ব মেদিনীপুর	৯৬৮৭৯৭	৯৩৭৮৫	১২৫৯৬২	২১৯৭৪৭	৪৯০১	০	৪৯০২
১২	পশ্চিম মেদিনীপুর	১১৪৬৬২২	৩৩৬৮৯৫	২২৪৯১০	৫৬১৮০৫	১৬৪৫	৩৫৪	১২৯১
১৩	মুর্শিদাবাদ	১৩২০৭৬২	৩৪৫৭৮১	৩৯০৮৩২	৭৩৬৬১৩	২২৬০৭	৫০২২	১৭৫৮৫
১৪	নদীয়া	১০১০৫২৩	১৫৭৩৭১	১৫২৫১৫	৩০৯৮৮৬	১১৬৪৬১	৪৯৫৯০	৬৬৬০১
১৫	উত্তর ২৪ পরগনা	৯৮৭৫২৬	৮৬৫২৭	৯৪৯২২	১৮১৪৪৯	৮৮৮০	১৮৬	৮৬৯৬
১৬	পুরুলিয়া	৫৪৫৫৪০	২০১১৬৭	১৮০৪৭৯	৩৮১৬৪৬	৪০৭৫	১৭৩৩	২৩৪২
১৭	শিলিগুড়ি	১৪৫১৯৯	২৩৫৯৪	৫০৫৬৫	৭৪১৫৯	২৪৮৮	১	২৪৮৭
১৮	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	১৫৬৫৭২৭	২৩৬২৯৬	৩৪৪১৬৭	৫৮০৪৬৩	২২৮৭৪	১৩০৩৯	৯৮৩৫
১৯	উত্তর দিনাজপুর	৬৫০০৭৯	১৫৪৪৬২	২৪৬২২৪	৪০০৬৮৬	২৭৯৮	২৫৪	২৫৪৫
মোট		**১৫১৬৭৮১৩**	**৩২০৫৩৫৮**	**৩৫৭২৪৭২**	**৬৭৭৭৮৩০**	**৪৩৫৭৮৫**	**১৭৯৯৯৬**	**২৫৫৫৩০**

রাজ্যে যেহেতু ৩৩৪৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির ব্যবস্থা জরুরি হয়ে পড়েছে।

পরিকাঠামো তৈরি করতে উদ্যোগ ও অর্থের প্রয়োজন সুনিশ্চিত করলেই হয় না, এর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন আনা। পরিবারের সকলেই যাতে শুধুমাত্র শৌচাগার ব্যবহার করেন, শিশুর মলও যাতে কেবলমাত্র শৌচাগারে ফেলা হয়, পরিবারের সকলেই যাতে শৌচের পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেয়, সেই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। এককথায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। উদ্দেশ্য খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ করে নির্মল গ্রাম তৈরি করা। অর্থাৎ, প্রত্যেকে শৌচাগার ব্যবহার করবে, নিরাপদ পরিস্রুত পানীয় জল পান করবে, ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্ন থাকবে, সেইসঙ্গে সমষ্টিগতভাবেও পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করবে। গ্রামের সমস্ত সংস্থায় (অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিদ্যালয় কেন্দ্র ইত্যাদি) সঠিক স্বাস্থ্যবিধানের উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকবে ও তার ব্যবহার হবে। তবেই 'ওপেন ডেফেকেশন ফ্রি ভিলেজ' অর্থাৎ উন্মুক্ত অঞ্চলে শৌচকর্মের অভ্যাস মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলা যাবে। তাহলেই মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।

তথ্য বলছে, দেশের খোলা জায়গায় মলত্যাগে ৬.৩ শতাংশ ঘটনা ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। এর মধ্যে শহরাঞ্চলে মাত্র ১১.২ শতাংশ পরিবার খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে। আর গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১.৩ শতাংশ। যদিও গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গের পরিবারগুলিতে শৌচাগার ব্যবহার অনেকাংশে বেড়েছে। তবুও প্রায় ৮২.৫৮ লক্ষ (৪১.২ শতাংশ) বাড়িতে শৌচাগারের সুবিধা নেই, যা জাতীয় গড়ের (৫৩.১ শতাংশ) তুলনায় কম। এর মধ্যে ৭০.৩৭ লক্ষ (৫৩.১ শতাংশ) গ্রামাঞ্চলে এবং ৭.১৪ লক্ষ (১৫ শতাংশ) শহরাঞ্চলের পরিবার। শৌচাগারবিহীন পরিবারের সংখ্যা বেশি। ২০১১ সালের পঞ্চদশ জনগণনা অনুযায়ী শৌচাগারবিহীন পরিবারের অর্ধেক অংশই রয়েছে ৯টি জেলায়। এই জেলাগুলি হল মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মালদা, পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর। তথ্য বলছে, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার ৬০ শতাংশেরও বেশি পরিবার খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে।

২০১৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে নির্মল পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দুটি জেলায়

সারণি-২

২০১২-র বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী সারা দেশের পারিবারিক শৌচাগারের লক্ষ্যমাত্রা এবং সাফল্যের খতিয়ান (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	রাজ্যের নাম	মোট পরিবারের সংখ্যা (গণনা ২০১২)	শৌচাগারবিহীন পরিবারের সংখ্যা			গণনার পরে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা	২০১৩-১৪ সালে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা	২০১৪-১৫ সালে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা
			বিপিএল	এপিএল	মোট			
১	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৪৫৬৪৬	৪২৭৮	১৬৮২৬	২১১০৪	০	০	০
২	অন্ধ্রপ্রদেশ	৭৫০৭২৬৮	৪৭৬১৮০০	১৯৫৬৩০	৪৯৫৭৪৩০	৭৯১০৩	১৩৮৩	৭৭৭২১
৩	অরুণাচলপ্রদেশ	১৭৫৯২৪	৭৪১০৬	২৮৮২৫	১০২৯৩১	৫২৬৫	১১৩৪	৪১৩২
৪	অসম	৫৬০৫৬২৪	৫০৮৮৯৯	২৮০৪৭২৫	৩৩১৩৬২৪	৪১২২৫	৯১৯২	৩২০৩৩
৫	বিহার	২১৩৯৭৩৩৫	৮৯৭১৫৯২	৭৮৪৪৭১৯	১৬৮১৬৩১১	৪৪৫৬৮	১০২২	৪৩৫৬৮
৬	চণ্ডীগড়	৪৪২৯১৩৮	৮১৯৭৫৫	১৮৫৬৯১৫	২৬৭৬৬৭০	৩০৭০৬	৫১৩	৩০১৯৬
৭	গোয়া	১৮৬৩৯২	২৮৪৩২	৪৪৭৯২	৭৩২২৪	০	০	০
৮	গুজরাত	৭০২৯১৭৯	৮৮১৫০৪	২৪৩৯৫৪৩	৩৩২১০৪৭	১৩৬৮০১	১৪১৭১	১২২৬৩৫
৯	হরিয়ানা	৩০৬৭৯০৭	২২২২৬৩	৫৪১৬৮৩	৭৬৩৯৪৬	৬৭৯৩১	৫১৪৪	৬২৭৯০
১০	হিমাচলপ্রদেশ	১৪৮৩৫৬৯	৩৫১৫৫	১৭২০০৯	২০৭১৬৪	৩৯৪৯৭	৩৪৯৬	৩৫৯৯৪
১১	জম্মু ও কাশ্মীর	১৬৮৪৩৭৪	৫৮০১৯৬	৬৯৩৪০৯	১২৭৩৬০৫	২০০৮	৭৮০	১২২৮
১২	ঝাড়খণ্ড	৫১৫৯২১২	১২৪৬১০২	২৪৬৭৩৮৬	৩৭১৩৪৮৮	৪৯২১৫	২৭৬১	৪৬৪৫৪
১৩	কর্ণাটক	৮৫১৪৫৫৪	৩৫৯৩৮৩৮	১৯০৫৪৩২	৫৪৯৯২৭০	৩৪৬৬৭৮	৩১৯৩৭	৩১৪৭৪৪
১৪	কেরালা	৫১৯৮৪৬৭	২৫৪৩৪৫	২২৪৪৮	২৭৬৭৯৩	২৪৫৬৩	২৬০৬	২১৯৫৭
১৫	মধ্যপ্রদেশ	১২২৪৪০৬৩	৩৬২৫৮৪২	৫৪১৩৬৫৫	৯০৩৯৪৯৭	২৮৪৯৬৬	১১৮৬	২৮৩৭৮৭
১৬	মহারাষ্ট্র	১২৫৪১২৬৮	২১০১৬০৪	৪৪১৪৯৫৮	৬৫১৬৫৬২	১৮৮৭৬৪	৭০০৭৪	১১৮৬৯৭
১৭	মণিপুর	৪৩১৩৭৮	৭৪১৭৩	১৩৫৯৭৩	২১০১৪৬	৯০২২	৬৬	৮৯৫৬
১৮	মেঘালয়	৪১১৪৮৭	১২৩১৩১	৭৩৪৩১	১৯৬৫৬২	১৭৬৩৫	৪৩৯৭	১৩২৩৯
১৯	মিজোরাম	১৩০০০৪	১৩৭৫৫	১৯৯৯৯	৩৩৭৫৪	৪৬১	০	৪৬১
২০	নাগাল্যান্ড	২৬২৯৩৯	১২০৫৮২	১১৪৬৫	১৩২০৪৭	০	০	০
২১	ওড়িশা	৮৬২৫৬৪১	৩৩১১০৭২	৩৯৮৩২৪০	৭২৯৪৩১২	২৬০৪৬	২৯৯	২৫৭৭৪৭
২২	পঞ্জাব	৩১৯২০৯১	২০৩১৩১	৫৮৯৩১৯	৭৯২৪৫০	২১৬৯	০	২১৬৯
২৩	রাজস্থান	১১৫১১০০৬	১৫৫৮২৯৪	৬৮১১৩৪৪	৮৩৬৯৬৩৮	৯১৯৫৩	৫১৫৮	৮৬৭৯৭
২৪	সিকিম	৫৮৩৬১	১০৩৭১	৩৯৭	১০৭৬৮	২৭৫৫	০	২৭৫৫
২৫	তামিলনাড়ু	৯৫৪০২৯৯	২০২৭৫৮৫	৩২৩৯৮৮৫	৫২৬৪৭০	১৮৮৫১৩	৯৪৪৬	১৭৯০৭৫
২৬	তেলেঙ্গানা	৪৫২৪৫৫৪	৩২২৪৫৫৭	১৩৭১১৭	৩৩৬১৬৭৪	৬৯৪৯৯	১১৮	৬৯৩৮১
২৭	ত্রিপুরা	৮১৬৬৩১	১২৮৪০৫	১৭৭০৫২	৩০৫৪৫৭	১১১৩৭	৫৯৫	১০৫৪২
২৮	উত্তরপ্রদেশ	২৮৭২০৮৪৪	৪৮৬৬৬৬৬৬	১৩৭৩১৬৭৮	১৮৫৯৮৩৪৪	৩০৭৩৫৪	৯৫৫২৮	২১১৮৩৭
২৯	উত্তরাখণ্ড	১৫৫১৪১৬	২০০০৬৯	৩০৯৭৬১	৫০৯৮৩০	২৬৭৫৯	৩৩৭	২৬৪২৪
৩০	পশ্চিমবঙ্গ	১৫১৬৭৮১৩	৩২০৫৩৫৮	৩৫৭২৪৭২	৬৭৭৭৮৩০	৪৩৫৭৮৫	১৭৯৯৯৬	২৫৫৫৩০
	মোট	**১৮১২১৪৩৮৪**	**৪৬৭৭৬৮৬০**	**৬৩৬৫৬০৮৮**	**১১০৪৩২৯৪৮**	**২৫৩০৩৯৬**	**৪৪১৩৩৯**	**২০৮৮৮৪৯**

পরীক্ষামূলকভাবে 'সম্প্রদায়চালিত সম্পূর্ণ শৌচব্যবস্থা'-র (কমিউনিটি লেড টোট্যাল স্যানিটেশন বা CLTS) উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রথমে এলাকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। CLTS শৌচাগার নির্মাণের পরিবর্তে শৌচ প্রণালী বা ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করে। কমিউনিটির বাইরের বা ভেতরের সহায়করা উৎসাহ, সহযোগিতা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কাজ করে থাকে। কোনও বিশেষ ব্যক্তির পরিবর্তে CLTS সমস্ত সম্প্রদায়কে গুরুত্ব দেয়। খোলা জায়গায় পায়খানা বন্ধ করার ফলে সমষ্টিগতভাবে যেমন লাভ হয়, তেমনি আরও সহযোগিতামূলক কাজকর্মে উৎসাহ আসে। আর এর ফলে মানুষ একত্রিত হয়ে একটি পরিচ্ছন্ন বা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যোগী হয়। আর এই সুবিধা ওই সমষ্টির প্রত্যেকেই ভোগ করতে পারে। CLTS-এর বৈশিষ্ট্যই হল যে, এখানে কোনও পরিবারভিত্তিক শৌচাগার সরঞ্জামের জন্য অনুদানের কথা বলা হয় না। আবার কখনোই কোনও মডেলের ভিত্তিতে শৌচাগার নির্মাণের নির্দেশও দেওয়া হয় না। CLTS-এর সাধারণ ও বিশেষ শর্ত হল ওই গোষ্ঠীর প্রতিটি পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার

পরিবেশ সৃষ্টি করা। এরই সঙ্গে ওই এলাকাটিকে উন্মুক্তাঞ্চল শৌচকর্মের অভ্যাস বিহীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর এর জন্যই প্রয়োজন 'ট্রিগারিং'।

২০০৬ সালের মে মাসের ঘটনা। হিমাচলপ্রদেশের সোলান জেলার একটি গ্রাম। মলত্যাগের জন্য ব্যবহৃত খোলা জায়গা পরিদর্শনের জন্য একটি দল গিয়েছিল। নীনা গুপ্তা নামে একজন মহিলা একটি পাথরের পাতলা টুকরোয় মানুষের মল সংগ্রহ করে নেয়। এরপর আলোচনার সময় ব্যবহৃত মানচিত্রের কাছে ওই পাথরের খণ্ডটি নিয়ে আসলে তার সঙ্গে যাঁরা যাঁরা ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, তারা সবাই অবাক হয়ে যান। এরপর নীনা একটি প্লেটে ভাত নিয়ে ওই পাথরখণ্ডের পাশে রেখে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে অনেক মাছি চলে আসে। সকলেই লক্ষ করলেন, মাছিগুলি একবার ভাতের প্লেটে, আর-এক বার পাথরখণ্ডের মলে বসছে। চারপাশের উপস্থিত লোকজন এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যায়। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার বমি করতেও শুরু করেন। মলের গন্ধে রাস্তার একটি কুকুরও চলে আসে। এরপরে আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। উপস্থিত সকলেই বলাবলি করতে থাকেন যে, খোলা জায়গায় মলত্যাগ করার ফলেই তারা একজন আর-এক জনের মল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থাৎ ট্রিগারিং-এর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

CLTS-এর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দিক আছে। বাংলাদেশের কেওরজোর উপজেলার হাওর অঞ্চলে প্রতি বছর বন্যায় বিস্তীর্ণ এলাকার ধান নষ্ট হয়ে যেত। ওই উপজেলার কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে CLTS-এর সফল প্রয়োগ করেছিল। ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংহতি এবং বন্ধুপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় তারা ODF-এর স্বীকৃতি পেয়েছিল। আর এই কাজে তারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তা পেয়েছিল। মোট ১০টি গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে গ্রামের পাশে ৫ কিলোমিটার লম্বা বাঁধ মেরামতির জন্য বাঁধ রক্ষা সমিতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। এলাকার মানুষ মাত্র ২ সপ্তাহের মধ্যে ২ হাজার ৩৭৯ মার্কিন ডলার অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিল। বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরঞ্জামের ব্যবস্থা যেমন সমিতি করেছিল, তেমনি তারা খাবার সরবরাহেরও দায়িত্ব নিয়েছিল। আর এই কাজে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল এলাকার প্রান্তিক মানুষ ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকরা। ওই ক-টা দিন গোষ্ঠীর মানুষেরা উৎসবের মেজাজে ছিল। উপজেলা পরিষদের সদস্য মহম্মদ হবিবুল রহমনের মতে, গোষ্ঠীর এই ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ সকলকেই খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। যে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আগে মিলমিশ ছিল না, তাদের মধ্যেও একটা বন্ধুপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হতে দেখা যায়। এর মধ্যে দিয়ে বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কৃষিজীবী মহম্মদ আসরফ জানিয়েছিলেন, শেষ কোন বছর এত ধান উৎপাদন হয়েছিল তা তারা মনে করতে পারেন না। আর এই সবই সম্ভব হয়েছে বাঁধ সুরক্ষার জন্য। উপজেলা পরিষদের নেতৃত্ব নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আগে সংঘর্ষ দেখা দিলেও CLTS-এর উদ্যোগ সবকিছু মিটিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ফলে ধনী সম্প্রদায়ও গরিবদের উপর অত্যাচার বন্ধ করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে কোনও কোনও গ্রামবাসীর মুখে শোনা গেছে যে, কাজ খুঁজতে তাদের আর শহরে যেতে হয়নি। এক বছর ভালো ফসল হওয়াতেই পরিবারগুলির খাদ্য নিরাপত্তায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল ইথিওপিয়ায়। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ইথিওপিয়ার আররা মিঞ্চ-এর কাছে উলিটানা বোকোলে গ্রামে CLTS-এর ট্রিগারিং করা হয়েছিল। প্রতিদিন কফি অনুষ্ঠান মারফত CLTS-এর প্রসার ঘটছিল। ওই এলাকার যে সমস্ত পরিবার তাদের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছিল, তারা অন্যদের ডেকে দেখান যে কী কী কাজ তারা করেছেন। প্রথম ৪টি পরিবার নিজেরা শৌচাগার নির্মাণ করেছিল। কিন্তু বাকি ২৬টি পরিবার চিরাচরিত 'ডেবো' পদ্ধতি পুনরুদ্ধার করেছিল, যা তখন প্রায় অতীত হয়ে গিয়েছিল। ট্রিগারিং হওয়ার ২ মাসের মধ্যে ওই গ্রাম ODF ঘোষিত হয়।

খোলা জায়গায় পায়খানা বন্ধ করা থেকে যে খাদ্য নিরাপত্তা আনা সম্ভব এরকম অনেক উদাহরণ আছে। বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার দরিদ্রতম গ্রামগুলির মধ্যে জালাগিরি একটি। এলাকার মানুষ বার্ষিক খাদ্যাভাব বা 'মঙ্গা'-য় জর্জরিত ছিল। মঙ্গার সময় গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলিকে উপোস করতে হত কিংবা অন্য জায়গায় কাজের খোঁজে চলে যেতে হত। কেউ কেউ সরকারি ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করতেন। ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে CLTS-এর সূচনা হয়েছিল ওই গ্রামে ঠিক মঙ্গার আগেই। ওই সময় গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা যেভাবে গরিব সম্প্রদায়ের ওপর নজর রেখেছিল বা দেখাশোনা করেছিল, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। ওই এলাকায় একসময় 'মাচ-আলু'-র চাষ হত, যা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। গ্রামের সবক-টি পরিবার মিলে ঠিক করল যে, তারা বড়ির আশেপাশে এর চাষ করবে। এক সপ্তাহের মধ্যে ৪ হাজারেরও বেশি গর্ত খুঁড়ে ফেলে গ্রামের প্রায় সবক-টি পরিবার গণ আন্দোলনের মতো 'মাচ-আলু'-র বীজ পুঁতে ফেলেছিল। এমনকি যাদের জমি ছিল না তারাও বাড়ির দালানে ৪-৫টি বীজ পুঁতে ফেলে। যাদের জমি ছিল তারা সুপারি গাছ আর অন্যান্য ফসলের মাঝে সারি বেঁধে আলু চাষ করার অনুমতি দিয়েছিল। ৮ মাসের মাথায় আলু উৎপন্ন হল। পরের বছর মঙ্গার সময় পুরো পরিস্থিতিটাই পালটে গেল। টন টন আলু উৎপাদন হয়েছিল। সেই আলু নিজেদের প্রয়োজনে রেখে বাড়তি অংশ বাজারে বিক্রি করে অনেকেই লাভের মুখ দেখেছিলেন। তাই CLTS মঙ্গার সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিল জালাগিরি গ্রামকে।

কঠিন ও তরল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন, পারিবারিক শৌচাগারের যথাযথ ব্যবহার তৈরি করবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম। এলাকার মানুষ পাবে ODF ভিলেজ। একে একে তৈরি হবে ODF তথা নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত, নির্মল পঞ্চায়েত সমিতি, নির্মল জেলা পরিষদ। আর সফল হবে মিশন নির্মল গ্রামবাংলা।❑

বায়ো-শৌচালয়-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এক নয়া পন্থা

খোলা জায়গায় মলত্যাগ করা এদেশে মামুলি ঘটনা। এ ধরনের শৌচ-অভ্যাস শুধু দৃষ্টিকটুও লজ্জাজনকই নয়, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকরও বটে। সচেতনতা, সদিচ্ছা, জল ও পরিকাঠামোর অভাবে পরিস্থিতি ক্রমশ আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এই নিবন্ধে **ড. হাজাইফা খোরাকিওয়ালা** *জানাচ্ছেন কীভাবে বায়ো-শৌচালয়ের ব্যবহার সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করতে পারে।*

খোলা জায়গায় শৌচকার্য—বারবার ঘুরেফিরে এই লজ্জাজনক সমস্যার কথা শুনতে হয় এদেশে। হাতি, সাপুড়ের মতো খোলা জায়গায় শৌচকার্য আর এই দেশ পৃথিবীবাসীর কাছে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। পৃথিবী জুড়ে যত মানুষ খোলা জায়গায় শৌচকার্য করেন তাদের ৬০ শতাংশেরই বাস ভারতে। ৬২ কোটিরও বেশি মানুষ; অর্থাৎ কিনা ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি খোলা জায়গায় শৌচকার্য করেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এদের সংখ্যাটা কমার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এদেশের শহরাঞ্চলে ১৮ শতাংশ মানুষ যেখানে খোলা জায়গায় শৌচকার্য করেন সেখানে গ্রামাঞ্চলে এই অভ্যাস ৬৯ শতাংশ মানুষের।

শৌচালয় না থাকার ক্ষতিকর প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রেও পড়ে। গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই সহশিক্ষামূলক। সেখানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। কেন-না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যায় না। বেশির ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই বয়ঃসন্ধির পর ছাত্রীরা স্কুলছুট হয়ে পড়ে। কারণ বিদ্যালয় চত্বরে তাদের জন্য কোনও শৌচালয় থাকে না।

শুধুই নান্দনিকতার বিচার নয়

শুধু নান্দনিকতার প্রশ্ন এখানে নয়, খোলা জায়গায় শৌচকার্য গুরুতর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপদ ডেকে আনতে পারে। জলের বিভিন্ন উৎস, যেমন—নদী, পুকুর, দীঘির জলের সঙ্গে মানব-বর্জ্য সহজে মিশে গিয়ে পানীয় জলের উৎসকেও দূষিত করে তোলে। আর্দ্র মরশুমে এই বিপদ আরও বেশি। কারণ গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থালিতে জল পরিস্রুত করার আধুনিক ব্যবস্থাপনা নেই বললেই চলে। তাই শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে টাইফয়েড, পেটের অসুখ, হেপাটাইটিস, ক্রিমির মতো রোগের প্রাদুর্ভাব লেগেই থাকে।

সেপটিক ট্যাংকও নিরাপদ নয়

প্রত্যেক বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের উদ্যোগকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা দরকার, যা সবার নজর এড়িয়ে যায়। প্রথাগত সেপটিক ট্যাংক এবং সোক-পিট বিশিষ্ট শৌচালয়ই মোটামুটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। এটি তৈরির খরচও অনেক কম। কিন্তু এই ধরনের শৌচালয়ের কিছু সমস্যাও রয়েছে। শৌচালয়ের নকশা ও নির্মাণ ঠিকমতো না হলে মানব-বর্জ্য ছিদ্রপথে চুঁইয়ে মাটির সঙ্গে মিশতে থাকে। এটা চলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। একে বন্ধ করা বা এর ওপর নজর রাখা সহজ নয়। বর্জ্য চুঁইয়ে মাটিতে মিশছে কি না তা সাধারণত স্থানীয় মানুষের চোখে পড়ে না। আর তাই নিজেরা নিরাপদে আছেন ভেবে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবেন না তারা। এতে বিপদ বাড়ে বই কমে না।

সমাধানের পথ—বায়ো-শৌচালয়

এই পরিপ্রেক্ষিতে বায়ো-শৌচালয়ই একমাত্র সমাধানের পথ। চিরাচরিত সেপটিক ট্যাংক বা সোক-পিটের পরিবর্তে এই ধরনের শৌচালয়ে থাকে 'বায়ো ডাইজেস্টার ট্যাংক'। এই ধরনের ট্যাংক আধুনিক জীববিজ্ঞানের সূত্র মেনে মানব-বর্জ্যকে পুরোপুরি জল বা জৈব গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। সাধারণ সেপটিক ট্যাংকের ক্ষেত্রে বর্জ্য পদার্থ নিজে থেকেই প্রথমে ধীরে ধীরে থকথকে আঠালো পদার্থ, তারপর সারে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে যথেচ্ছভাবে বর্জ্য পদার্থ চুঁইয়ে মাটিতে মিশতে থাকে। কিন্তু বায়ো-শৌচালয়ে বর্জ্য পদার্থ নিয়ে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম। এই ধরনের শৌচালয়ে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে সাহায্য করে এক ধরনের 'অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়া'। অর্থাৎ এই ব্যাকটেরিয়া বন্ধ ট্যাংকের ভেতরে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতেও জন্মাতে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়া বর্জ্য পদার্থকে জল ও জৈব গ্যাসের সঙ্গে পুরোপুরি মিশিয়ে দেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বায়ো-শৌচালয় প্রযুক্তি সক্রিয় জারণ এবং পুরোনো পদ্ধতিগুলি নিষ্ক্রিয় পচন বা বিয়োজন নির্ভর।

বায়ো-শৌচালয়ের অন্য অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি অনেক ছিমছাম। সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিট যে জায়গা নেয় তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ স্থানে বায়ো-শৌচালয় তৈরি করে ফেলা যাবে। সাধারণ শৌচালয়ের ক্ষেত্রে কয়েক মাস অন্তর সেপটিক ট্যাংক খালি করে পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু বায়ো-শৌচালয়ের ক্ষেত্রে সে ঝঞ্ঝাট নেই। কারণ এখানে বর্জ্য পদার্থের ৯০ শতাংশের বেশি জলে বা জৈব গ্যাসে মিশে যায়। এই ধরনের শৌচালয় প্রায় পঞ্চাশ বছর কোনও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই টিকে থাকে। অন্যদিকে সাধারণ সেপটিক ট্যাংকে প্রতি বছর মেরামতির প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই ধরনের ট্যাংক বদলাতে হয়।

জলের অভাব

আমাদের দেশে খোলা জায়গায় শৌচকার্যের অভ্যেস যে এখনও চলছে তার নেপথ্যে অন্যতম কারণ কিন্তু জলের সংকট। অনেক সময় দেখা যাবে যে বিশেষ ভাবে তৈরি শৌচালয় কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কারণ জলের অভাবে নালিপথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। গ্রামবাসী, এমনকি শহরাঞ্চলের বস্তিবাসীরা শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোনও রকমে একটা জলের পাত্র জনসাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয়ে বয়ে নিয়ে যান। শৌচালয় পরিষ্কারের জন্য বালতি ভর্তি জল তারা নিয়ে যান না। কারণ, হয় তাদের কাছে পর্যাপ্ত জল থাকে না, নয়তো জনসাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয় পর্যন্ত ভারী বালতি বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে। তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের শৌচালয়ের পাশাপাশি পর্যাপ্ত জল সরবরাহও নিশ্চিত করতে হবে। জলের অভাবে নির্মাণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যদি নালিমুখ বন্ধ হয়ে শৌচালয় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে অপচয় ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়?❑

[লেখক ওয়কহার্ড্ট ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা।
email: ceo@wockhardtfoundation.org]

স্বচ্ছ ভারত গড়তে সচেতনতার প্রসার ও আইনের অনুশাসনের গুরুত্ব

আমাদের দেশে আবর্জনা, অপরিচ্ছন্নতার শেষ নেই। এর মূল কারণ শুধু দারিদ্র্য বা অশিক্ষা নয়, গাফিলতিও বটে। অনেক সময়ে সরকারের তরফ থেকে শৌচাগার বানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, শৌচাগারের ব্যবহার সম্পর্কে জানানো সত্ত্বেও তা ব্যবহার করা হয়নি। রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও কম নয়। সবসময় জনসংখ্যার আধিক্যকে অজুহাত দিলেই চলে না। চীনের মতো জনবহুল দেশের দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। গ্রামে ও শহরে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন **তপন কুমার ভট্টাচার্য।**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দেশের মানুষকে পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার কাজে অনুপ্রাণিত করতে ওই দিন তিনি নিজে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামেন। সারা দেশ জুড়ে ওই একই দিনে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামেন আরও কয়েক লক্ষ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায় পরিচ্ছন্নতাকে সব থেকে ওপরে স্থান দিয়েছেন। এমনকি শপথ নেবার এক মাসের মধ্যেই ১৬ জুন দিল্লিতে তিনি স্বচ্ছ ভারত মিশনের কর্মসূচির কথা বলেন এবং ছ-মাসের মধ্যে দিল্লিকে ঝাঁ চকচকে করে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগের কারণ, ভারত একটি অপরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে পরিগণিত। ফলে বিদেশের কাছে আমাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত। ভারতকে একটি পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে তুলে ধরে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করাই প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য।

দশকের পর দশক ধরে দেশে এক অপরিচ্ছন্নতার আবহ গড়ে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে দেশবাসীর মধ্যে উদাসীনতা বাসা বেঁধেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত গরিব-বড়লোক প্রায় সকলের মধ্যেই এই উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। নিজের বাড়ির চৌহদ্দিটুকু পরিষ্কার থাকলেই হল। নিজেদের বাড়ির নোংরাও অনেকে রাস্তায় অথবা পাশের নর্দমা বা পুকুরে ফেলছেন। আমাদের চারদিকেই নোংরা আবর্জনা থিকথিক করছে। রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্লাস্টিক, থার্মোকল, বাচ্চাদের ডাইপার, সারমেয়র বিষ্ঠা এবং লেখার অযোগ্য দৃশ্যদূষণের আরও অনেক উপকরণ। এমনকি মৃত ব্যক্তির শয্যা ও অন্যান্য উপকরণও ডাঁই করে রাজপথে ফেলা হচ্ছে। নির্দিষ্ট জায়গায় পুরসভার ভ্যাট বা কালেক্টিং পয়েন্ট থাকলেও এবং গৃহস্থের বাড়ি থেকে পৌরসভার তরফে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকলেও সেইসব জায়গায় না ফেলে নাগরিকরা বাড়ির সামনে বা পেছনে খোলা জায়গায়, প্রতিবেশীর খোলা জমিতে, পুকুরে, ড্রেনে এইসব আবর্জনা ফেলছেন। মানুষ থুথু, পান বা গুটখার পিক ফেলছেন যত্রতত্র। খবরে প্রকাশ, মানুষ থুথু ও পিক ফেলে ফেলে হাওড়া ব্রিজের কাঠামোকে পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে, ফলে প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে। বড় বড় অফিস বিল্ডিংয়ে সিঁড়ির কোণায় ভগবানের মূর্তি খোদাই করেও এসব আটকানো যাচ্ছে না। ভ্যাটগুলোও উপচে পড়ছে। রাজপথের মোড়ে মোড়ে জঞ্জালের স্তূপ। স্থানীয় প্রশাসনের কাজও অনিয়মিত এবং সেইসঙ্গে রয়েছে সক্রিয়তার অভাব। তার ওপর নাগরিকদর এক বিরাট অংশের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এই গা-ছাড়া ভাব। ফলে লোকালয় আরও বেশি অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে।

রেহাই নেই ধর্মস্থানেরও। বহুল প্রচলিত আপ্তবাক্য 'ক্লেনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস' সেভাবে কাছে আসছে না। মানুষজন হয়তো পরিচ্ছন্ন পোশাকেই ধর্মস্থানে বা ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করছেন। এমনকি নিজের বাড়িতেও পুজো করছেন পরিচ্ছন্নভাবেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পূজান্তে থার্মোকলের প্লেটে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে এবং মানুষ প্রসাদ গ্রহণের পর সেইসব থালা রাস্তায়, পাশের নর্দমায় বা পুকুরে ফেলছেন। পূজান্তে গৃহস্থ বর্জ্য ফুল প্লাস্টিকে মুড়ে পুকুরে বা নদীতে নিক্ষেপ করছেন। কারণ বর্জ্য ফুল ডাস্টবিনে বা অন্য পাত্রে ফেললে দেবতা বুঝি অসন্তুষ্ট হবেন! কিন্তু বসুন্ধরার অসন্তোষের বিষয়টি আর মাথায় থাকছে না। যে দেবী বা দেবতার উদ্দেশে তিনি অঞ্জলি দিলেন তিনি তো এই বিশ্বপ্রকৃতিতেই লীন হয়ে রয়েছেন। সুতরাং বসুন্ধরাকে অপরিচ্ছন্ন করলে দেবতা কীভাবে তুষ্ট হবেন!

পলিপ্যাকের আগ্রাসন

পলিপ্যাক আর থার্মোকলের ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মাছ বিক্রেতারা প্লাস্টিকের প্যাকেটেই কাটা বা আস্ত মাছ

ভরে দিচ্ছেন। এমনকি সবজি বিক্রেতাদের মধ্যেও এখন অনেকে প্লাস্টিক প্যাকেট সঙ্গে রাখছেন এবং সবজি প্যাকেটজাত করে ক্রেতার ব্যাগে চালান করছেন। মিষ্টির দোকানে লেখা রয়েছে 'ক্যারিব্যাগ দেওয়া হয় না'। কিন্তু ওই লেখাই সার। ক্যারিব্যাগ তাঁরা দিয়েই চলেছেন। কেন দিচ্ছেন প্রশ্ন করলে বলেন, খদ্দের চাইছে, না দিলে চলে যাবে। একই কথা বলেন সবজি বিক্রেতা বা মাছ বিক্রেতারাও। কিন্তু কোথায় যাবে যদি পাশের দোকানে না দেওয়া হয় বা না দেওয়া হয় তারও পাশের দোকানে বা অন্য কোথাও। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে মাছ, সবজি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার বহন করার ফলে প্লাস্টিক নিঃসৃত সিসা বা ক্যাডমিয়ামের মতো মারাত্মক রাসায়নিক বিষ খাবারের সঙ্গে মানুষের শরীরে মিশছে। ফলে ক্যানসারের প্রকোপ বাড়ছে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং প্লাস্টিক আটকে জমা জলে মশার বংশবৃদ্ধি ঘটায় নাগরিকরা নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কলকাতার মানুষ তো এখন ম্যালেরিয়াতেও ভুগছে। কিছুদিন পূর্বে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে এনসেফ্যালাইটিস মহামারির আকার ধারণ করেছিল তার পেছনে এই জমা জল এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশও কম দায়ী নয়। তা ছাড়া বর্তমানে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গেরই অন্য অনেক শহরে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়ায় শহরবাসী যে নাকাল হচ্ছে তার পেছনেও রয়েছে নর্দমায় প্লাস্টিক আটকে যাওয়া। ২০০৭ সালে প্রবল বর্ষণে কলকাতা ও হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল জমে যাওয়ায় মানুষ যে দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল তার প্রধান কারণ হিসেবে পরবর্তীকালে পলিথিন ক্যারিব্যাগকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। মানুষের সঙ্গে গাছপালা, জলজ প্রাণী এবং গবাদিপশু—সমস্ত জীবজগৎই প্লাস্টিক দূষণে আজ অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি। আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া গৃহস্থের বর্জ্য-সবজির সঙ্গে প্লাস্টিক মিশে থাকায় গবাদিপশু শ্বাসনালিতে প্লাস্টিক আটকে মারা পড়ছে; নদী, পুকুর বা সমুদ্রের জলে ভাসমান প্লাস্টিক মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে; বৃক্ষমূলের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে সবুজ ধ্বংস হচ্ছে; বাড়ছে পানীয় জলের সংকট। মনে রাখতে হবে অপচনশীল ও বিষাক্ত এই প্লাস্টিকের মাটির সঙ্গে মিশতে সময় লেগে যেতে পারে তিনশো বছরেরও বেশি।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৪০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক তৈরি বা ব্যবহার নিষিদ্ধ। ২০০৮ সালে রাজ্য সরকারের তরফে আইনভঙ্গকারীদের ৫০০ টাকা জরিমানা করার সংস্থান করা হয়। তা ছাড়া রাজ্যের উপকূল অঞ্চল, সুন্দরবন এবং পাহাড়ে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি ২০০৭ সালের বর্ষণ-বিপর্যয়ের পর কলকাতা ও হাওড়া পুরসভাকে বেআইনি ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার চলছে রমরমিয়ে। আইন অনুযায়ী শাস্তি না হলে আইন থেকে আর কী লাভ! দার্জিলিং-এর জিটিএ-কে পাহাড়ে পলিপ্যাকের ব্যাপারে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র দিঘা। কিন্তু সেখানেও প্লাস্টিকের ব্যবহার চলছে পুরোদমে।

দূষণের শিকার দেশের জলাশয় ও নদনদী

শহরাঞ্চলের জলাশয়গুলির নয়নাভিরাম রূপ এখন আর বিশেষ দেখা যায় না। তা ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহ নির্মাণের তাগিদে এইসব জলাশয়ের অস্তিত্বও বিপন্ন। যে ক-টি রয়েছে সেগুলির বেশিরভাগই আবার দূষণের শিকার। ফলে পুকুর ও জলাশয়গুলিতে মাছচাষও ব্যাহত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি। বিপন্ন পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। ১২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এই জলাভূমি দেশ-বিদেশের অসংখ্য পাখিদের বিচরণভূমি। এখানকার অসংখ্য মাছের ভেড়িতে উৎপাদিত মাছ এবং জমিতে উৎপাদিত সবজি কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার এক বিরাট সংখ্যক মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটায়। ভারত সরকার এই জলাশয়কে ২০০৩ সালে 'রামসার কনভেনশন'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে। [১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে বিশ্বের জলাভূমিগুলি বাঁচানোর লক্ষ্যে যে সম্মেলন ডাকা হয়েছিল, সেটি রামসার সম্মেলন হিসেবে খ্যাত]। দূষণ বাড়ছে দেশের নদনদীগুলিতেও। সংস্কারের অভাবে বহু নদনদীই আজ বিলুপ্তির পথে। আর এই নদীদূষণের সবচেয়ে বড় আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে পবিত্র গঙ্গা নদী, পতিতপাবনী, যার পবিত্র জলে হিন্দুদের সমস্ত পুজোপার্বণ হয়। গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ২৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গঙ্গা কেবলমাত্র ধর্মের ধ্বজাকেই বহন করে চলেছে তা নয়, অর্থনীতির স্রোতকেও বয়ে নিয়ে চলেছে। গঙ্গাকে ঘিরে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে, জীবিকানির্বাহ হচ্ছে দেশের কোটি কোটি মানুষের। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কলকারখানা এবং জনপদের দূষিত জল ও বর্জ্যের একটা বড় অংশ গঙ্গায় মিশছে। গঙ্গার দূষণ নির্ণয়ের একটা মাপকাঠি হল জলে 'ফিকাল কলিফর্ম' ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ। এই পরিমাপ থেকে জানা যায় জলে মলমূত্র কতটা মিশছে। প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ২৫০০-র কম ফিকাল কলিফর্ম থাকলে সেই জলকে নিরাপদ বলা যেতে পারে। গোমুখে ফিকাল কলিফর্মের সংখ্যা শূন্য আর ডায়মন্ডহারবারে ৮০,০০০। এই দীর্ঘ পথে ফিকাল কলিফর্ম সবচেয়ে বেশি দক্ষিণেশ্বরে—১১,০০,০০০। অর্থাৎ গঙ্গার পবিত্র জল অনেক জায়গাতেই আজ আর কেবলমাত্র অপবিত্রই নয়, ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। দূষণের কারণে ভারতের চার শংকরাচার্যই ২০১৩ সালে এলাহাবাদে মহাকুম্ভের পুণ্য শাহিস্নানে অংশগ্রহণ করতে রাজি হননি।

ধর্মীয় কারণেও দূষিত হচ্ছে গঙ্গা এবং অন্যান্য নদনদী। শবদাহের বর্জ্য মিশছে নদীজলে। তা ছাড়া হিন্দুদের দেবদেবীর সংখ্যা কম নয়, মূর্তি গড়ে মৃন্ময়ী দেবদেবীকে আমরা পুজো করি, তাঁদের পায়ে অঞ্জলি দিই আর পূজান্তে এইসব দেবতাদের নদনদী এবং জলাশয়ে বিসর্জন দিই। এর ফলে প্রতিমার রঙের সঙ্গে মিশে থাকা বিষাক্ত রাসায়নিক মিশছে নদীর জলে, দূষিত হচ্ছে জল, বিপন্ন হচ্ছে মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী। দূষণের কারণে বাঙালির প্রিয় ইলিশ গঙ্গা থেকে উধাও হতে বসেছে। সারা বছর ধরে হাজার হাজার মাটির মূর্তি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জলাশয়গুলিতে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে, যা পশ্চিমের দেশগুলিতে কল্পনাও করা যায় না। ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী বাঙালিরা

দূর্গাপূজা করে ঠিকই, কিন্তু তারা সেখানকার নদীগুলোতে এইসব মূর্তি বিসর্জন দিতে পারে না। কলকাতা পৌরসভা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে এবং তারা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার কাঠামো সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু সিন্ধুতে বিন্দু সম এই প্রচেষ্টা। এবং তা-ও দেশের সমস্ত পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলির তরফে যে এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তা বলা যায় না। প্রয়োজন এইসব মূর্তি নদীতে বিসর্জন না দিয়ে পূজাস্থলেই জলধারায় এগুলিকে গলিয়ে ফেলা, যা করা হচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে কালী প্রতিমাগুলির ক্ষেত্রে এবং যা নৈহাটি মডেল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ১৯৮৬ সালে তিনি গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের সূচনা করেছিলেন। অবশ্য গঙ্গা সংস্কার কর্মসূচি চলছে তার আগে থেকেই এবং গত ৫০-৬০ বছরে এ ব্যাপারে সরকারের খরচ হয়েছে লক্ষ কোটি টাকার ওপর। কিন্তু সমীক্ষায় উঠে এসেছে এইসব প্রকল্প রূপায়িত হবার পরও গঙ্গার দূষণ কমার পরিবর্তে উলটে বেড়েছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে গঙ্গার দু-তীরে জনসংখ্যা এবং কলকারখানার সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাওয়া; তা ছাড়া পয়ঃপ্রণালী এবং কলকারখানা নিঃসৃত দূষিত জল পরিশোধন করে গঙ্গায় ফেলার যে পরিকল্পনা ছিল তাও পুরোপুরি সফল না হওয়া। দায়টা অবশ্য সরকারের ওপরই বর্তায়।

গঙ্গাদূষণ নিয়ে লোকসভায় বিতর্ক কম হয়নি। এমনকি মহামান্য সুপ্রিমকোর্টও গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে না পারায় সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনাও করেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার শপথ নিয়েছেন। গঙ্গাকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন 'নমামি গঙ্গে প্রকল্প'। ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ২০৩৭ কোটি টাকা। এখন দেখার, এই অঙ্গীকার কতটা কার্যকর করা সম্ভব হয়।

উন্মুক্ত শৌচাগার

অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে ভারতে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ উন্মুক্ত অঞ্চলে শৌচকর্ম করে থাকে। অবশ্য কেবলমাত্র ভারতেই যে এই ব্যাপারটা ঘটছে তা নয়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ (১০০ কোটি মানুষ) শৌচকর্মের জন্য খোলা অঞ্চলকেই বেছে নেয় এবং এরা সকলেই উন্নয়নশীল দেশের মানুষ। তবে সংখ্যার দিক থেকে ভারত একেবারে সবার ওপরে এবং ২০১২ সালে সংখ্যাটা ছিল ৫৯ কোটি ৭০ লক্ষ। সুতরাং ভারতকে প্রকাশ্য মলত্যাগের দেশ বললে অত্যুক্তি করা হয় না, যেমন কেনিয়ার নায়রোবিকে বলা হয় উড়ন্ত শৌচাগারের শহর। নায়রোবির চারপাশে যে বস্তি রয়েছে সেখানকার বেশির ভাগ মানুষ প্লাস্টিকের প্যাকেটে মলত্যাগ করে সেই প্যাকেট রাস্তায় বা নির্জন জায়গায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলে। কেনিয়ার সরকারের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়, তারা নায়রোবির ৯৯ শতাংশ মানুষের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। শৌচাগারের অভাবে দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে খোলা জায়গাতেই আড়ালে-আবডালে কাজটা সারতে হচ্ছে। তবে শহরে এই আড়ালটা আর কোথায়! শহরের ঝুপড়িবাসী মানুষদের একটা বড় অংশ রাত থাকতেই রেললাইনের আশেপাশে বা হাই ড্রেনে কাজটা সারেন। অল্পবয়সিদের তো দিনের আলোতেই এইসব ড্রেনে মলত্যাগ করতে দেখা যায়। গ্রামে অবশ্য নির্জনতার অভাব নেই এবং রয়েছে খোলা মাঠ। তবে সেসব জায়গায় বিপদও ওঁত পেতে থাকে। এই বিপদ শুধু জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ নয়, মানুষের আক্রমণ, লালসার শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়েন অনেক মহিলা। অথচ দেশের প্রতিটি পরিবার যাতে নিজস্ব শৌচাগার নির্মাণ করতে পারে সেজন্য ১৯৯৯ সাল থেকে চালু রয়েছে 'নির্মল ভারত অভিযান' প্রকল্প। প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির জন্য অনুদানের সংস্থান করা হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে খরচও হয়েছে ১৯,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু অগ্রগতি সামান্যই। সম্প্রতি এ ব্যাপারে দেশের ২৬টি রাজ্য, ২৮৭টি জেলা এবং ২৮৬৮টি গ্রামে যে নিরপেক্ষ সমীক্ষা চালানো হয় সেখান থেকে জানা যায়, গ্রামাঞ্চলে ৫৪ শতাংশ পরিবারের কোনও শৌচগার নেই। শাশ্বতী ঘোষ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ২০১১ সালেও ৫৩ শতাংশ ভারতীয় বাইরে শৌচকার্য করতে বাধ্য হন। গ্রামে বা শহরে নিম্নবিত্ত এলাকায় ৭০ শতাংশ বাড়িতেই শৌচাগার নেই। কয়েক দিন আগে কাগজে দেখলাম হাওড়া শহরে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার—এঁদের বাংলোর পাশেই যে বস্তি রয়েছে সেখানকার অধিকাংশ মানুষেরই কোনও শৌচাগার নেই। অনেক স্কুলে শৌচাগার না থাকায় মেয়েরা মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। অথচ আমাদের প্রতিবেশী ছোট দেশ বাংলাদেশ এই সমস্যা থেকে দেশকে প্রায় মুক্ত করে ফেলেছে। এমনকি আমাদের দেশের কেরলও তাদের রাজ্যে শৌচাগারের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। পরিকাঠামো নির্মাণের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও তারা দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু এ ব্যাপারে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ এবং পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯০ সালে মেদিনীপুর জেলায় চালু হয় 'গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প' এবং পরবর্তীকালে সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ে এই প্রকল্প। শৌচাগারের বিভিন্ন মডেলও সেসময় তৈরি করা হয়। ২০০২ সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ৪০ শতাংশ বাড়িতে পাকা শৌচাগারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৯০ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১২.১৩ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্প' জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্দির নির্মাণের চেয়ে শৌচাগার নির্মাণ বেশি জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশে মোট বাড়ির মধ্যে দেবালয়ের সংখ্যা ১ শতাংশ, অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ০.৭ শতাংশ এবং চিকিৎসাকেন্দ্রের সংখ্যা ০.২ শতাংশ। অর্থাৎ দেবালয়ের সংখ্যা শিক্ষালয় এবং স্বাস্থ্যালয়ের সমষ্টির চেয়ে বেশি (দেশ,২ নভেম্বর ২০১৩)। প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্প একশো শতাংশ কার্যকর করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন। তা ছাড়া প্রতিটি স্কুলে শৌচাগার গড়ে তোলার ওপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

তবে সরকারি অনুদানের ভিত্তিতে গৃহে শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া সত্ত্বেও অনেক পুরুষকেই সেটি ব্যবহার না করে উন্মুক্ত

পরিবেশেই শৌচকর্ম করতে দেখা যায়। সরকারের তরফে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে এবং গ্রামবাসীদের সচেতন করতে শিক্ষক, ছাত্র, স্বাস্থ্যকর্মী, পঞ্চায়েত সদস্য, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এঁদের সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অনেক শিক্ষিত মানুষকেও যত্রতত্র দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করতে দেখা যায় এবং এর ফলে যে পরিবেশ দূষিত হয় সেটা আর তাদের খেয়াল থাকে না। রেলের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দুটো কামরার মাঝে লাইনে মূত্রত্যাগ করতে তো অফিসবাবুদের হামেশাই দেখা যায়। অথচ প্ল্যাটফর্মে কাছাকাছিই রয়েছে রেলের শৌচাগার।

দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার সঙ্গে অপরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক

অনেকে বলে থাকেন দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে এবং সেইসঙ্গে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে দেশ থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধারণাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। শহরের বস্তি এলাকা বা ঝুপড়ি এলাকায় অনেক ক্ষেত্রে অপরিচ্ছন্নতা থাকলেও গ্রামাঞ্চলের গরিব আদিবাসী পল্লিতে গিয়ে দেখেছি, মাটির বাড়ি হলেও সেটি সুন্দর করে নিকোনো, নিকোনো উঠোন এবং বাড়ির দেয়ালে নানান ধরনের নকশা আঁকা রয়েছে, মনে হয় কোনও শিল্পীর তুলিতেই বুঝি সেগুলি ফুটে উঠেছে। অন্যান্য বহু গ্রামই যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন এবং প্লাস্টিক আর থার্মোকলের স্তূপ যত্রতত্র ডাঁই করে রাখা নেই। আর শিক্ষার কথা বলতে গেলে বলা যেতে পারে, শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে অনেকেরই পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন করার প্রবণতা রয়েছে এবং অনুরোধ-উপরোধ করেও তাঁদের নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় না। আমাদের এলাকাতেই দেখছি, শিক্ষিত ভদ্রলোক, ছেলে বিদেশে চাকরি করে, অথচ বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন করলে অথবা পুজো হলে ব্যবহৃত সব থার্মোকলের প্লেট পাশের পুকুরে ফেলেন এবং নিষেধ করলে সারা দেশের উদাহরণ টেনে বড় বড় কথা বলেন। এরকম মনোভাব অনেকের মধ্যেই রয়েছে। এ ছাড়া আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের চারপাশটা বা বিদ্যালয়ের ভেতরটাও যে অনেক সময়ই অপরিচ্ছন্ন থাকে তা তো আমরা প্রতিনিয়তই দেখে থাকি। ষাটের দশকে আমরা যখন স্কুল-ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের সপ্তাহে অন্তত একদিন স্কুলপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করতে হত। মনে হয় সেসময় এই পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি স্কুলের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন আজকের মতো এরকম অসংখ্য বেসরকারি স্কুল বা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গজিয়েও ওঠেনি। বর্তমানে ছাত্ররা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ বা বিদ্যালয় কক্ষ ঝাড়ু হাতে পরিষ্কার করবে তা তো ভাবাই যায় না, বিশেষ করে প্রচুর অর্থ খরচ করে যারা বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে তাদের ক্ষেত্রে তো নয়ই। অথচ পরিচ্ছন্নতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষারই অঙ্গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি জাপানে গিয়ে দেখেছিলেন সেখানকার ছাত্ররা নিজেদের বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখতে হাত লাগায়। এমনকি দক্ষিণ কোরিয়াতেও সাধারণ মানুষের পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া চলে আসছে সেই ১৯৭৪ সাল থেকে এবং মাসে অন্তত এক ঘণ্টা তাঁরা বিদ্যালয়, কর্পোরেশন, নিজেদের এলাকার আশেপাশে সাফাইয়ের কাজে হাত লাগান।

বিভিন্ন দেশের সাফল্য

আমরা না পারলেও পৃথিবীর অনেক দেশই কিন্তু অপরিচ্ছন্নতাকে জয় করে পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশী চীনের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৯ সালে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে নতুন চীনের যাত্রা শুরু হয় এবং সেসময় পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠিতে তারা যে আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল তা বলা যায় না। কিন্তু বর্তমানে চীন পরিচ্ছন্নতার নিরিখে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। কয়েক মাস পূর্বে চীনে বেড়াতে গিয়ে নিজের চোখেই চীনের পরিচ্ছন্নতা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রশস্ত রাজপথে সামান্যতম কাগজের টুকরোও কোথাও চোখে পড়ল না। রাস্তায় প্রায় ১০০ মিটার পর পরই রয়েছে বর্জ্য ফেলার আচ্ছাদিত ডাসবিন। যত্রতত্র থুথু ফেলার কু-অভ্যাসই নেই। একজনকে দেখলাম মুখের থুথু চাপতে না পেরে টিস্যু পেপারে থুথুটা ফেলে পাশের বিনে নিক্ষেপ করলেন। এ জিনিস তো আমাদের দেশে কল্পনাই করা যায় না। চীনে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ নয় এবং বিভিন্ন বিপণিতে প্লাস্টিকের প্যাকেটেই ক্রীত পণ্যসামগ্রী ভরে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাস্তাঘাটে কোনও প্লাস্টিকের জঞ্জাল চোখে পড়ল না, চোখে পড়ল না থার্মোকলের স্তূপ। সাংহাইয়ে হুয়াংগপু নদীতে ক্রুজের সময় দেখলাম পরিচ্ছন্ন নদী, সামান্য খড়কুটো ভেসে যাবারও কোনও দৃশ্য নেই। আর আমাদের জাতীয় নদী গঙ্গার অবস্থা তো আগেই উল্লেখ করেছি।

১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অপরিচ্ছন্নতার নিরিখে ছিল বর্তমান ভারতের কাছাকাছি, কিন্তু সরকারের উদ্যোগে মাত্র এক দশকের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ঝাঁ চকচকে দেশে পরিণত হয়। আফ্রিকা মহাদেশের দেশ রাওন্ডা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল হানাহানিতে জর্জর এক অপরিচ্ছন্ন রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে পরিচ্ছন্নতার নিরিখে তারা সাব-সাহারান দেশগুলির মধ্যে অষ্টম স্থানে এবং পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়ে তারা দেশের জিডিপিও অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। এমনকি মরিশাসের মতো ছোট দেশও পরিচ্ছন্নতার নিরিখে পৃথিবীর দশটি পরিচ্ছন্ন দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থান দখল করেছে এবং নিজেদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে সারা পৃথিবী থেকে পর্যটকদের টেনে আনতে সমর্থ হয়েছে। এই দশটি দেশ হল : কলাম্বিয়া, কিউবা, অস্ট্রিয়া, মরিশাস, নরওয়ে, সুইডেন, কস্টারিকা, সুইজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং ফ্রান্স (www.clicktop10.com)। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নির্দশন এবং ঐতিহাসিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের এই প্রাচীন দেশ পর্যটন প্রতিযোগিতায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে এবং ২০১৩ সালে পৃথিবীর ১৪০টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান ৬৫তম (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সমীক্ষা)।

স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলা কতটা সম্ভব?

স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি সফল করতে রাজনীতিবিদ থেকে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই সচেতনতার ব্যাপারটা একটা সাধারণ নিদান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সমস্ত

প্রতি হাজার পরিবার পিছু শৌচাগারের সংখ্যা						
	শৌচাগার নেই		পরিবারের সকলে শৌচাগার ব্যবহার করেন		উন্নত মানের (@) শৌচাগার ব্যবহার করেন	
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
অন্ধ্রপ্রদেশ	৫৪৩	৮১	৩৪৫	৬৮১	৪৪৫	৯১০
অরুণাচলপ্রদেশ	১২৬	০	৪৯২	৬৭৯	৪৬৫	৯৭৯
অসম	১৩৭	৩	৭৯৪	৭০৩	৭৫৪	৯৭১
বিহার	৭২৮	২০৮	১৮৮	৪৪৩	২৫৮	৭৮৪
ছত্তিশগড়	৭৬৭	২৪৯	১৮৮	৫৫২	২০০	৭৪৯
দিল্লি	০	০	৭৪৪	৬৬৮	১০০০	৯৮৭
গোয়া	৯৭	৪০	৭১১	৭৪৩	৮৫৮	৯৬০
গুজরাত	৫৮৭	৬২	৩৬৬	৭৪৩	৪০৭	৯৩৬
হরিয়ানা	২৫৪	১৪	৬৩৯	৮১৮	৭৪২	৯৮২
হিমাচলপ্রদেশ	২৫৭	৪৩	৫৯৫	৭০১	৭৩৭	৯৫৭
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৪৩	৬০	৪৯৪	৬৭২	৪৪১	৭৯৪
ঝাড়খণ্ড	৯০৫	১৭৭	৭৫	৫৭০	৮৯	৮০১
কর্ণাটক	৭০৮	৯০	২৪৪	৬৭২	২৮৪	৮৭৭
কেরল	২৮	১২	৯২৭	৮৮৭	৯৬৯	৯৮৮
মধ্যপ্রদেশ	৭৯০	১৪০	১৫৩	৬৪০	২০৭	৮৪৯
মহারাষ্ট্র	৫৪০	৬৯	৩২২	৫৮০	৪৪৩	৯২৭
মণিপুর	১২	০	৭৮৬	৭৪১	৭৯৬	৯১২
মেঘালয়	৪৫	২	৯১৮	৭৯৩	৮৬০	৯৯৪
মিজোরাম	৭	০	৯৮০	৯৭৫	৯৩৪	৯৯৯
নাগাল্যান্ড	০	০	৯৭২	৭৯১	৯৮১	৯৯৪
ওড়িশা	৮১৩	১৮২	১২৪	৪৯৬	১৭৩	৮০৫
পঞ্জাব	২২২	৬২	৬৫৫	৫৮১	৭৭৬	৯৩৩
রাজস্থান	৭৩০	১৪২	২১৫	৬০৬	২৬১	৭৮৩
সিকিম	২	০	৮৫৭	৫৫৬	৯৯১	১০০০
তামিলনাড়ু	৬৬৪	১২২	২৭৫	৬০৬	৩৩০	৮৬৬
ত্রিপুরা	১৪	১	৭২৭	৫৫৫	৮৮৬	৯৮১
উত্তরাখণ্ড	১৯৭	১৬	৬৪৪	৬৪৪	৮০২	৯৭৬
উত্তরপ্রদেশ	৭৫৩	১০৭	১৯৫	৬৪২	২২৪	৮৬৭
পশ্চিমবঙ্গ	৩৯৭	৫৪	৪০০	৫৭৪	৫৮০	৯৩২
আন্দামান ও নিকোবর	২৮৮	৫০	৬১৪	৭৪০	৭১২	৯৫০
চণ্ডীগড়	৩	১৬	৩৫০	৫৬৭	৯৯৭	৯৮৪
দাদরা ও নগর হাভেলি	৪৯৩	৩২২	৮৯	২৯১	৫০৭	৬৭৮
দমন ও দিউ	২৬৮	১	৩৮০	১১৯	৭৩২	৯৯৯
লাক্ষাদ্বীপ	০	২৩	১০০০	৬২৮	১০০০	৯৭৭
পুদুচেরি	৪৭৪	৬৩	৪০৯	৭৭২	৫২৬	৯৩৬
সারা ভারত (২০১২)	**৫৯৪**	**৮৮**	**৩১৯**	**৬৩৯**	**৩৮৮**	**৮৯৬**
সারা ভারত (২০০৮-০৯)	**৬৫২**	**১১৩**	**২৭৯**	**৫৮১**	*	*

* তুলনামূলক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

@ উন্নত মানের বলতে যেসব শৌচালয়ের সঙ্গে সেপটিক ট্যাংক বা এ ধরনের আচ্ছাদিত কোনও ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলিকেই বোঝানো হচ্ছে।

উৎস : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দফতরের ৬৯তম সমীক্ষা (জুলাই ২০১২-ডিসেম্বর ২০১২)।

অপকর্মের জন্যই এই ওষুধের নিদান দেওয়া হয়। আর শুধু সচেতনতার ওপর নির্ভর করে অন্যান্য অপকর্ম যেমন বন্ধ করা যায়নি, বন্ধ করা যাবে না এই অপকর্মও। আসলে সচেতনতার কথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। ভয়টা না থাকলে সহজে কেউ সেচতন হতে চায় না এবং বেআইনি কাজটা করেই চলে। তবে কিছু সচেতন ব্যক্তি অবশ্যই আছেন। আমি এক ব্যক্তিকে জানি যিনি রাস্তা বা ড্রেন থেকে প্লাস্টিক কুড়িয়ে নির্দিষ্ট ভ্যাটে ফেলেন এবং বাজারে পারতপক্ষে প্লাস্টিক প্যাকেট গ্রহণ করেন না। মাছ কেনার জন্য বাড়ি থেকেই তিনি একটি পাত্র সঙ্গে নিয়ে যান। দিনের পর দিন তিনি এই কাজ করেই চলেছেন, মানুষজন দেখেন, জিজ্ঞাসা করেন, প্রশংসাও করেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই, তাঁরা নিজেদের মতোই চলেন, সচেতনতার ধার ধারেন না। কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলাম বিশ্বভারতীর একজন বিদেশি ছাত্রী একটি বিশাল প্যাকেট নিয়ে বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে ঘুরছেন আর প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের টুকরো, আবর্জনা এইসব তুলে তুলে সেই প্যাকেটে ভরছেন। কিন্তু কেউই তাঁর সঙ্গে হাত লাগাচ্ছে না এবং সকলে ব্যাপারটা উপভোগ করছে। আসলে গুঁতো না খেলে আমরা সচেতন হবার লোকই নই। এর ফলে দূষণে এবং সংক্রমণে জীবন সংশয় হলেও নয়। আর হচ্ছেও তাই। সুতরাং কেবলমাত্র সচেতনতার ওপর নির্ভর না করে সরকারকে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রয়োজনে এ ব্যাপারে কঠোর হতে হবে। যত্রতত্র আবর্জনা নিক্ষেপ করলে জরিমানা আদায় করতে হবে এবং পরিবেশ অপরিচ্ছন্নতার কাজকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হংকং-এ রাস্তায় সামান্য কাগজের টুকরো নিক্ষেপ করলেও নিক্ষেপকারীকে তাৎক্ষণিক জরিমানা করা হয়, পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই এই একই বিধি বলবৎ রয়েছে। সুতরাং একই রাস্তায় আমাদেরও হাঁটতে হবে। অবশ্য আমাদের দেশে যে অপরিচ্ছন্নতা রুখতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা কিন্তু নয়। আগেই বলা হয়েছে দেশের বেশ কিছু অঞ্চলকে প্লাস্টিকমুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ওই সব জায়গায় প্লাস্টিক ফেললে শাস্তির বিধান

চিত্র ১ : ২০১২ সালে ভারতবর্ষে স্নানাগার ও শৌচাগারবিহীন পরিবার (শতকরা ভিত্তিতে)

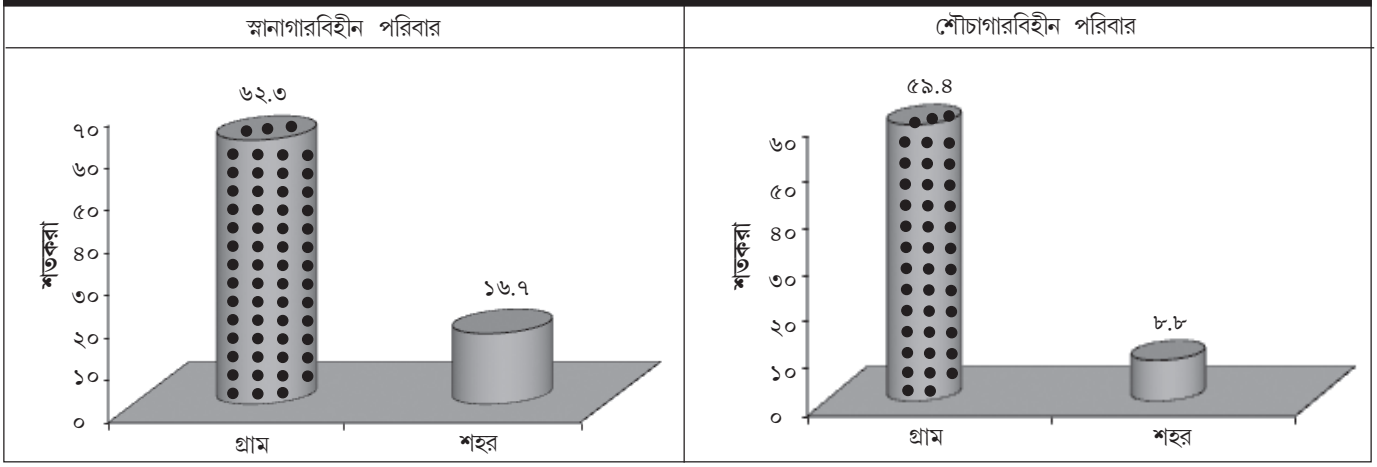

উৎস : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দফতরের ৬৯তম সমীক্ষা

রাখা হয়েছে। এ ছাড়া রাজ্যে গঠিত হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং আইন ভঙ্গকারীর জন্য জরিমানার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু আইন কার্যকর করার ব্যাপারে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত। অথচ কলকাতা শহরের এক প্রাক্তন মেয়র তাঁর সময়ে সামান্য কঠোরতা প্রদর্শন করে এবং জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করে কলকাতার নাগরিকদের শহর অপরিচ্ছন্ন করার মানসিকতাকে কিছুটা হলেও রুখে দিতে পেরেছিলেন। আমাদের প্রশাসন সামান্য সক্রিয় হলেই পরিচ্ছন্নতার কাজ অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

সার্বিক পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে পরিচ্ছন্নতার পাঠ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে যেমন পরিচ্ছন্নতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে, সেরকম দেশের সমস্ত অফিস, কলকারখানা, স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান সর্বত্রই পরিচ্ছন্নতার ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে, যে মানদণ্ডের নীচে নামলে তাদেরও যাতে আইনের কাঠগড়ায় টেনে আনা যায়, আইনে সেরকম ধারাও সংযুক্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন এবং জওহর নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচ্ছন্নতার পাঠ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও তাঁদের নিজেদের রাজ্যগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন করে তোলার কাজে উদ্যোগী হতে হবে। কারণ অঙ্গের শোভা অবহেলা করলে শরীরের সার্বিক শোভাবর্ধন সম্ভব নয়। তা ছাড়া পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে অর্থনীতিও সম্পর্কযুক্ত। কারণ যেসব দেশে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা রয়েছে সেসব দেশে বিদেশি পর্যটকের ঢল নামে, আসে বিদেশি বিনিয়োগ। ফলে দেশের অর্থনীতিও উন্নত হয়।

সুতরাং দেশকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে প্রশাসনকে (বিশেষ করে স্থানীয় স্তরের প্রশাসন) আরও বেশি করে সক্রিয় হতে হবে, তাদের বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যাপারে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে আর প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বর্জ্যকে বিনষ্ট করা অথবা সেটিকে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে। যেমন—সম্প্রতি জার্মান প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের ময়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হবার ৬৭ বছর পরেও আমাদের গায়ে অপরিচ্ছন্নতার তকমা সেঁটে রয়েছে। আসলে নেতৃত্বের তরফে প্রয়োজন পরিচ্ছন্নতার আন্দোলন গড়ে তোলা, যে আন্দোলনে সকলকে শামিল করা আবশ্যক। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় যখন প্লেগ মহামারির আকার ধারণ করে তখন স্বামীজির নির্দেশে ভগিনী নিবেদিতা শহরকে পরিচ্ছন্ন করার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন এবং সেই কাজে অসংখ্য যুবকদের তিনি টেনে আনতেও সক্ষম হয়েছিলেন। চীনে ১৯৫২ সাল থেকেই পরিচ্ছন্নতার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেসময় থেকেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে মাছি মারা, যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা বা নোংরা ফেলা বন্ধ করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা এইসব কাজে হাত লাগায়। আমাদের দেশে পরিচ্ছন্নতা আন্দোলনের পথিকৃৎ মহাত্মা গান্ধী। তিনি পরিচ্ছন্নতা আন্দোলনকে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই তিনি এই আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে তিনি নিজের হাতে শৌচাগার পর্যন্ত পরিষ্কার করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীন ভারতের কোনও নেতাই পরিচ্ছন্নতাকে আন্দোলনের রূপ দিতে এগিয়ে আসেননি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, দেশের সম্মান পুনরুদ্ধার করতে এবং দেশের কোটি কোটি মা-বোনদের অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন। এই কর্মযজ্ঞে আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা এবং সারা দেশে নির্মিত হবে ১২ কোটি শৌচাগার। প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন। কারণ ২০১৯ সালে দেশ জুড়ে পালিত হবে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-সার্ধশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। সুতরাং গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সকলকেই প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বচ্ছ ভারত গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তবে এই কাজে সফল হতে হলে কেবলমাত্র মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিষয়টি ছেড়ে দিলে চলবে না, সচেতনতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং সেই আইন রূপায়ণে সরকারকে সক্রিয় হতে হবে।❑

[লেখক পরিচ্ছন্নতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।]

গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে স্যানিটেশন কর্মসূচির প্রভাব ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্যানিটেশন কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব, আর্সেনিকমুক্ত জলের ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা, ঘরে ও বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ এবং সাধারণভাবে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান (শারীরিক ও মানসিকভাবে), বিশেষভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারা ও রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আর্থিক বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পরিস্রুত পানীয় জল, বিধিসম্মত শৌচাগার, চিকিৎসা পরিষেবা, নির্মল ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের। এইসব সুবিধার অভাবে ঘটে মানুষের জীবনহানি—লিখছেন **অভিষেক মিত্র।**

সাধারণভাবে স্যানিটেশন হল কিছু অভ্যাসের আচরণ, যার দ্বারা আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারি। কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যেমন আর্থিক বিকাশের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পরিস্রুত পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধিসম্মত শৌচাগার, চিকিৎসা পরিষেবা ও সর্বোপরি নির্মল ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের। এইসব সুবিধার অভাবে মানুষের জীবনহানি যেমন ঘটে তেমনি পরিবেশের উপর কুপ্রভাবও পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ স্বাস্থ্যবিধিসম্মত শৌচাগার থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে এই সমস্যা বেশি। তবে আশার বিষয় হল পৃথিবীর সর্বত্র এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' (সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য)-এর লক্ষ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—শিশুমৃত্যুর হার কমানো, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি, সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র্যদূরীকরণ, লিঙ্গভেদের অবসান ইত্যাদি। উক্ত সকল উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গেই কিন্তু স্যানিটেশন কর্মসূচির নিবিড় যোগ রয়েছে। স্যানিটেশন কর্মসূচির দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালকে রাষ্ট্রসংঘ 'আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ভারতবর্ষে বিগত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্যানিটেশন কর্মসূচির প্রতি নজর দেওয়া হয়। চালু হয়, 'কেন্দ্র সরকারের অর্থে পরিচালিত গ্রামীণ স্যানিটেশন কর্মসূচি'। শুরুতে এই কর্মসূচি মূলত জোগাননির্ভর হলেও পরবর্তীকালে আরও ব্যাপক হয়। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক 'সার্বিক স্যানিটেশন অভিযান' (TSC) গৃহীত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) গ্রামীণ এলাকার মানুষজনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

(খ) পানীয় জলের নিরাপদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার।

(গ) চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যশিক্ষা সচেতনতা।

(ঘ) উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয় নির্মাণ।

(ঙ) সকল প্রকার স্কুলে শৌচাগার নির্মাণ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটানো।

(চ) সার্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, উক্ত কর্মসূচি ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকার নির্বিশেষে ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পরেও স্যানিটেশন যে ভারতবর্ষে ১০০ শতাংশ সফল তা বলা যায় না। স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মসূচির সর্বশেষ নিদর্শন হল কেন্দ্র সরকার কর্তৃক গৃহীত 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', যার দুটি দিক— (ক) স্বচ্ছ ভারত—গ্রামীণ (খ) স্বচ্ছ ভারত—নগর। স্বচ্ছ ভারত অভিযান ২ অক্টোবর ২০১৪ সালে গৃহীত হয়েছে, যেখানে ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামকে নির্মল গ্রামে পরিণত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হল ২০১৯ সালের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা। স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে তাই নির্মল ভারত অভিযানের থেকেও ব্যাপক কার্যক্রম হিসেবে ধরা যায়। এই প্রবন্ধে আমরা গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের স্যানিটেশন কর্মসূচির ফলাফল ও রূপায়ণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা

স্যানিটেশনের তথাকথিত প্রশ্নটি যে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ আজও ভারতবর্ষের অনেক গ্রাম স্বাস্থ্যসহ নানা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্যানিটেশন কর্মসূচির রূপায়ণ বিশেষ গুরুত্ব পায়। আর এইসব কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা যে উল্লেখযোগ্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু পঞ্চায়েত নয়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ভূমিকাও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং জনসাধারণের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্যানিটেশন কর্মসূচির

কাজ হয়েছে, সেখানেই কর্মসূচির রূপায়ণ অতন্ত সফল হয়েছে। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় যেখানে মাত্র ১২ শতাংশ পরিবার শৌচাগারের সুবিধা পেত, ২০০৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৭৮ শতাংশে। ৩১ জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত শুধুমাত্র সার্বিক স্যানিটেশন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা রাজ্যে ৫৬ লক্ষ স্বাস্থ্যবিধিসম্মত পারিবারিক শৌচাগার স্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদনেও এই রাজ্যের স্যানিটেশন কর্মসূচি রূপায়ণের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। স্যানিটেশনের কাজের প্রতি গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ২০০৫ সালে নির্মল গ্রাম পুরস্কার প্রচলন করে। ২০০৫ সালে এই উদ্দেশ্যে ৩৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয়। তার মধ্যে ১০টি ছিল পশ্চিমবঙ্গে। এমনকি সারা ভারতের মধ্যে যে দুটি ব্লককে পুরস্কৃত করা হয়, তার মধ্যে ১টি ছিল পশ্চিমবঙ্গে (নন্দীগ্রাম-২)। তাৎপর্যের বিষয়, ২০০৬ সালে সারা ভারতবর্ষে ৯টি ব্লককে পুরস্কৃত করা হয়, তার মধ্যে ৮টিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ২০০৬-০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে নির্মল গ্রাম

সারণি-১
নির্মল গ্রাম পুরস্কার (২০১২-১৩)

	রাজ্য	মোট	মোট	মোট	২০০৯			২০১০			২০১১			মোট			শতাংশ	শতাংশ	শতাংশ
		জিপি	বিপি	জেডপি	জিপি	বিপি	জেডপি	জিপি	বিপি	জেডপি	জিপি	বিপি	জেডপি	জিপি	বিপি	জেডপি	পুরস্কৃত জিপি	পুরস্কৃত বিপি	পুরস্কৃত জেডপি
১	অন্ধ্রপ্রদেশ	১২৮৩৩	৬৫৬	১৩	২৭২	০	০	৪৪	০	০	১৪২	০	০	১২৭৩	১	০	৯.৯২	০.১৫	০
২	অরুণাচলপ্রদেশ	১৭৬৭	১০০	১৬	৮	০	০	৩	০	০	১৪	০	০	৩১	০	০	১.৭৫	০	০
৩	অসম	২৭২৫	২৪০	২৬	৬	০	০	২	০	০	৫	০	০	৩১	০	০	১.১৪	০	০
৪	বিহার	৮৪০৪	৫৩৪	৩৮	০	০	০	১৩	০	০	৬	০	০	২১৭	১	০	২.৫৮	০.১৯	০
৫	গুজরাত	১৩৫৯২	২১৮	২৫	৩৫০	০	০	১৮৯	০	০	৪২২	০	০	২২৮১	০	০	১৬.৭৮	০	০
৬	হরিয়ানা	৬০৮১	১১৯	২১	১৩১	০	০	২৫৯	০	০	৩৩০	০	০	১৫৭৮	১	০	২৫.৯৫	০.৮৪	০
৭	হিমাচলপ্রদেশ	৩২৪৩	৭৭	১২	২৫৩	০	০	১৬৮	০	০	৩২৩	০	০	১০১১	১	০	৩১.১৭	১.৩০	০
৮.	জম্মু ও কাশ্মীর	৪০৬০	১৪০	২১	০	০	০	০	০	০	২	০	০	১৪	০	০	০.৩৪	০	০
৯	কর্ণাটক	৫৬৩০	১৭৬	২৯	২৪৫	৩	০	১২১	০	০	১০৩	২	১	১০৬৯	৬	১	১৮.৯৯	৩.৪১	৩.৪৫
১০	কেরল	৯৭৭	১৫২	১৪	৪৩	১৫	২	১০৩	১	০	৭	১১	২	৯৮০	১১৭	৮	১০০.৩১	৭৬.৯৭	৫৭.১৪
১১	মধ্যপ্রদেশ	২২৯৭৫	৩১৩	৫০	৬৩৯	০	০	৩৪৪	০	০	২১২	০	০	২০৬৮	০	০	৯.০০	০	০
১২	মহারাষ্ট্র	২৭৮৯৬	৩৫১	৩৩	১৭২০	৬	০	৬৯৪	০	০	৪৪২	২	০	৯৫২৩	১১	০	৩৪.১৪	৩.১৩	০
১৩	মণিপুর	২৯৩৫	৪১	৯	১	০	০	০	০	০	০	০	০	২	০	০	০.০৭	০	০
১৪	মেঘালয়	৭১৬৭	৩৯	৭	৫২	০	০	১৬০	০	০	৩৬৫	০	০	৫৮৮	০	০	৮.২০	০	০
১৫	মিজোরাম	৯০১	২৬	৮	২০	০	০	৫	০	০	৫৩	০	০	৮৯	০	০	৯.৮৮	০	০
১৬	নাগাল্যান্ড	১১৩২	৫২	১১	৪২	০	০	২৩	০	০	১৭	০	০	৯০	০	০	৭.৯৫	০	০
১৭	ওড়িশা	৬২৩৬	৩১৪	৩০	২০	০	০	৮১	০	০	৪৮	০	০	২৮৪	০	০	৪.৫৫	০	০
১৮	পঞ্জাব	১২৮২৭	১৪২	২০	৭৪	০	০	৫১	০	০	১৯	০	০	১৬৬	০	০	১.২৯	০	০
১৯	রাজস্থান	৯১৭৬	২৩৭	৩২	৪৩	০	০	৮২	০	০	৩২	০	০	৩২১	০	০	৩.৫০	০	০
২০	সিকিম	১৭৬	২৫	৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৬৪	০	৪	৯৩.১৮	০	১০০
২১	তামিলনাড়ু	১২৫২৪	৩৮৫	২৯	১৯৬	০	০	২৩৭	০	০	৫১	০	০	২৩৮৫	৬	০	১৯.০৪	১.৫৬	০
২২	ত্রিপুরা	১০৩৮	৪৫	৮	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৩	০	০	১০.৮৯	০	০
২৩	উত্তরপ্রদেশ	৫১৮৯৩	৮১৯	৭৫	৬	০	০	১৩	০	০	৪১	০	০	১০৮০	০	০	২.০৮	০	০
২৪	পশ্চিমবঙ্গ	৩৩৪৯	৩৪১	১৯	১০৯	৪	০	০	০	০	৩৬	০	০	১০৭৭	৩৭	০	৩২.১৬	১০.৮৫	০
২৫	ছত্তিশগড়	৯৭২৬	১৪৬	২৭	১১৯	০	০	১৭২	০	০	১২৪	০	০	৮১৭	০	০	৮.৪০	০	০
২৬	ঝাড়খণ্ড	৪৪৩৭	২১৫	২৪	৭১	০	০	০	০	০	০	০	০	২২৫	০	০	৫.০৭	০	০
২৭	উত্তরাখণ্ড	৭৫১৮	৯৫	১৩	১৩৬	০	০	৪৪	০	০	৬৩	০	০	৫২৫	০	০	৬.৯৮	০	০
	মোট	**২৪১২১৮**	**৫৯৯৮**	**৬১৪**	**৪৫৫৬**	**২৮**	**২**	**২৮০৮**	**১**	**০**	**২৮৫৭**	**১৫**	**৩**	**২৮০০২**	**১৮১**	**১৩**	**১১.৬১**	**৩.০২**	**২.১২**

সূত্র : পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রকের ওয়েবসাইট।

পঞ্চায়েত পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক ৮৯, ০৯, ৭৮৭ জনকে শৌচাগারের সুবিধা দেওয়া গিয়েছিল। পরবর্তী দুটি রাজ্য হল কেরল ও মহারাষ্ট্র। সারণি-১-এ ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলাপরিষদ স্তরের নির্মল পুরস্কারের বিবরণী দেওয়া হল।

শিশুমৃত্যু রোধ ও শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় শিশুমৃত্যু রোধ ও শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে তথা রোগ প্রতিষেধক টীকাকরণে পঞ্চায়েতগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু তারপরেও যে ১০০ শতাংশ সাফল্য এসেছে এমন নয়, বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে হতাশার চিত্র বেশ প্রকট। সাধারণত শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে দুটি দিক লক্ষ করা যায়—(ক) জন্মাবার সময় মৃত্যু, (খ) জন্মাবার পর অপুষ্টিজনিত মৃত্যু। তবে শিশুমৃত্যুর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল শিশুর মায়ের অবস্থা। মায়ের অল্প বয়সে মাতৃত্ব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপুষ্টি, দারিদ্র্য, সচেতনতার অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী, আর এইসব সমস্যা গ্রামীণ এলাকাতেই বেশি। শিশু জন্মাবার পর 'টীকাকরণ' স্যানিটেশন কর্মসূচির এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। ২০০৫-০৬ সালের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় (এন এফ এইচ এস-৩) দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে ৩৭ শতাংশ শিশুর প্রাথমিক টীকাকরণ সম্ভব হয় না। ওই একই বছর ওই সমীক্ষাতেই আরও জানা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষে শূণ্য থেকে ৩ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী কম ওজনের শিশু অর্থাৎ অপুষ্টিতে ভোগা শিশু প্রায় ৪৬ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যা ৪৪ শতাংশ। শিশুকন্যাদের মধ্যেই এই অপুষ্টির হার আরো বেশি। তবে এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্তির জন্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি হাত গুটিয়ে বসে নেই, ইতিমধ্যেই মহিলাদের শারীরিক উন্নতি বিধানে প্রায় সব স্কুলেই আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে, মিড-ডে-মিলের সঠিক রূপায়ণের চেষ্টা করা হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছসেবী সংস্থা এবং এন জি ও-র উদ্যোগে স্বাস্থ্যসচেতনতা ক্যাম্প করানো হচ্ছে। বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে ও সর্বোপরি বাল্যবিবাহ রোধের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নিরাপদ মাতৃত্ব : নিরাপদে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে মা হতে পারা জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। ২০০১-০৩ সালের এস আর এস-এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি বছর ১ লক্ষ শিশুর জন্মপিছু এ রাজ্যে ১৯৪ জন মা মারা যান। এই হার কমাতে গেলে দরকার শিশুকন্যা ও কিশোরীদের পুষ্টির উপর বিশেষ নজর দেওয়া এবং নারীশিক্ষার প্রসার। এ ছাড়া দরকার গর্ভবতী মায়েদের অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়া, আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো এবং গর্ভকালে ও শিশুর জন্মের পরে মায়েদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা। এরই পাশাপাশি দরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ। জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনেক বাড়লেও এখনও তা যথেষ্ট নয়। নারীপিছু সম্ভাব্য সন্তানের সংখ্যা এই রাজ্যে ১৯৯২-৯৩ সালে ছিল ২.৯ শতাংশ, ১৯৯৮-৯৯ সালে ২.৩ শতাংশ এবং ২০০৫-০৬ সালে ২.২৯ শতাংশ, অর্থাৎ সন্তান সীমিত রাখার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে ঠিকই, তবে তা মন্থর গতিতে। নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের পটভূমিতে ও সর্বোপরি বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার সবথেকে বেশি ঘাটতি চোখে পড়ে। নিরাপদ মাতৃত্বের সঙ্গে মহিলাদের পুষ্টি-অপুষ্টির বিষয়টি জড়িত। কারণ অপুষ্টিগত মহিলাদের ক্ষেত্রেই মাতৃত্বজনিত সমস্যা বেশি। মহিলাদের অপুষ্টির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের অবস্থা খুব আশাব্যাঞ্জক নয়। একাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৭-২০১২) কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা ছিল মেয়েদের অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা কমানো। দুর্ভাগ্যের হলেও এটা বাস্তব যে, এ রাজ্যের ১৫ থেকে ৩৯ বছর বয়ঃসীমার মহিলাদের ৪৫ শতাংশই অপুষ্টির শিকার।

নিরাপদ পানীয় জল : গ্রামীণ এলাকায় নাগরিকদের পানীয় ও বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করা পঞ্চায়েতের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় পানীয় জল সরবরাহে পঞ্চায়েত ব্যাপক সাফল্য পেলেও বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলিতে সাফল্যের হার বেশ কম। তবে এইসব জেলাগুলিতে ২০১২-১৩ সাল থেকে জল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক হেলথ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় ৯০.৪১ শতাংশ জনগণ পানীয় জল পরিষেবার আওতায়। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকা রয়েছে যা আর্সেনিকযুক্ত। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান,

সারণি-২
শিশুমৃত্যুর হার পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে
(প্রতি ১০০০ শিশুর জন্মের নিরিখে তৈরি)

রাজ্য	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	*কমার হার
দিল্লি	৩০	২৮	২৫	২৪	৬
ঝাড়খণ্ড	৪২	৩৯	৩৮	৩৭	৫
গুজরাত	৪৪	৪১	৩৮	৩৬	৮
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৩	৪১	৩৯	৩৭	৬
মহারাষ্ট্র	২৮	২৫	২৫	২৪	৪
পশ্চিমবঙ্গ	৩১	৩২	৩২	৩১	০

তথ্যসূত্র : স্বাস্থ্য মন্ত্রক *তিন বছরে

বি : দ্র : ২০১৩ সালের এই রিপোর্ট এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। তবে যা তথ্য সামনে এসেছে, তার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে শিশুমৃত্যু রোধে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেক পিছিয়ে। তুলনায় তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, দিল্লি, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, এমনকি জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যও শিশুমৃত্যুর হার গড়ে ৬-১০ ভাগ কমিয়ে ফেলেছে।

হাওড়া ও দুই ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকা রয়েছে। এইসব আর্সেনিকযুক্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা কমানো ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে ইউনিসেফের উদ্যোগে এক মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে, যার রূপায়ণের দায়িত্ব মূলত পঞ্চায়েতের উপরেই।

জন্ম-মৃত্যুর হিসাব : পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব নথিভুক্তকরণের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৬৯-এর ৬(৫) ধারা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ও মৃত্যুর মুখ্য নিবন্ধককে প্রতিটি ব্লকের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিবন্ধক ও পঞ্চায়েতের প্রধানকে উপনিবন্ধক হিসাবে নিযুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এলাকার প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করা গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য কাজ। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধানের কাজ মুখ্য নিবন্ধককে কাজের প্রতিবেদন পাঠানো। জন্ম-মৃত্যু রেজিস্টারে পঞ্চায়েত শুধু জন্ম-মৃত্যুই নথিভুক্ত করবে না, তার সঙ্গে শিশুর জন্মাবার আগে মায়ের বয়স, তার আগে ক-টা সন্তান রয়েছে, বা মৃত্যু হলে কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তার উল্লেখও এতে থাকবে। পঞ্চায়েতের এই কাজের খতিয়ান তাই শুধুমাত্র জন্ম-মৃত্যুর হিসাবই রাখে না, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত অবস্থানকেও তুলে ধরে।

শৌচাগার নির্মাণ : গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যবিধিসম্মত শৌচাগার নির্মাণ স্যানিটেশন কর্মসূচির এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। তবে কেবল শৌচাগার তৈরিই নয়, সেগুলিকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার ও পরিষ্কার রাখাও জরুরি। এজন্য গ্রাম সংসদের সভায় ইতিমধ্যেই সকলকে সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে। পানীয় জল ও স্যানিটেশন দপ্তর সংক্রান্ত মন্ত্রকের পাওয়া শেষ তথ্য অনুযায়ী আই আই এইচ এল (এপিএল + বিপিএল) শৌচাগার নির্মাণে সারা দেশের গড় যেখানে ৭৬.৪৭ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় ৮০.৬৫ শতাংশ। ওই একই সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণে সারা ভারতের গড় যেখানে ৯৭.৬৯ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় ৯৮.০৫ শতাংশ। তবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে সারা ভারতের গড়ের থেকে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই পিছিয়ে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গড় যেখানে ৬২.৩৮ শতাংশ, সেখানে সারা ভারতের গড় ৮৭.৮৪ শতাংশ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগ (পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সঙ্গে সমন্বয়)

বিগত ২৬-৭-১৯৮৫ তারিখের হেলথ/এফ ডব্লু ১৫৬৩/৩ এস-২২/৮৫ নং সরকারি আদেশনামায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মাতৃত্ব ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিভাগের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকর্মসূচিগুলিকে সুসংহত করে গ্রামাঞ্চলে বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছিল। সম্প্রতি এই কর্মসূচিগুলির যথাযথ রূপায়ণ ও তদারকিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

(ক) সমস্ত জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদর অঙ্গনে একটি করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে এবং সেটি পঞ্চায়েত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নামে পরিচিত হবে।

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদর এলাকায় একজন করে মহিলা বা পুরুষ স্বাস্থ্য পরিদর্শক থাকবেন, যাঁরা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির তদারকি করবেন।

(গ) জনসাধারণের উপযুক্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলির আরও ভালো রূপায়ণের জন্য গ্রাম সংসদ, এলাকাগুলির স্বনির্ভর দলগুলিকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কাজের সঙ্গে যুক্ত করবে এই স্বনির্ভর দলগুলি জনসাধারণ ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে।

(ঘ) স্বাস্থ্য চিকিৎসা আধিকারিকরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ক্লিনিক চালাবেন।

(ঙ) প্রতিটি স্তরের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিতে এবং ব্লক ও জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতিতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এইসব উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

(ছ) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিঃশর্ত তহবিলের (সাব-সেন্টার আনটায়েড ফান্ড) ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহায়িকা যুগ্ম স্বাক্ষরকারী হবেন।

(জ) ব্লকে হাজার জনসংখ্যা পিছু একজন করে 'আশা কর্মী' নিয়োগ করা হবে। গ্রামের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবরের বিষয়ে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহায়িকা আর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী হবেন 'আশা কর্মী'।

উপসংহার

এই আলোচনা থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার তা হল, স্যানিটেশন কর্মসূচির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে, কিন্তু তারপরেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে হতাশার চিত্র বেশ প্রকট। তবে এ কথা ঠিক, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ ও শক্তিশালী। স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও তাতে জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে নির্বাচন শুরু হয় এবং প্রথম জনগণের অধিকাংশের

সারণি-৩
সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে স্যানিটেশন কর্মসূচির অগ্রগতি (১৯টি জেলায়)

	তৈরির লক্ষ্যমাত্রা	তৈরি হয়েছে
১ পারিবারিক শৌচাগার	৯১.৩৪ লক্ষ	৬২.৪৬ লক্ষ
২ সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার	০.০১ লক্ষ	০.০০৫লক্ষ
৩ বিদ্যালয়ের শৌচাগার	১.৩৪ লক্ষ	০.৬১ লক্ষ
৪ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচাগার	০.৫১ লক্ষ	০.১৪ লক্ষ

সূত্র : পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

চিত্র-১ : টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেন-এ রাজ্যগুলির অগ্রগতি (শতাংশে হিসাব)

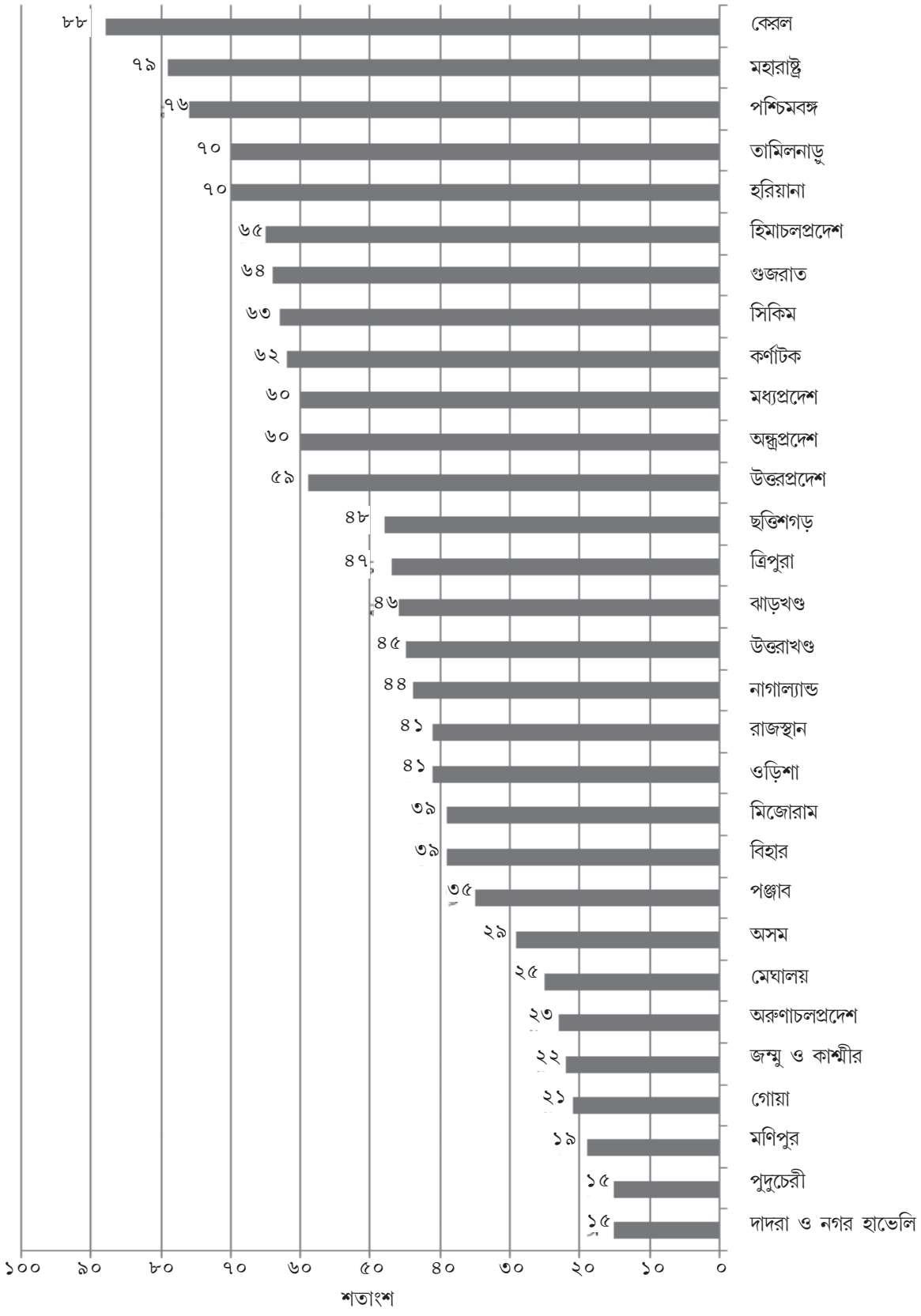

সূত্র : Water and Sanitation program. (TSC এর online monitoring system) TSC website, 2010 পর্যন্ত।

সম্মতির উপর গ্রামীণ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ৭৩তম সংশোধনী আইনের প্রায় ১৫ বছর আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জন্ম হয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চর্চিত ও প্রশংসিত। স্যানিটেশন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনায় বলা যেতে পারে, শৌচাগার নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি কাজগুলিতে পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেও শিশুমৃত্যু রোধ, মাতৃত্ব, মহিলাদের পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। তবে স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মসূচি ও কার্যক্রম কিন্তু থেমে নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত, পৌরসভা নির্বিশেষে স্যানিটেশনের কাজে যাবতীয় ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলিকে সবাই মিলে অপসারণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সারা ভারতের গ্রামীণ এলাকার স্যানিটেশনে ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখন দেখার, এই প্রকল্পের রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কতটা সফল হয়। তবে শুধু কর্মসূচি নয়, সর্বোপরি দরকার সচেতনতা। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে, জনসাধারণের ব্যাপক অংশ এখনও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণ ও দায়িত্বপালনে এগিয়ে আসেনি। পাশাপাশি এও দেখা গেছে যে, গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের অধিবেশনগুলিতে এখনও সবক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হয় না। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এলাকায় অপর একটি সীমাবদ্ধতা হল লিঙ্গবৈষম্য। যদিও ২০১০ সালের ২১ ডিসেম্বর বিধানসভায় গৃহীত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০১০-এ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় লিঙ্গসমতা সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন নয়। তবে যাই হোক, যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চিত্র-১-এতে, টি এস সি ক্যাম্পেনে ভারতের বিভিন্ন রাজগুলির প্রগতির হার শতাংশে দেখানো হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়। আর এক্ষেত্রে এটা বলা ভালো, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা গ্রামীণ, তাই গ্রামীণ স্যানিটেশনে সাফল্য ছাড়া এই স্থান অর্জন সম্ভব নয়।❑

উল্লেখপঞ্জি :

১. পশ্চিমবঙ্গ; "পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন"—২০০৮, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২. Ministry of Drinking water and Sanitation.

৩. West Bengal Human Development Report.

৪. Guidelines on Central Rural Sanitation Programme—Total Sanitation Campaign Ministry of Rural Development. (GOI)

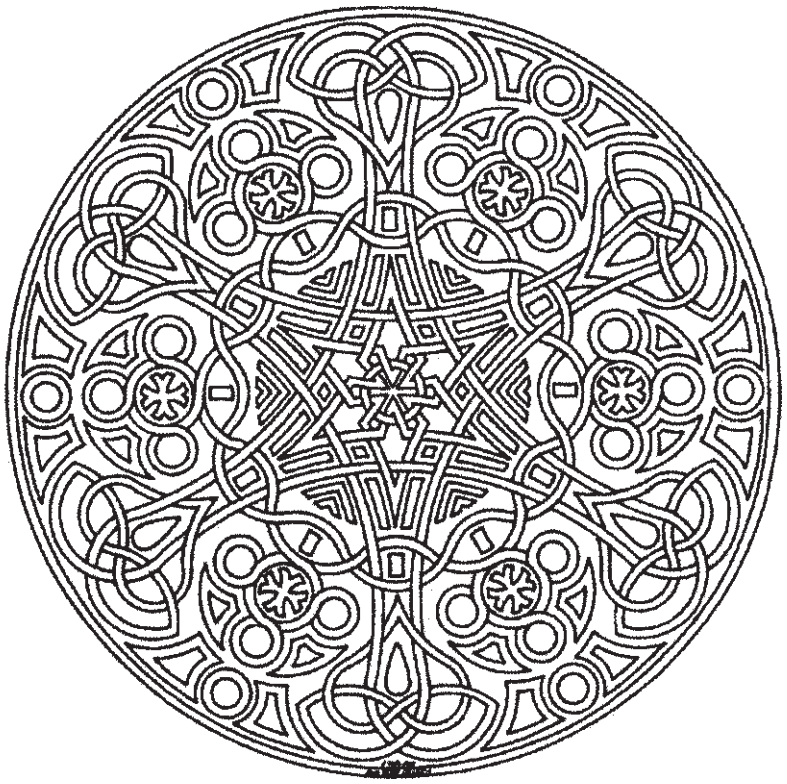

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

ভারতে উৎপাদন উপকরণের আয় অসাম্য

আয় বাঁটোয়ারায় অসাম্য দেশ বিশেষ বা আজকালের নয়। এ এক বহু পুরানো বিশ্বজোড়া সমস্যা। নিবন্ধটিতে ভারতে এই অসাম্যের হালহকিকত তুলে ধরেছেন **ড. তুলসী জয়কুমার।** *সমস্যা লাঘবে পেশাভিত্তিক আয় অসাম্য কমানোর লক্ষ্যে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।*

"শহরমাত্রেই দু-ভাগে বিভক্ত। গরিবের শহর। পয়সাওয়ালার শহর। দুয়ের মাঝে লড়াই চলছে লাগাতার। যারপরনাই পুঁচকে শহরেও এর রকমফের নেই।"
—গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭ অব্দ)

আয় বণ্টনে অসাম্য এবং বিকাশ ও উন্নয়নে তার তাৎপর্য নিয়ে কেতাবি চর্চায় নাটকীয় রদবদল ঘটেছে গত শতকে (গালর ২০১১)। ধ্রুপদি মতে বিকাশের ক্ষেত্রে অসাম্য এক হিতকর প্রভাব ফেলে। নয়া-ধ্রুপদি তত্ত্বে বলা হল বিকাশ প্রক্রিয়ায় আয় বণ্টনের ভূমিকা ছিটেফোঁটা। আর হাল আমলে তো একেবারে উলটপুরাণ। উন্নয়নের ক্ষেত্রে আয় বণ্টনের অসাম্যের বিরূপ প্রভাবের কথা উচ্চগ্রামে ঘোষিত হচ্ছে। একুশ শতকে বেরোল ফরাসি অর্থনীতিবিদ পিকেটির 'ক্যাপিটাল'। এই বইতে উৎপাদন উপকরণের আয় বণ্টন (ফাংশনাল ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন) খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের ধ্যানধারণার আন্তর্জাতিক যাত্রার যোলোকলা হল সাঙ্গ। ব্যক্তি বা পরিবার আয় বণ্টনের ধাতেই আছে অসাম্য। আর এই অসাম্যের তত্ত্ব প্রবল প্রভাব বিস্তার করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি কিন্তু বেশি মাথা ঘামিয়েছে শ্রম ও মূলধনের মধ্যে আয় বণ্টন অর্থাৎ ফাংশনাল ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে। ফাংশনাল ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশনকে এই নিবন্ধে এরপর থেকে পেশাভিত্তিক আয় বিভাজন বলে উল্লেখ করা হবে।

ব্যক্তি থেকে পেশাভিত্তিক আয় বিভাজন— এই পালাবদল কীভাবে ভারতে বিকাশ-উন্নয়ন সংক্রান্ত বিতর্ককে প্রভাবিত করেছে। ভারতে অসাম্য কী উপায়ে মাপজোখ করা হয়। পেশাভিত্তিক আয় অসাম্যের পিছনে কারণ কী। সবশেষে, পরিস্থিতির হেরফেরের দরুন নীতির ক্ষেত্রে তার কী তাৎপর্য। এসব ইস্যু এই নিবন্ধে খুঁটিয়ে দেখা হবে।

পেশাভিত্তিক আয় বিভাজন : অসাম্য নিয়ে বিতর্কে প্রাসঙ্গিকতা

আয় অসাম্যের দুটি দিক। পরিবার ও পেশাভিত্তিক।

আয় অসাম্যের তত্ত্ব

আয় অসাম্য : অর্থনীতিতে পরিবার বা ব্যক্তির আয় বণ্টন পরিমাপ করা হয়। অসাম্যের জিনি সহগ ব্যবহার করে ০ থেকে ১-এ এই মাপ হয়। ০ বলতে পূর্ণাঙ্গ সাম্য বোঝায়। আর ১-এর মানে ষোলো আনা অসাম্য।

পরিবার আয় বণ্টন : এটা হচ্ছে অর্থনীতিতে সব পরিবারের আয় বণ্টন। এদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) প্রাথমিক আয় বণ্টন (প্রাইমারি ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন) : কর ও ভরতুকির আগে প্রতিটি পরিবারে উপকরণ আয় নিয়ে পরিবারের আয় বণ্টন।

(খ) দ্বিতীয় বর্গের আয় বণ্টন (সেকেন্ডারি ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন) : কর বাদ দেবার পর পরিবার আয় বণ্টন।

(গ) তৃতীয় বর্গের আয় বণ্টন (টার্শিয়ারি ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন) : কর ও ভরতুকি বাদ দিয়ে এবং সমাজ উন্নয়ন খরচ থেকে প্রাপ্ত উপকার যোগ করে পরিবার আয় বণ্টন।

পেশাভিত্তিক আয় বিভাজন : জমি, শ্রম, মূলধনের মতো উৎপাদন উপকরণের মধ্যে আয় বণ্টন।

প্রথমটি পরিবার আয় বণ্টন নিয়ে চর্চা করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জমি, শ্রম ও মূলধনের মতো উৎপাদন উপকরণের মধ্যে আয় বিভাজন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

আয় অসাম্য পরিমাপের জন্য জিনি কোইফিশন্ট বা সহগ ব্যবহার বহুল প্রচলিত। মূলত দ্বিতীয় বর্গের (সেকেন্ডারি) আয় বণ্টনের (কর বাদ দিয়ে) ভিত্তিতে এই সহগে ব্যক্তি (পরিবার) অসাম্য ধরা পড়ে। পরিবার আয়ের সীমিত প্রেক্ষিত থেকে দেখলেও এটা স্পষ্ট যে, ভারতের মতো বিকাশশীল দেশে তৃতীয় বর্গের (টার্শিয়ারি) আয় বণ্টন বেশি প্রাসঙ্গিক। সবচেয়ে বড় কথা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এহেন আয়ের কীভাবে উৎপত্তি ও তার ফলে পেশাভিত্তিক অসাম্য ধরতে ব্যক্তিগত অসাম্য পরিমাপক ব্যবস্থা অপারগ। দডিয়া এবং গার্সিয়া পেনালোজা (২০০৭) প্রমাণ করেছেন যে ব্যক্তি আয় বণ্টন পেশাভিত্তিক আয় বিভাজনের ওপর নির্ভরশীল। আর এই যোগসূত্র পরিসংখ্যানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, শ্রমের হিস্যে বাড়লে ব্যক্তি আয়ের যিনি সূচক নামবে।

'মজুরি অর্থনীতিতে' অসাম্যের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তাৎপর্য সহ পেশাভিত্তিক অসাম্যের ইস্যুটি তুলে ধরেন হার্ভার্ড অর্থনীতিবিদ মার্টিন ওয়াইন্টম্যান (১৯৮৪)। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চক্রাকার বেকারি সমস্যার জন্য তিনি দায়ী করেন ধরাবাঁধা মজুরি ব্যবস্থাকে। মন্দার সময় মজুরি অপরিবর্তিত রাখতে বাধ্য হওয়ায় কর্মীদের লে অফ বা বসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এতে সার্বিক চাহিদা পড়তির সমস্যা জাঁকিয়ে বসে। আর এর নিট ফল, অর্থনীতির আরও পতন। তাঁর জোরালো দাবি ধরাবাঁধা মজুরির বদলে মুনাফার অংশভাগী মজুরি ব্যবস্থা চালু করলে মন্দা চাহিদার সময় শ্রম বাবদ খরচ সাশ্রয় হবে। কমবে শ্রমিক ছাঁটাই। ওয়াইজম্যানের মতে নিশ্চলতা-স্ফীতি (স্ট্যাগফ্লেশন) সমস্যা সামলানোর জন্য এ এক স্থায়ী রক্ষাকবচ। নিশ্চলতা-স্ফীতি বলতে বোঝায় যে অবস্থায় চাহিদা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ে না অথচ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এক-আধটা সংস্থায় মুনাফার অংশভাগী মজুরি চালু হলে অবশ্য অবস্থার ইতরবিশেষ হবে না। এই ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে একযোগে সব বা অধিকাংশ সংস্থার রাজি হওয়ার উপর (ওয়াইজম্যান ১৯৮৫)। এজন্য তিনি উপায় বাতলিয়েছেন। তার পরামর্শ মুনাফার অংশভাগী কর্মীদের ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ বাবদ আয়ে কর ছাড় দিয়ে সরকার তাদের উৎসাহ জোগাতে পারে। ভারতের পরিস্থিতিতে অবশ্য এর সম্ভাব্যতা নিয়ে সংশয় আছে বিলকুল। তবে তার উদাহরণে মুনাফার অংশভাগী মজুরির ধাঁচমাফিক জাপানে শ্রমিকদের জন্য বোনাস ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখার দাবি রাখে। গত ন-য়ের দশকের আগে জাপানে বেকারি সমস্যা তুলনায় কম থাকার

সারণি-১

ভোগ বণ্টনের জিনি সহগ (১৯৭৩-৭৪ থেকে ২০০৯-২০১০)

রাজ্য	১৯৭৩-৭৪		১৯৭৭-৭৮		১৯৮৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৯-২০০০		২০০৪-০৫ (ইউআরপি)*		২০০৪-০৫ (এমআরপি)*		২০০৯-১০ (ইউআরপি)*		২০০৯-১০ (এমআরপি)*	
	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
ভারত	০.২৮১	০.৩০২	০.৩৩৬	০.৩৪৫	০.২৯৭	০.৩২৫	০.২৮২	০.৩৪	০.২৬	০.৩৪২	০.৩	০.৩৭১	০.২৬৬	০.৩৪৮	০.২৯১	০.৩৮২	০.২৭৬	০.৩৭১
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.২৮৮	০.২৮৮	০.২৯৮	০.৩১৯	০.২৯২	০.৩০৬	০.২৮৫	০.৩২	০.২৩৫	০.৩১৩	০.২৮৯	০.৩৭	০.২৫২	০.৩৪২	০.২৭৮	০.৩৮২	০.২৬৯	০.৩৫৩
অরুণাচলপ্রদেশ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৭	০.২৪৪	০.২৪	০.২১৩	০.৩৩৩	০.৩২৫	০.২৯৩	০.২৯৯
অসম	০.২	০.২৯৬	০.১৭৯	০.৩২৩	০.১৯২	০.২৪৮	০.১৭৬	০.২৮৬	০.২০১	০.৩০৯	০.১৯৫	০.৩১৬	০.১৮২	০.৩০১	০.২৪৪	০.৩২৪	০.২২	০.৩২৮
বিহার	০.২৭৩	০.২৬৫	০.২৫৮	০.৩০৪	০.২৫৫	০.২৯৭	০.২২২	০.৩০৭	০.২০৭	০.৩১৯	০.২০৫	০.৩৩	০.১৮৫	০.৩১২	০.২২৬	০.৩৩২	০.২১৫	০.৩১৯
ছত্তিশগড়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৯৫	০.৪৩৪	০.২৫১	০.৩৫৪	০.২৭৬	০.৩২৬	০.২৩৪	০.৩০৫
দিল্লি	০.১৪৯	০.৩৫৩	০.২৯	০.৩৩	০.২৮৯	০.৩৩১	০.২৩৬	০.২০৭	০.২৯৪	০.৩৪৩	০.২৬৪	০.৩২৯	০.২৬২	০.৩২৪	০.২৫৩	০.৩৪৫	০.২৩৩	০.৩৫২
গোয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৯৪	০.৪০৫	০.২৬৭	০.৩৩৩	০.২১৪	০.৪০৬	০.২১৯	০.২৫১
গুজরাত	০.২৩৪	০.২৪৬	০.২৮৫	০.৩০৮	০.২৫২	০.২৬৪	০.২৩৬	০.২৮৭	০.২৩৪	০.২৮৬	০.২৬৯	০.৩০৫	০.২৫১	০.২৯৫	০.২৫৩	০.৩২৮	০.২৫২	০.৩০৯
হরিয়ানা	০.২৯১	০.৩১	০.২৮৮	০.৩১৩	০.২৭১	০.৩০৪	০.৩০১	০.২৮	০.২৩৯	০.২৮৭	০.৩২২	০.৩৬	০.২৯৫	০.৩২৬	০.৩০১	০.৩৬	০.২৭৮	০.৩৫৭
হিমাচলপ্রদেশ	০.২৪৩	০.২৭৩	০.২৫৫	০.২৯৭	০.২৬৬	০.৩১৩	০.২৭৬	০.৪৩৫	০.২৩৫	০.২৯৫	০.২৯৬	০.৩১৮	০.২৬	০.২৬১	০.৩০৫	০.৩৯৯	০.২৮৩	০.৩৫১
জম্মু ও কাশ্মীর	০.২৪৪	০.২৪৪	০.২২২	০.৩৩৪	০.২২১	০.২৩৫	০.২৩৪	০.২৮১	০.১৭৩	০.২২৪	০.২৩৭	০.২৪৫	০.১৯৭	০.২৪১	০.২৩৫	০.৩০৫	০.২২১	০.৩০৭
ঝাড়খণ্ড	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২২৫	০.৩৫১	০.১৯৯	০.৩২৬	০.২৪	০.৩৫৮	০.২১২	০.৩৪৩
কর্ণাটক	০.২৭৭	০.২৯১	০.৩২১	০.৩৪২	০.২৯৯	০.৩৩	০.২৬৬	০.৩১৫	০.২৪১	০.৩২৩	০.২৬৩	০.৩৬৪	০.২৩২	০.৩৫৮	০.২৩৫	০.৩৩৪	০.২৩১	০.৩৭৫
কেরালা	০.৩১৪	০.৩৭	০.৩৫৩	০.৩৫৬	০.৩৩	০.৩৭১	০.২৮৮	০.৩৩৮	০.২৭	০.৩২১	০.৩৪১	০.৪	০.২৯৪	০.৩৫৩	০.৪১৭	০.৪৯৮	০.৩৫	০.৪
মধ্যপ্রদেশ	০.২৮৬	০.২৭	০.৩৩১	০.৩৭৭	০.২৯২	০.২৯	০.২৭৭	০.৩২৭	০.২৪২	০.৩১৫	০.২৬৫	০.৩৯৩	০.২৩৭	০.৩৫১	০.২৯২	০.৩৬৪	০.২৭৬	০.৩৬৫
মহারাষ্ট্র	০.২৬৪	০.৩৩১	০.৪৬২	০.৩৬২	০.২৮৩	০.৩২৯	০.৩০২	০.৩৫১	০.২৫৮	০.৩৪৮	০.৩০৮	০.৩৭২	০.২৭	০.৩৫	০.২৬৮	০.৪১	০.২৪৪	০.৩৮
মণিপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.১৫৬	০.১৭৪	০.১৩৬	০.১৪৯	০.১৭৩	০.২১৩	০.১৫৯	০.১৯৩
মেঘালয়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.১৫৭	০.২৫৮	০.১৩৬	০.২৪	০.২	০.২৫৬	০.১৭	০.২৪৩
মিজোরাম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.১৯৩	০.২৪৪	০.১৬৭	০.২১৩	০.২৩৭	০.২৩	০.১৯৪	০.২২৮
নাগাল্যান্ড	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২০৭	০.২৩৫	০.১৭৩	০.২১৪	০.১৮৬	০.২৩৭	০.১৮১	০.২২২
ওড়িশা	০.২৬২	০.৩৪২	০.৩০১	০.৩২৪	০.২৬৬	০.২৯৪	০.২৪৩	০.৩০৪	০.২৪৪	০.২৯২	০.২৮১	০.৩৫	০.২৫৪	০.৩৩	০.২৬৬	০.৩৮৯	০.২৪৭	০.৩৭৫
পঞ্জাব	০.২৭	০.২৮৭	০.৩০৩	০.৩৮	০.২৭৯	০.৩২১	০.২৬৫	০.২৭৬	০.২৩৯	০.২৯	০.২৭৯	০.৩৯৩	০.২৬৩	০.৩২৩	০.২৮৮	০.৩৭১	০.২৮৫	০.৩৫৮
রাজস্থান	০.২৭৬	০.২৮৭	০.৪৬৪	০.২৯৬	০.৩৪	০.৩০১	০.২৬	০.২৯	০.২০৯	০.২৮২	০.২৪৬	০.৩৬৭	০.২০৪	০.৩০৩	০.২২৫	০.৩৭৮	০.২১৪	০.৩১৬
সিকিম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৬৬	০.২৫৪	০.২৩৬	০.২৩২	০.২৭৫	০.১৯৪	০.২৫৯	০.১৮৬
তামিলনাড়ু	০.২৬৯	০.৩০৫	০.৩১৯	০.৩৩৩	০.৩২৪	০.৩৪৭	০.৩০৭	০.৩৪৪	০.২৭৯	০.৩৮১	০.৩১৬	০.৩৫৬	০.২৫৮	০.৩৪৫	০.২৬৪	০.৩৩২	০.২৫৭	০.৩২৭
ত্রিপুরা	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২১৬	০.৩৩৮	০.২০৩	০.৩	০.২০৫	০.২৯৪	০.১৯৭	০.২৮৮
উত্তরপ্রদেশ	০.২৩৬	০.২৯৩	০.২৯৯	০.৩২৭	০.২৯	০.৩১২	০.২৭৮	০.৩২৩	০.২৪৬	০.৩২৮	০.২৮৬	০.৩৬৬	০.২৩৪	০.৩৩৯	০.৩৫৬	০.৩২৯	০.৪৩৮	০.৩২১
উত্তরাখণ্ড	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৭৯	০.৩২৩	০.২২৩	০.৩০২	০.২৬৩	০.৩৬১	০.২৩১	০.৩৯৫
পশ্চিমবঙ্গ	০.২৯৬	০.৩১৫	০.২৯২	০.৩১৭	০.২৮৪	০.৩২৮	০.২৫১	০.৩৩৪	০.২২৪	০.৩৪১	০.২৭	০.৩৭৮	০.২৪১	০.৩৫৬	০.২৩৯	০.৩৮৪	০.২২	০.৩৮৪
আন্দামান ও নিকোবর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৯	০.৩৫১	০.২৫৩	০.৩০৫	০.২৪৬	০.২৭১	০.২৫৬	০.৩১৬
চণ্ডীগড়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৪	০.৩৪৪	০.২৪৪	০.৩৪১	০.১৯৩	০.৪৪৯	০.৩০৮	০.৩৭৩
দাদরা ও নগর হাভেলি	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.৩৫১	০.২৯৬	০.৩২৪	০.২৯৫	০.২০৬	০.২০৮	০.২২	০.২২৪
দমন ও দিউ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২২৩	০.২৫৮	০.২০৯	০.২৪২	০.৩০৫	০.২৮৩	০.২৮৭	০.২৬৪
লাক্ষাদ্বীপ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.২৪	০.৩৮৩	০.১৬৭	০.২৩৬	০.৩২	০.৩৩৬	০.৩১৪	০.২৭৯
পুদুচেরী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	০.৩৩৭	০.৩১২	০.২৮১	০.৩০২	০.৩০৭	০.৩০৭	০.২৫৪	০.৩৭৮

ইউআরপি - ইউনিফর্ম ফেরারেন্স পিরিয়ড, এমআরপি – মিক্সড রেফারেন্স পিরিয়ড

Note : Gini coefficient is calculated assuming that all individuals within each state have gross income equal to per capita GSDP. This method ignores the inequality arising out of the unequal distribution within each state, and focuses only on inequality.

সূত্র : যোজনা কমিশন, ভারত (http://planningcommission.nic.in/data/datatable/0814/table 105.pdf)

জন্য এই বোনাস ব্যবস্থার এক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

হালে, পিকেটি (২০১৪) পেশাভিত্তিক অসাম্য বৃদ্ধি রোখার জন্য সওয়াল করেছেন—গণতন্ত্র সুরক্ষার এক উপায় হিসেবে।

উনিশ শতক পর্যন্ত অধিকাংশ সময় অর্থনীতির বিকাশ হার থেকে মূলধন বাবদ রিটার্নের হার অনেকখানি বেশি। একুশ শতকে এই অবস্থা ফিরে আসার সম্ভাবনা যারপরনাই। সেক্ষেত্রে এটা বলা অসংগত নয় যে উৎপাদন ও আয়ের চেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদ বাড়ে বেশি। একজনের গোটা জীবনের শ্রমের দাম উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদের কাছে ঢের তুচ্ছ। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের মূল কথা সামাজিক ন্যায়ের তত্ত্ব এবং যোগ্যতা বা গুণের সঙ্গে এটা খাপছাড়া (পিকেটি ২০১৪)।

ভারতে অসাম্য

সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরে মাথাপিছু ভোগব্যয়ের জন্য জিনি সহগ ব্যবহার করে ভারতে অসাম্য পরিমাপ করা হয়েছে। (সারণি-১)। ১৯৭৩-৭৪ থেকে ২০০৯-১০-এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ভোগব্যয়ে অসাম্য কমেনি তেমন একটা। এখানে অবশ্য খেয়াল রাখা দরকার ভোগব্যয়ে অসাম্য সচরাচর অসাম্যের মাত্রা লঘু করে দেখায়।[১] অসাম্যের মাত্রা আরও সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে পরিবার আয়।

ভারত মানব উন্নয়ন সমীক্ষায় (২০১০) দেশে পরিবার আয়ের হিসাব করা হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই এতে দেখা গেছে ভোগব্যয়ের জিনি সহগের তুলনায় আয় অসাম্য ঢের বেশি। জিনি সূচকে ভারতে ভোগব্যয় অসাম্য ০.৩৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে মানব উন্নয়ন সমীক্ষা অনুযায়ী আয় অসাম্য ০.৫২ শতাংশ। শহরে অসাম্য বেশি—বহুকথিত শব্দগুচ্ছটিও সমীক্ষায় ধোপে টেকেনি। গ্রামের চেয়ে শহরে আয় বেশি, তবে অসাম্যের ফারাক কম—গ্রামে জিনি আয় সহগ ০.৪৯ শতাংশের তুলনায় শহরে তা ০.৪৮ শতাংশ। এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে আয় অসাম্যের বড় কারণ অদক্ষ শ্রমিক।

সারণি-২-এ একাধিক উৎস থেকে আয় করা পরিবারের শতাংশ তুলে ধরা হয়েছে। আয়ের উৎসের বৈচিত্র্য দেখিয়েছে এই সারণি। এ থেকে ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের আন্তঃসম্পর্ক ধরা পড়ে। কোনও নীতি অর্থনীতির একটি-একটি ক্ষেত্রে নাড়া দিলে তার প্রভাব পড়তে পারে বহু পরিবারে। তবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল সমীক্ষার হিসাবে এক বিশাল সংখ্যাগুরু পরিবারের (প্রায় ৫৭.৪ শতাংশ) আয় আসে মজুরি বা চাষবাস থেকে। মজুরি আয়ের অংশ এত বেশি হওয়ায় ব্যক্তি আয় অসাম্যের একটা বড় কারণ পেশাভিত্তিক আয় অসাম্য।

সারণি-২
পরিবারের আয়ের উৎস (শতাংশ)

কৃষি	মজুরি*	ব্যাবসা	অন্যান্য**	গ্রাম	শহর	মোট	গড় আয়
✓	✓	✓	✓	১.১৪	০.২৬	০.৮৯	৩৫,৭৫৫
✓	✓	✓	✓	২.৭৮	০.৬১	২.১৬	৩২,৯৩৮
✓	✓		✓	৮.৬৯	১.১২	৬.৫২	২৫,৫০৭
✓	✓			২৩.৫৫	৩.৮৩	১৭.৮৯	২৩,৫৩৬
✓		✓	✓	১.৪	০.৫১	১.১৫	৫৪,৮৫০
✓		✓		৩.৯	১.২৮	৩.১৫	৩৬,০০০
✓			✓	৫.৪৮	০.৫৬	৪.০৭	৩১,২৬৫
✓				১১.২৭	১.০৩	৮.৩৩	২০,৯৬৪
	✓	✓	✓	০.৮১	১.৬১	১.০৪	৪৭,৪০০
	✓	✓		২.৪৩	৫.৯৮	৩.৪৫	৪০,৯০০
	✓		✓	৬.৩৩	১২.১	৭.৯৮	৩৩,৬০০
	✓			২৪.২৩	৪৮.৪৬	৩১.১৮	২৭,০০০
✓		✓	✓	০.৯৯	৩.৭১	১.৭৭	৫২,০০০
		✓		৩.৩৯	১৪.১	৬.৪৭	৪০,০০০
			✓	১.৯৮	৪.১৫	২.৬	১৮,০০০
ঋণাত্মক অথবা আয় শূন্য				১.৬১	০.৬৯	১.৩৫	-৯৮৫
মোট				**১০০**	**১০০**	**১০০**	

[* মজুরি= কৃষি, অকৃষি ও বেতন]

[** অন্যান্য= অবসর ভাতা, সরকারি কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত টাকা ইত্যাদি]

সূত্র : IHDS (২০১০), পৃ. ১৭।

পেশাভিত্তিক আয় অসাম্যের কারণ

পেশাগত আয় অসাম্যের দুটি কারণ—বহিস্থ (বিশ্বায়নের দরুন) ও অভ্যন্তরীণ (দেশের নীতি হেতু)। মুক্ত বাণিজ্যের মাত্রা, অর্থবাজার উদারীকরণ (পুঁজির উন্মুক্ততা) এবং কারিগরি পরিবর্তনকে পেশাভিত্তিক অসাম্যের বহিস্থ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া, মুদ্রা, বিনিময় হার এবং রাজস্ব নীতি ও বিকাশ, লগ্নি ও কর্মসংস্থানের প্রভাব ফেলার মাধ্যমে এ ধরনের অসাম্যের কারণ হিসেবে কাজ করে (রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৩)।

মুক্ত বাণিজ্যের মাপকাঠি হিসেবে রপ্তানি + আমদানি (বাণিজ্য)-এর অঙ্ককে প্রকৃত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। অর্থবাজার উদারীকরণ মাপা হয় ভারতে নিট পোর্টফোলিও (শেয়ার, বন্ড) বিনিয়োগের পরিমাণের মাধ্যমে। আর মূলধন-শ্রম অনুপাত হচ্ছে কারিগরি পরিবর্তনের পরিমাপক।

রেখাচিত্র-১-এ বাণিজ্য উন্মুক্ততা ও শ্রমের অংশভাগের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, ভারত বাণিজ্য এবং পুঁজির আসা-যাওয়া আরও উন্মুক্ত করায় শ্রমের হিস্যে কমছে।

এরপর, আমাদের কারিগরি পরিবর্তনের একটা হিসাব পাওয়া দরকার। এজন্য ফিনস্ট্রা ও অন্যান্যদের ব্যবহৃত পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০১১-তে ভারতে মূলধন-শ্রমিক অনুপাত বেড়েছে ২.৩৭ গুণ। ওই সময় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (চলতি মূল্যে) শ্রমের হিস্যে ০.৬৫ শতাংশ থেকে নেমে গেছে ০.৪৮৫ শতাংশে। স্থির মূল্যে মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা ০.৭৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.০৭ শতাংশ (ভিত্তিবর্ষ ২০০৫ = ১)। সুতরাং, অনুমান করা যেতে পারে যে মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফায়দা লুটেছে পুঁজিমালিকরা, শ্রমিকরা নয়।

পণ্য, পরিষেবা এবং পুঁজির চলাচলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সংযুক্তি বাড়ছে। কারিগরি উদ্ভাবন থেকেও লাভবান হচ্ছে ভারত। এর সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯১-২০১১-তে শ্রম হিস্যে তুলনামূলকভাবে ক্ষয় পেয়েছে। তবে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যে অসাম্যের হিসাব জোগাতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান যথেষ্ট নয়।

শ্রমের হিস্যেতে উন্মুক্ততা ও কারিগরি পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মোটামুটি মিল আছে ভারতের। ১৯৯৫-২০১৩-তে প্রায় সব দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশে শ্রমের অংশ কমে গেছে। এক্ষেত্রে ভারতের স্থান তার অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে নীচে। শ্রম আয়ের অংশ

১ আয়ের তুলনায় ভোগে সাধারণত সাম্য বেশি। ভোগব্যয়ে গরিব ও বড়লোকের ফারাক অপেক্ষাকৃত কম। ধনী পরিবার আয়ের তুলনায় ভোগে কম ব্যয় করে। আর গরিবরা আয়ের বড় অংশটা খরচ করে ভোগের পিছনে।

কমার প্রভাব পড়ে ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ে এবং তার মাধ্যমে ভারতের বিকাশ কাহিনিতে।

অভ্যন্তরীণ নীতি কীভাবে পেশাভিত্তিক আয় বিভাজনে প্রভাব ফেলে। গত আটের দশকের শেষে ঋণ সংকটের মুখে পড়ে কেনসীয় সমষ্টি-স্থিতিশীলতা থেকে সরে এসে রাজস্ব ভারসাম্য ও মূল্য স্থিতিশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয় আরও বেশি। অসাম্য বাড়ার জন্য এহেন নীতি পরিবর্তনও দায়ী বৈকি। সংকোচনমূলক মুদ্রা নীতির দরুন সুদের হার, লগ্নি ও বিকাশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর এর মোদ্দা ফল বেকারির বাড়বাড়ন্ত। আর্থিক উদারীকরণে বিনিময় হার বেড়ে যায়। আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় মার খায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান। একইভাবে পরিকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ কাটছাঁট করে রাজস্ব ভারসাম্য অর্জনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। এসবে গরিবদের উপার্জন ক্ষমতা ও সামাজিক সচলতার সুযোগসুবিধার হানি হয় (রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১৩)।

তাই মূল্যবৃদ্ধি দমন ও রাজস্ব ভারসাম্য রক্ষা করার নীতির দরুন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শ্রমের হিস্যে কমে যাওয়ার অবাঞ্ছিত ফল দেখা দিতে পারে।

২০১০-এর পর বিশ্ব আর্থিক সংকটকালে ভারত কড়া মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি অনুসরণ করেছে। দামের স্থিতিশীলতা বজায় ও রাজস্ব ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে এহেন নীতির তাৎপর্য সীমিত (যদি আদৌ থাকে)। আর তার দরুন মার খায় বিকাশ ও কর্মসংস্থান। তা প্রতিফলিত হয় শ্রমের অংশ কমে গিয়ে পেশাভিত্তিক অসাম্য বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে। এহেন নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত বাইরের আঘাত বা ধাক্কা সামাল দেওয়া।

নীতি তাৎপর্য

অসাম্যের এই ঝঞ্ঝাটে ইস্যুটিকে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। অসাম্যের মোকাবিলা কীভাবে করা হবে ও তাতে সরকারের কী ভূমিকা থাকবে, সেদিকে নীতির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ভারতে মান্ধাতার আমলের শ্রম আইনের মতো সরকারি নিময়কানুন দিয়ে কাজ হবে না, এতে হয় বেকারি (আরও বেশি চুক্তি শ্রমিক নিয়োগের রূপ ধরে) আরও বাড়বে বা অটোমেশনের বাড়াবাড়ি হবে। মূলধনে বেশি কর চাপিয়ে কোনও ফায়দা হবে না। কর ফাঁকি বাড়বে কেবলমাত্র।

রেখাচিত্র-১ : বাণিজ্য উন্মুক্ততা ও শ্রমের অংশভাগ

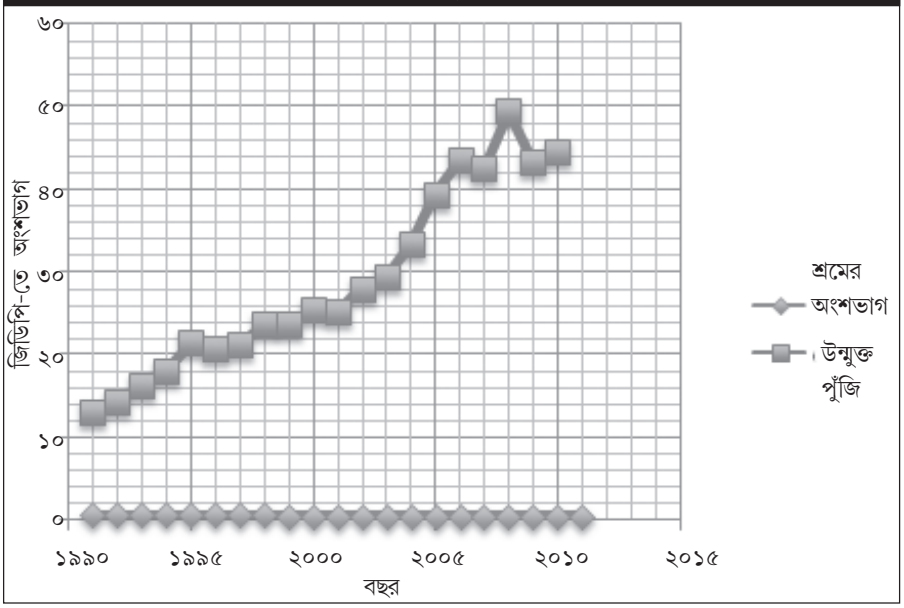

উৎস : PENN WORLD TABLE

রেখাচিত্র-২ আর্থিক উদারীকরণ ও অসাম্য

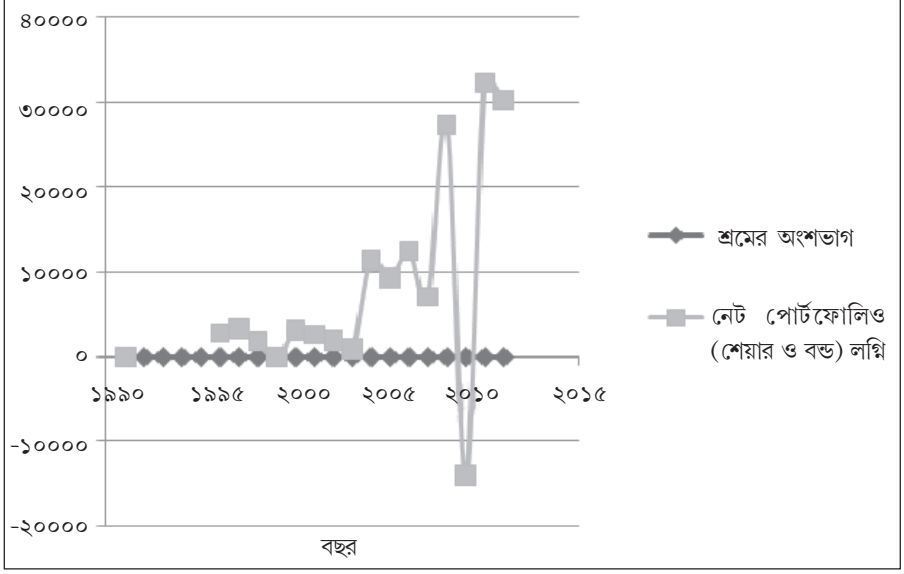

উৎস : ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন

একদিকে আমরা বিধান দিচ্ছি মুনাফার অংশভাগী মজুরি দেওয়া সংস্থাগুলিকে করে বাড়তি কিছু ছাড় দেবার জন্য। এতে অসাম্য কমার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ভোগ ও সার্বিক চাহিদা বজায় থাকবে (জয়কুমার ২০১৪)।

পক্ষান্তরে, বিকাশ ও মুদ্রাস্ফীতি থেকে নজর সরিয়ে বিশ্বায়নের ক্ষতিকর দিক সামলানোর জন্য সরকারের নীতিতে কর্মসংস্থান ও দক্ষতা সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মজুরি উপার্জনকারীদের কাছে নগদ টাকা হস্তান্তর করলে ভারতে পেশাভিত্তিক অসাম্য কমতে পারে।

মোট কথা, ব্যক্তির চেয়ে পেশাভিত্তিক অসাম্য কমানোর লক্ষ্যে একগোছা ব্যবস্থা নিলে অসাম্য লাঘব করার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।❑

[লেখক এস.পি. জৈন ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ-এ অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক।
email: tulsi.jayakumar@spjimr.org]

বিপন্ন জীববৈচিত্র্য

আমাদের পৃথিবীর জীবজগৎ কতটা বৈচিত্র্যময়, সেদিকে আলোকপাত করেছেন **অনিন্দ্য ভুক্ত**। *এই বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি নেই। তবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই জীববৈচিত্র্য দ্রুতগতিতে বিলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে এবং মানব জাতির ওপর এর কুপ্রভাবও ক্রমশ প্রকাশ্য। কীভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে এই জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে, তারও সন্ধান পাওয়া যাবে এই নিবন্ধে।*

হারিয়ে যাচ্ছে ওরা। আমাদের প্রতিবেশীরা। চারপাশে যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবেশ। ওরা গাছ, পাতা, ফুল, ফল, কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখি—হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে, যে গতি ক্রমবর্ধমান। প্রতি বছর প্রায় সাতাশ হাজার জীব প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে, বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই নীল গ্রহটির বুক থেকে। হিসাব বলছে বিলুপ্তি যদি এই হারেই চলতে থাকে, তবে আর বেশিদিন নয়, ২০৫০ সাল নাগাদই পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ জীব প্রজাতি হারিয়ে যাবে। সেই হারিয়ে যাওয়ার ফল কতটা বিষময় হয়ে উঠতে পারে আমাদের জীবনে তার কোনও ধারণাই আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। আর ওঠেনি বলেই অবাধে চলে পশুহত্যা, অবাধে চলে অরণ্যনিধন। জীববৈচিত্র্যের বিপন্নতাকে তাই আজ কেবল পাঠ্যপুস্তকের পাতায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে জনচেতনার চৌহদ্দিতে। জনে জনে জানাতে হবে জীববৈচিত্র্য কী, আমাদের জীবনে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব কী, আর কী-ই বা হতে পারে এই বিপুল বৈচিত্র্য আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেলে। এই সামগ্রিক রূপরেখার অনেকগুলি ধাপ, উপধাপ আছে। আমরা ধাপে ধাপেই আলোচনা করব।

জীববৈচিত্র্য কাকে বলে

জীববৈচিত্র্য কাকে বলে তা বোধহয় আলাদা করে বলার আর দরকার নেই। শব্দটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৃথিবীতে জীবের বৈচিত্র্যময় উপস্থিতিকেই জীববৈচিত্র্য বলে। এই জীবের তালিকায় যেমন প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে, তেমনই আছে ভাইরাসও, যাদের কিনা প্রাণী নাকি উদ্ভিদ, কোন তালিকায় ফেলা হবে তা নিয়ে বিজ্ঞানিকুলেই মতদ্বৈধ আছে।

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য কতটা সমৃদ্ধ তা কিন্তু এখনও অনুমানের স্তরেই আছে। মানে মানুষ এখনও সবটা গুনে ফেলতে পারেনি। শুধু গুনে ফেলাই বা কেন, অনুমানও করে উঠতে পারেনি। পারেনি যে তা বোঝা যাবে অনুমানের ধরনটি দেখলেই, যে অনুমান বলছে এই পৃথিবীতে জীব প্রজাতির সংখ্যা ৫০ লক্ষ থেকে ৫ কোটি। এদের মধ্যে বেশির ভাগটিকেই চিনে ওঠা ও চিহ্নিত করার কাজ বাকি। চিনে ওঠা গেছে কম-বেশি ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজারের মতো প্রজাতিকে। এর মধ্যে ৭,৫১,০০০ পতঙ্গ, ২,৫০,০০০ সপুষ্পক উদ্ভিদ, ২,৮১,০০০ প্রাণী, ৬৮,০০০ ছত্রাক, ৩০,০০০ হাজার এককোষী প্রাণী, ২৬,৯০০ শৈবাল, ৪,৮০০ ব্যাকটেরিয়া এবং ১০০০ ভাইরাস। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের এই যে উপস্থিতি, একে বলা হয় প্রজাতিগত বৈচিত্র্য।

প্রজাতিগত বৈচিত্র্যেই কিন্তু জীববৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি নয়। অসংখ্য প্রজাতির জীব যেমন আছে, তেমনই একই প্রজাতির মধ্যে আছে বিভিন্ন সদস্য, যারা কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে একে অন্যের থেকে আলাদা। যেমন ধান, একটি উদ্ভিদ প্রজাতি। এই ধানেরই আবার অসংখ্য প্রকারভেদ আছে। ভারতেই একটা সময় ৫০,০০০ রকমেরও বেশি ধান পাওয়া যেত। একই প্রজাতির মধ্যে এই বিভিন্নতার প্রকাশ ঘটে জিনের পার্থক্যের কারণে। এই ধরনের জীববৈচিত্র্যকে তাই বলা হয় জিনগত বৈচিত্র্য।

জীববৈচিত্র্যের আরও একটি প্রকারভেদের কথা বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন। একে বলে বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য। বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য যদিও নতুন ধরনের কোনও জীবের সন্ধান দেয় না। বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের জীবের উপস্থিতির কথা বলা হয়।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

ছোট্ট একটি ঘটনার কথাই প্রথমে বলা যাক। ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের কথা। ঘটনাস্থল আয়ারল্যান্ড। আয়ারল্যান্ডের চাষিরা সেইসময় আলুর একটিমাত্র প্রকরণের চাষই করতেন। সেই জাতের আলু এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষয়রোগের (পটেটো ব্লাইট) প্রকোপে পড়ল। সেই আলু খেয়ে দেশ জুড়ে মানুষ মড়কের কবলে পড়ল। মারা গেল দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ। হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুধাবনের পক্ষে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। যদি আয়ারল্যান্ডের চাষিদের সামনে দ্বিতীয় কোনও জাতের আলুবীজ থাকত তাহলে এই বিপর্যয় ঘটত না। বস্তুত জীববৈচিত্র্যের এটিই অন্যতম প্রধান গুরুত্ব, তা কোনও বাস্তুতন্ত্রকে সহজে বিপন্ন, অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচায়। একটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জীব খাদ্য-খাদক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং কোনও বাস্তুতন্ত্রে জীববৈচিত্র্য যত সমৃদ্ধ হবে, সেই বাস্তুতন্ত্রে কোনও খাদকের খাদ্যের অভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তত কমবে।

সারণি-১
পৃথিবীর জীবসম্পদ

জীবগোষ্ঠী	প্রজাতি সংখ্যা	জীবগোষ্ঠী	প্রজাতি সংখ্যা
ক. মেরুদণ্ডী প্রাণী		**গ. উদ্ভিদ**	
১. উভচর	৬,১৯৯	১. মস	১৫,০০০
২. পাখি	৯,৯৫৬	২. ফার্ন ও ফার্নজাতীয়	১৩,০২৫
৩. মাছ	৩০,০০০	৩. ব্যক্তবীজী	৯৮০
৪. স্তন্যপায়ী	৫,৪১৬	৪. দ্বিবীজপত্রী	১,৯৯,৩৫০
৫. সরীসৃপ	৮,২৪০	৫. একবীজপত্রী	৫৯,৩০০
মোট মেরুদণ্ডী প্রাণী	৫৯,৮১১	৬. সবুজ শৈবাল	৩,৭১৫
খ. অমেরুদণ্ডী প্রাণী		৭. লাল শৈবাল	৫,৯৫৬
১. পতঙ্গ	৯,৫০,০০০	মোট উদ্ভিদ	২,৯৭,৩২৬
২. শামুক	৮১,০০০	**ঘ. অন্যান্য**	
৩. ক্রাসটেশিয়ান	৪০,০০০	১. লাইকেন	১০,০০০
৪. প্রবাল	২,১৭৫	২. মাশরুম	১৬,০০০
৫. অন্যান্য	১,৩০,২০০	৩. বাদামি শৈবাল	২,৮৪৯
মোট অমেরুদণ্ডী প্রাণী	১২,০৩,৩৭৫	মোট অন্যান্য	২৮,৮৪৯
		মোট	**১৫,৮৯,৩৬১**

টীকা : মনে রাখতে হবে, এইসব হিসাবই সতত পরিবর্তনশীল। হিসাব বলছে প্রতি বছর ১০,০০০ জীব নতুন করে আবিষ্কৃত হচ্ছে। পাশাপাশি বিলুপ্তও হচ্ছে প্রতি বছর ১৪,০০০-৪০,০০০ প্রজাতি।

উৎস : দ্য ইনটারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস (IUCN), রেড লিস্ট, ২০০৭।

তবে বাস্তুতন্ত্রের এই স্থিতিশীলতা রক্ষার বিষয়টি তো সমগ্র জীবজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কাছে জীব-বৈচিত্র্যের আর-একটি অপরিসীম গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর উদ্ভিদবৈচিত্র্য ও প্রাণী-বৈচিত্র্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মানুষ যখন প্রথম চাষ শুরু করে তখন এই সংখ্যাটিও ছিল হাতে গোনা। তারপর সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষিজীবী মানুষ বনেবাদাড়ে ঘুরে একটি একটি করে গাছ, গাছের ফল পরীক্ষা করে দেখেছে কোনটি খাদ্য, কোনটিই বা অখাদ্য। করেছে বলেই তাই আজ আমাদের সামনে খাদ্যের এত বৈচিত্র্য। পৃথিবীর জনসংখ্যা যত বেড়েছে, কৃষককুলের এই পরিশ্রমের মূল্য মানুষ ততই বুঝেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি তো ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন হবার দরকার। জনসংখ্যা তো আর কমছে না, বরং বাড়ছে প্রতিনিয়ত। খাদ্যের প্রয়োজনও অতএব বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা যত বেড়েছে, নতুন নতুন শস্যবীজ খুঁজে বার করা ছাড়াও কৃষক সম্প্রদায় জন্ম দিয়েছে নানা ধরনের সংকর বীজের। এইসব সংকর বীজ নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ফলন দিতে সক্ষম। ভারতে যে ৫০,০০০ রকমের ধানের বীজ একসময় পাওয়া যেত, তার একটা বড় অংশই তো এভাবে আমাদের চাষিদের হাতে তৈরি। জীববৈচিত্র্য যত বেশি হবে এই ধরনের বীজ তৈরি তত সহজ ও সফল হবে। আর বর্তমানে যখন সারা পৃথিবীর জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তখন এই ধরনের বীজের চাহিদা বাড়ছে, যা প্রকারান্তরে বাড়াচ্ছে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব।

শুধু খাদ্য নয়, আর যে বস্তুটির জন্য মানুষ জীববৈচিত্র্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল, সেটি হল ওষুধ। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ গাছগাছড়া থেকে তার খাদ্য সন্ধান করেছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির বুক থেকে খুঁজে নিয়েছে রোগজ্বালার ওষুধ। এই আধুনিক পৃথিবীতেও যত ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় তার গরিষ্ঠাংশই গাছগাছড়া বা প্রাণীর নির্যাস থেকে তৈরি। এই ধরনের ওষুধের চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে। গরিব, অনুন্নত দেশগুলির অধিকাংশ মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই ভেষজ ওষুধের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইদানীং ব্রিটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশেও এই ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ওষুধের জন্য গাছগাছড়ার উপরই নির্ভর করেন।

আধুনিক শিল্পসভ্যতার মেরুদণ্ডও কিন্তু জীববৈচিত্র্য। শিল্পের কাঁচামাল জোগান দেয় প্রধানত উদ্ভিদজগৎ। প্রাণীদেহ, এমনকি ভাইরাসকেও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগানো হয়। জীববৈচিত্র্যের বিনষ্টি তাই শিল্পবৈচিত্র্যকেও বিনষ্ট করবে।

জীববৈচিত্র্যের অন্যবিধ গুরুত্বও আছে। যেমন—পর্যটনগত গুরুত্ব, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি। তবে এখানে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই। জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বটুকু এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ছিল, জীববৈচিত্র্যের হারিয়ে যাওয়া আমাদের কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে একটা ধারণা দেওয়া। আশা করা যাক, সে কাজ হয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের সম্ভার : এই দেশে, এই বিশ্বে

সারা পৃথিবী জুড়ে জীববৈচিত্র্যের আবণ্টন অসম। নিরক্ষরেখা (বা বিষুবরেখা)-কে কেন্দ্র করে উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তি ও দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী যে অংশ, সেই অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে আবার সেই সমস্ত অঞ্চলই জীববৈচিত্র্যে অধিকতর সমৃদ্ধ

সারণি-২
ভারতের জীব সম্পদ

জীবগোষ্ঠী	প্রজাতি সংখ্যা
ক. মেরুদণ্ডী প্রাণী	
১. স্তন্যপায়ী	৩৮৬
২. পাখি	১,২১৯
৩. সরীসৃপ	৪৯৫
৪. উভচর	২০৭
৫. মাছ	২,৫৪৬
খ. অমেরুদণ্ডী প্রাণী	
১. পতঙ্গ	৬১,১৮১
২. শামুক	৫,০৪২
৩. অন্যান্য	৯,৯৭৯
গ. উদ্ভিদ	
১. শৈবাল	৬,৫০০
২. ছত্রাক	১৬,৫০০
৩. ব্রায়োফাইটা	২,৮৫০
৪. টেরিডোফাইটা	১,১০০
৫. ব্যক্তবীজী	৬৪
৬. গুপ্তবীজী	১৭,৫০০
ঘ. অন্যান্য	
১. ব্যাকটেরিয়া	৮৫০
২. লাইকেন	২,০০০

সারণি-৩
ভারত ও বিশ্বের প্রজাতি সম্ভার : একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান

শ্রেণী	ভারতে প্রজাতির সংখ্যা (ক)	বিশ্বে প্রজাতির সংখ্যা	সারা পৃথিবীর সাপেক্ষে ভারতে প্রজাতির সংখ্যার শতকরা হিসাব
স্তন্যপায়ী	৩৫০	৪,৬২৯	৭.৬
পাখি	১,২২৪	৯,৭০২	১২.৬
সরীসৃপ	৪০৮	৬,৫৫০	৬.২
উভচর	১৯৭	৪,৫২২	৪.৪
মাছ	২,৫৪৬	২১,৭৩০	১১.৭
সপুষ্পক উদ্ভিদ	১৫,০০০	২,৫০,০০০	৬.০

উৎস : ইন্দিরা গান্ধী কনজারভেশন মনিটারিং সেন্টার, নয়া দিল্লি

যে সমস্ত অঞ্চল ক্রান্তীয় রেখাগুলির কাছাকাছি। ক্রান্তীয় রেখাগুলি থেকে যত মেরু অঞ্চলের দিকে সরে যাওয়া যাবে ততই দেখা যাবে জীববৈচিত্র্যের পরিমাণ কমে আসছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু জীবের বৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। মেরু অঞ্চলের যত কাছে যাওয়া যাবে তত শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবার কারণে জীবের জন্ম ও বৃদ্ধি, উভয়ই ব্যাহত হয়। ঠিক এই কারণেই কোনও উঁচু পাহাড়ের যত উপরের দিকে ওঠা হবে ততই দেখা যাবে গাছপালার সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি বেশি হবার আর-একটি অন্যতম প্রধান কারণ এই অঞ্চলের জলবায়ুর স্থিতিশীলতা তুলনামূলক-ভাবে বেশি হওয়ায়, মানে সারা বছরই আবহাওয়া কম-বেশি একইরকমের হওয়ায়, এই অঞ্চলে জীবেরা সারা বছরই প্রজননক্ষম থাকতে পারে, ফলে এই অঞ্চলে জন্মহারও বেশি হয়। আবার শুধু জীবের জন্ম হলেই তো হয় না, তাদের বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট খাদ্যের জোগান থাকারও প্রয়োজন আছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় গাছপালা ভালো বেড়ে ওঠে বলে এই অঞ্চলে খাদ্যের পর্যাপ্ত জোগানও থাকে। ঠিক এই কারণেই ক্রান্তীয় অঞ্চলের বর্ষারণ্যগুলিতে জীববৈচিত্র্যের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। কঙ্গো অববাহিকার যে বর্ষারণ্য তা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এই অরণ্যটি জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

ক্রান্তীয় অঞ্চল ছাড়া নিরক্ষীয় অঞ্চলেও জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি দেখা যায়, যদিও নিরক্ষীয় রেখার ঠিক উপরের বা খুব কাছের অঞ্চলগুলি অত্যধিক তাপমাত্রার কারণে প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে একটু কঠিন। তবে নিরক্ষীয় রেখা থেকে সামান্য সরে গেলে (উত্তর ও দক্ষিণে ৫ ডিগ্রির মতো) তাপমাত্রার প্রাবল্য কমে আসায় সেখানে প্রাণীজগতেরও প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এইসব অঞ্চলে তাপমাত্রাও যেমন বেশি, তেমনই প্রায় সারা বছরই প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। ফলে এই অঞ্চলগুলিও জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অ্যামাজনের বর্ষারণ্যের সিংহভাগ, জীববৈচিত্র্যে যে অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সেটি এই নিরক্ষীয় অঞ্চলেই অবস্থিত।

দুই ক্রান্তীয় রেখার মধ্যবর্তী যে অংশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, সেই অংশে যে সমস্ত দেশ পড়ে সে সমস্ত দেশকে তাই বিপুল বৈচিত্র্যের দেশ (মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রিজ) বলা হয়। পৃথিবীর ১৭টি বিপুল বৈচিত্র্যের দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। সারা পৃথিবীর মোট স্থলভূমির মাত্র ২.৪ শতাংশের মতো এলাকা ভারতের দখলে, কিন্তু পৃথিবীর মোট প্রজাতি সংখ্যার ৮ শতাংশের বেশি আছে ভারতেই। এখনও পর্যন্ত ভারতের মোট জীব প্রজাতির যে অংশকে চিনে ওঠা গেছে, তার মধ্যে ৪৭,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ৮১,০০০ প্রাণী প্রজাতি। তবে এই হিসাবও সম্পূর্ণ নয়, কেন-না এখনও পর্যন্ত ভারতের মোট ভৌগোলিক এলাকার ৬৫ শতাংশের মতো এলাকার সমীক্ষা করে ওঠা গেছে। এ ছাড়া ভারতের দীর্ঘ উপকূল অঞ্চলে যে সামুদ্রিক জীবসম্পদ, সেগুলিকে বিবেচনার কথাই ভাবা হয়নি।

তবে সারা পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে যেমন জীববৈচিত্র্য সুষমভাবে বণ্টিত হয়নি তেমন হয়নি ভারতেও। জীববৈচিত্র্যের প্রাচুর্যের বিষয়টি মূলত নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। এ কথা মাথায় রেখে সমগ্র ভারতকে দশটি জীব-ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল—১ ট্রান্স-হিমালয়, ২. হিমালয়, ৩. মরুভূমি, ৪. আংশিক শুষ্ক অঞ্চল, ৫. পশ্চিমঘাট, ৬. দাক্ষিণাত্য মালভূমি, ৭. গাঙ্গেয় সমভূমি, ৮. উত্তর-পূর্ব ভারত, ৯. আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ১০. সমুদ্র-উপকূল অঞ্চল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় জীবসম্ভার আছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, হিমালয় অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব ভারত ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ভারতের মোট প্রাণী প্রজাতির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতেই। শুধু পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতেই মোট জীব প্রজাতির সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। আবার হিমালয় অঞ্চলে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। এ ছাড়া ওই অঞ্চলে স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রজাতিই আছে তিনশোরও বেশি।

তবে ভারতের এই বিপুল জীববৈচিত্র্যের আর-একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের মোট জীব প্রজাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশজ, মানে এইসব প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির আদি বাসস্থান ভারত, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভারতের সুনির্দিষ্ট কোনও অঞ্চল, যেখানে সংখ্যায় এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় এবং মনে করা হয় ওই অঞ্চলেই ওই জীব প্রজাতিটির উৎপত্তি। ভারতের জীব-ভৌগোলিক

বিপুল বৈচিত্র্যের দেশ
(Mega diversity countries)

দুই ক্রান্তীয় রেখার (কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত দেশসমূহ, জীববৈচিত্র্যের সম্ভার যে সমস্ত দেশে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কনজারভেশন ইনটারন্যাশনাল নামক একটি মার্কিন সংগঠন পৃথিবীর ১৭টি দেশকে বিপুল বৈচিত্র্যের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল : অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইকুয়েডর, ইন্দোনেশিয়া, কঙ্গো, কলম্বিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাপুয়া নিউ গিনি, পেরু, ফিলিপিন্‌স, ব্রাজিল, ভারত, ভেনেজুয়েলা, মাদাগাস্কার, মালয়েশিয়া ও মেক্সিকো। এই ১৭টি দেশে পৃথিবীর ৭০ শতাংশ প্রজাতির বাস।

হট স্পট (Hot spot)

যে সমস্ত অঞ্চল জীববৈচিত্র্যে, বিশেষত দেশজ জীবসম্পদের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। শব্দটি যার অবদান, সেই বিজ্ঞানী নর্ম্যান মায়ার্সের মতে, কোনও অঞ্চলকে হট স্পট বিবেচনা করা হবে তখনই, যখন অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হবে, অঞ্চলটির ন্যূনতম ০.৫ শতাংশ উদ্ভিদ প্রজাতি হবে দেশজ এবং পরিবেশজনিত অবক্ষয়ের কারণে অঞ্চলটির জীববৈচিত্র্য বিপন্নতার সম্মুখীন হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে ৩৪টি অঞ্চলকে জীববৈচিত্র্যের হট স্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ভারতেই আছে তিনটি।

অঞ্চলগুলির মধ্যে তিনটিকে হট স্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, হিমালয় এবং উত্তর-পূর্ব ভারত। কোনও অঞ্চলকে জীববৈচিত্র্যের হট স্পট বলা হবে তখনই যখন সেটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হবে, অঞ্চলটির ন্যূনতম ০.৫ শতাংশ উদ্ভিদ প্রজাতি হবে দেশজ এবং সেই অঞ্চলের পরিবেশজনিত অবক্ষয়ের কারণে সেখানকার জীববৈচিত্র্য বিপন্নতার সম্মুখীন হয়ে পড়বে। এইসব মাপকাঠির ভিত্তিতে পৃথিবীর মোট ৩৪টি অঞ্চলকে হট স্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে পড়ে ভারতের উপরোক্ত তিনটি অঞ্চল।

হারিয়ে যাচ্ছে ওরা

এই যে বিপুল বৈচিত্র্য পৃথিবী জুড়ে, সেই বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। হিসাব বলছে, প্রতি বছর ২৭,০০০-এর মতো প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। যদিও এত বিপুল সংখ্যায় বিলুপ্তির ঘটনাটি ঘটছে মূলত ক্ষুদ্র জীবের ক্ষেত্রে, বৃহৎ জীবেরাও কিন্তু বাদ যাচ্ছে না। সারা পৃথিবী জুড়ে ৬০,০০০-এর মতো উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ২০০০-এর মতো প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার মুখে।

সারণি-৪
ভারতের দেশজ জীব প্রজাতি
(শতকরা হিসাবে)

প্রজাতির নাম	বিশ্বের মোট প্রজাতির সাপেক্ষে শতকরা কত জন
উদ্ভিদ	৩৩.০
স্তন্যপায়ী	১২.৬
পাখি	৪.৫
সরীসৃপ	৪৫.৮
উভচর	৫৫.৮

এমন নয় যে পৃথিবীর বুক থেকে কোনও কোনও প্রজাতির সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবার ঘটনাটি খুব অস্বাভাবিক। বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এমন ঘটনা ঘটতেই থাকে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে হেরে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে যাবার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্যবার ঘটেছে। আর শুধু একটি বা দুটি প্রজাতি নয়, অল্প সময়ের মধ্যে একই সঙ্গে অসংখ্য জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনাকে গণ-বিলুপ্তি (মাস এক্সটিংশন) বলা হয়। তবে গণ-বিলুপ্তির ঘটনা বাদ দিলে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে প্রজাতি-বিলুপ্তির হারটি ছিল বছরে একটি থেকে পাঁচটি। সেই হারটি কোথায় এসে পৌঁছেছে তা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রজাতি-বিলুপ্তির এই অস্বাভাবিক হারই জন্ম দিয়েছে ষষ্ঠ গণ-বিলুপ্তির। আগের গণ-বিলুপ্তির ঘটনাগুলির সঙ্গে এবারের ঘটনাটির তফাত হচ্ছে এই

গণ-বিলুপ্তি (Mass Extinction)

তুলনামূলকভাবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ভূতাত্ত্বিক সময়কালের মধ্যে বিপুল সংখ্যক প্রজাতির বিলুপ্তি। জীবাশ্মভিত্তিক প্রমাণ অনুযায়ী পৃথিবীতে ইতিপূর্বে পাঁচটি গণ-বিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছে। এই গণ-বিলুপ্তিগুলির কারণ ছিল প্রাকৃতিক। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ও তার প্রভাবে গণ-বিলুপ্তি। কিন্তু আসন্ন ষষ্ঠ গণ-বিলুপ্তিটির কারণ হতে চলেছে মানুষের লোভ ও তার কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপ।

যে, আগে গণ-বিলুপ্তির ঘটনাগুলি ঘটেছে পৃথিবীর পরিবেশের কোনও আপাদমস্তক পরিবর্তনের ফলে, যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে, আর আসন্ন গণ-বিলুপ্তির ঘটনাটি ঘটতে চলেছে মানুষের কৃতকার্যের ফলস্বরূপ, পৃথিবীর পরিবেশজনিত বিপর্যয়ের কারণে। মানুষের কৃতকার্য বলতে তার লোভ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপ।

কেন হারিয়ে যাচ্ছে

প্রথমে প্রয়োজনের তাগিদে, পরে লোভের তাড়নায় মানুষ প্রকৃতিকে, প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করতে শুরু করে। আর এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি জীববৈচিত্র্যের বিনাশ।

মানুষ প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে শুরু করে তার প্রয়োজনের তাগিদে— খাদ্য ও জ্বালানি সংগ্রহের তাগিদে। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রকৃতি নিজেও প্রস্তুত ছিল, কারণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য সেভাবেই রক্ষিত হয়। সমস্যাটা প্রথমে শুরু হল যখন মানুষ গাছের অন্যবিধ ব্যবহার শিখল। গাছ ঘর সাজানোর কাজে লাগে। গাছ কাগজ তৈরিতে কাজে লাগে। গাছের এইসব ব্যবহার শেখার পর থেকেই মানুষ নির্বিচারে গাছ কাটতে শুরু করল। আর গাছ কাটার এই প্রবণতাই মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠল জনসংখ্যার অতি দ্রুত বৃদ্ধি, যাকে জনবিস্ফোরণ বলা হয়ে থাকে, সেই জনবিস্ফোরণ ঘটার পর থেকে। মানুষ আর শুধু একটি-দুটি গাছ নয়, কেটে ফেলতে শুরু করল বনের পর বন।

অরণ্যনিধনকে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের প্রথম ধাপ হিসেবে স্বচ্ছন্দে বর্ণনা করা চলে। অরণ্যনিধন তো আর শুধু উদ্ভিদবৈচিত্র্য ধ্বংস করছে না, অজস্র প্রাণী প্রজাতির স্বাভাবিক আবাসস্থল ধ্বংস করে তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন করে তুলছে। হিসাব বলছে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের পিছনে স্বাভাবিক আবাসস্থল নষ্টের দায়ভাগ ৩৬ শতাংশের মতো।

অরণ্য ধ্বংস যে শুধু মানুষ প্রয়োজনেই করছে তা নয়, লোভেও করছে। প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশ নিয়ে ব্যাবসা আজকাল অত্যন্ত লোভনীয় হয়ে উঠেছে। সেইজন্য হাতির দাঁতের লোভে হাতি শিকার, চামড়ার লোভে বাঘ-হরিণ শিকার নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই নিজস্ব আবাসস্থল হারিয়ে এইসব প্রাণী সংখ্যায় কমে আসছে। তার উপর এই চোরাশিকার তাদের অস্তিত্ব একেবারে বিপন্ন করে তুলছে।

প্রকৃতির কথা ভুলে প্রাকৃতিক সম্পদ-সমূহকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের আর-একটি উদাহরণ বিদেশি জীবপ্রজাতি, বিশেষত উদ্ভিদ প্রজাতিকে নিজের নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে ব্যবহারের চেষ্টা করা। যেমন ইউক্যালিপ্টাস ও জ্যামুরিনা নামক দুটি উদ্ভিদ প্রজাতি একদা ভারতে আমদানি করা হয়েছিল। এই গাছ দুটি অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে ওঠে বলে জ্বালানি কাঠ হিসেবে এদের ব্যবহার করা সুবিধেজনক। কিন্তু এই ধরনের গাছের বিপদ হচ্ছে, এরা আমাদের দেশীয় বাস্তুতন্ত্রকে

এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যাতে দেশীয় প্রজাতিগুলি বিপন্নতার মুখে পড়ে যাচ্ছে।

মানুষের এইসব কীর্তিকলাপ যেমন সরাসরি জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি মানুষের অসংখ্য অন্যরকম সব কার্যকলাপও পরোক্ষে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং (উষ্ণায়ন) যেমন মানুষেরই কৃতকর্মের ফসল। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে পৃথিবী ক্রমশই অস্বাভাবিক রকমের উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এতটাই উত্তপ্ত যে এই পৃথিবী অনেক জীব প্রজাতির কাছেই আর বাসযোগ্য থাকছে না। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে মরুকরণও ঘটে যাচ্ছে কোথাও কোথাও। তার ফলেও স্বাভাবিক আবাস হারাচ্ছে অসংখ্য প্রাণী, উদ্ভিদ।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটা উদাহরণ। মানুষের নানা ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটছে। সেই দূষণ পরোক্ষে থাবা বসাচ্ছে জীববৈচিত্র্যের উপর। উদাহরণ হিসেবে চাষের খেতে ফলন বাড়ানোর জন্য সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কথা বলা যেতে পারে। এইসব সার ও কীটনাশকের যে অবশেষ মাটিতে জমা হয় তা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে যখন নদী ও পুকুরে গিয়ে পড়ে তখন সেই বিষাক্ত জল জলজ বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন বিপন্ন করে তোলে।

মানুষের কার্যকলাপে জীবজগতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি ছাড়া সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণেও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। প্রাকৃতিক কারণ বলতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রবল কোনও বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়ের প্রকোপেও অনেক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কোনও কোনও স্থানীয় প্রজাতি, অথবা হারিয়ে ফেলে তাদের আবাসস্থল। আমাদের সুন্দরবন কীভাবে আয়লায় বিধ্বস্ত হয়েছিল তার স্মৃতি এখনও আবছা হয়নি। সেই বিধ্বংসী ঝড় অনেকটাই বিধ্বস্ত করে দিয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের স্বাভাবিক আবাসস্থল।

উপায়

উপায় বলতে, সংরক্ষণ। সেই মহাপ্রলয় আর নোয়ার নৌকোর কথা মনে আছে? মহাপ্রলয়ে পৃথিবী যাতে প্রজাতিশূন্য হয়ে না পড়ে সেজন্য নোয়া একটি একটি করে তার নৌকোয় জড়ো করেছিলেন প্রতিটি জীব প্রজাতির দুজন করে সদস্যকে। একজন পুরুষ, একজন স্ত্রী। এই কাহিনির বক্তব্য ছিল এটিই—পৃথিবী মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর এক জোড়া সদস্য পুনর্গঠন করবে তাদের প্রজাতিকে।

প্রজাতি সংরক্ষণের এই যে পদ্ধতি, জীববিদ্যায় এটিকে বলা হয় এক্স-সিটু কনজারভেশন বা আবাস-বহির্ভূত সংরক্ষণ। জীব প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য যে পদ্ধতি, সেটিকে বলা হয় ইন-সিটু কনজারভেশন বা আবাস-মধ্য সংরক্ষণ। আবাস-মধ্য সংরক্ষণ প্রণালী, বলাবাহুল্য, যদি প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়, তাহলে আবাস-বহির্ভূত সংরক্ষণ প্রণালীর চেয়ে অনেক ভালো। কোনও বাঘ চিড়িয়াখানায় যত না ভালো থাকবে, সেখানে যত না তার বাড়-বৃদ্ধি হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি হবে কোনও অভয়ারণ্যে। হবে কারণ সেখানে সে তার নিজস্ব পরিবেশে, অন্যান্য পশুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বেড়ে উঠতে পারবে। এতে সেই বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্যও সুরক্ষিত থাকবে। আবাস-মধ্য প্রণালীতে কোনও বিশেষ প্রাণীকে সংরক্ষণের উদ্যোগও যেমন নেওয়া হয় তেমনই কখনো-কখনো গোটা একটি বাস্তুতন্ত্রকে সংরক্ষণের উদ্যোগও নেওয়া হয়। এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়। সংরক্ষণের মাত্রাটি সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না। সংরক্ষণের মাত্রা অনুযায়ী সংরক্ষিত অঞ্চলটির নামও বদলে যায়। ভারতে এমন সব বিভিন্ন সংরক্ষিত অঞ্চলগুলি হল সংরক্ষিত অরণ্য (রিজার্ভড ফরেস্ট), অভয়ারণ্য (স্যাংচুয়ারি) ও জাতীয় উদ্যান (ন্যাশানল পার্ক)। এইসব অঞ্চল হয় রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ ছাড়া ইউনেস্কোর 'ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ' কর্মসূচির অধীনে ১৪টি সংরক্ষিত জীবমণ্ডল (বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ)-ও গঠন করা হয়েছে।

আবাস-বহির্ভূত সংরক্ষণের কথা বললে প্রথমেই বলতে হয় চিড়িয়াখানা, অ্যাকোয়ারিয়াম ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা। প্রাথমিকভাবে এইগুলি মানুষের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হলেও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এগুলির ভূমিকা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। পৃথিবীব্যাপী ১,৫০০টির মতো বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রায় ৮০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হয়। কোনও প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়লে এই উদ্ভিদ-উদ্যানগুলি তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য চিড়িয়াখানা ও অ্যাকোয়ারিয়ামগুলির ক্ষেত্রে। পৃথিবীর প্রায় ৮০০ চিড়িয়াখানায় প্রায় ৩,০০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ ও উভচর সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্ক-এর মতো কোনও কোনও চিড়িয়াখানায় ইতিমধ্যেই বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৃথিবীজোড়া অ্যাকোয়ারিয়ামগুলিতে ধরা আছে ৬,০০০ প্রজাতির মাছ।

তবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইদানীং যেটার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে জিন সংরক্ষণ। এমন নয় যে জিন সংরক্ষণের বিষয়টি আগে ছিল না। ছিল, তবে সেক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হত নতুন কোনও প্রজাতির বাণিজ্য শস্যের বীজ ও গবাদিপশুর জিন সংরক্ষণের উপর। এখন জিন ব্যাংক, বীজ ব্যাংক স্থাপন করে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির জিন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জিন বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত কৌশলেরও ইদানীং অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন পদ্ধতিতে ভ্রূণ, বীজ, স্পার্ম ও ওভাম সংরক্ষণের মাধ্যমে জিন বৈচিত্র্যকে সংরক্ষিত করা হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। সেই বিলুপ্তি প্রতিরোধে সংরক্ষণ হচ্ছে, সংরক্ষণ পদ্ধতি উন্নত হচ্ছে, সব কথাই ঠিক। বেঠিক যেটি, সেটি হল সংরক্ষণ এই বিলুপ্তি প্রতিরোধের একমাত্র পথ নয়। মানুষের কৃতকর্মে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সেই দূষণের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে উদ্ভিদ, প্রাণীর দল। তাহলে সংরক্ষণ করেই বা লাভ কী? দূষিত পরিবেশে নতুন করে তাদের প্রজাতি বৃদ্ধির চেষ্টা করেও তো লাভ নেই, কারণ পুনর্বিলুপ্তিই যেখানে হয়ে উঠবে একমাত্র নিয়তি। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে গেলে যেটা দরকার সেটা হল পরিবেশের দূষণ কমানো। তাতে বর্তমান রক্ষা পাবে, ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত থাকবে। ❑

[লেখক আরামবাগ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।]

সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি ও জননীতি

ভয়াবহ খাদ্য সংকটের হাত থেকে ছয়ের দশকের সবুজ বিপ্লব কীভাবে ভারতকে বাঁচিয়েছিল, উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি, জননীতি ও কৃষকদের উৎসাহের ত্রিবেণিসংগমে কীভাবে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল, তার ইতিহাস ধরা আছে এই লেখায়। শুধু তাই নয়, সেই সময়ের বিভিন্ন নীতির বর্তমান অপব্যবহারের নিদর্শন সামনে এনে, **ড. টি এন শ্রীনিবাসন** *ও* **পবন কাটকর** *এক্ষেত্রে সংস্কারসাধনের গুরুত্বও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন বর্তমান নিবন্ধে।*

ছয়ের দশকে কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে ভারতে সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এক দশকের মধ্যে এর সুফল ভোগ করেছিলেন লক্ষ লক্ষ কৃষক। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এটি। এই সাফল্য উদ্‌যাপনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 'গম বিপ্লব' শীর্ষক একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিলেন। সবুজ বিপ্লবের স্থপতি ড. এম এস স্বামীনাথনের ভাষায়, "বৈজ্ঞানিক ও জনমুখী প্রয়াস, আন্তঃবিষয়ক গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয়ে ছয়ের দশকে সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়িত হয়েছিল। নিশ্চিত লাভদায়ক বাজারের সুযোগ ছিল উচ্চ উৎপাদনশীলতার জন্য কৃষকদের আগ্রহের চাবিকাঠি। সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে গমের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছিল। ভারত সক্ষম হয়েছিল প্রযুক্তি, পরিষেবা ও জনমুখী নীতির সফল সমন্বয়ে (স্বামীনাথন, ২০১৩)।"

প্রায় পাঁচ দশক আগে, উচ্চফলনশীল সম্ভারভিত্তিক নতুন কৃষিকৌশল গৃহীত হওয়ার ঠিক পরেই যোজনার ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছিলেন বি এস মিনহাস এবং টি এন শ্রীনিবাসন। সেই সময়ে যোজনার সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় এইচ ওয়াই সারদা, বন্ধুরা যাঁকে ভালোবেসে শৌরি বলে ডাকতেন। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর তথ্য উপদেষ্টা হয়েছিলেন।

সবুজ বিপ্লবের কারণগুলি

প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে প্রতি একক জমিতে শস্যের ফলন অনেক বেড়ে গেল। ফলে ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষিজ উৎপাদন সর্বাধিক পর্যায়ে পৌঁছাল। প্রথাগত বীজের বদলে উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, জলসেচের সুবিধার কারণে এই বর্ধিত উৎপাদন। এর জেরে এড়ানো সম্ভব হল খাদ্য সংকট।

পরিমিত কৃষিজ উৎপাদন এবং খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা

আমদানি করা খাদ্যশস্যকে ধরেও ভারতে দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৯৫ গ্রাম। বাজার নয়, কৃষকরা মূলত নিজেদের পরিবারের খোরাকির জন্য চাষ করতেন। অপ্রতুল সেচব্যবস্থা এবং অনিশ্চিত বৃষ্টির ওপর নির্ভর করত ফলন। সরকার ভারী শিল্পের ওপর জোর দিয়ে শিল্পায়নের দিকে নজর দেওয়ায় কৃষিক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে অবহেলিতই থেকে যায়। মৃত্যুর হার ক্রমশ কমে আসা এবং জন্মের হার বাড়তে থাকায় বেড়ে চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশহার তার থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৯৫৯ সালে ফোর্ড ফাউন্ডেশন ভারতকে খাদ্যের সম্ভাব্য সংকট নিয়ে সতর্ক করে।

ভারতের কৃষিপণ্যের ফলন বাড়ানোর ক্ষমতা সীমিত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। 'গ্রো মোর ফুড' (GMF) প্রচারাভিযান লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হয়। প্রথাগত প্রাচীন কৃষি-পদ্ধতি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার প্রায় না থাকা, বাজারের কথা না ভেবে শুধু নিজেদের প্রয়োজনে উৎপাদন ভারতের ক্ষমতাকে আরও খর্ব করে। সেচের জন্য ব্যক্তিগত টিউবওয়েল প্রায় ছিলই না, সরকারি সেচ প্রকল্পের রূপায়ণের গতিও ছিল অত্যন্ত মন্থর। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সেভাবে না হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে শক্তির চাহিদা মেটানো হত পশু ও শ্রমিকদের দিয়ে। ১৯৬০-৬১ সালে দেশে গমের উৎপাদন ছিল হেক্টরপিছু ৮৫১ কেজি, ধানের ১০১৩ কেজি। ২০১১-১২ সালে এই উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ৩১৭৭ কেজি এবং ২৩৯৩ কেজিতে পৌঁছেছে (DES, 2013)।

খাদ্যশস্য আমদানিতে বাধা

দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব না হলে বিকল্প পথ হল অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করা। রিজার্ভ ব্যাংক ২০১৪ সালে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ৯১১ কোটি টাকা। ১৯৬৪-৬৫ সালে তা ১১৬ কোটি টাকার সর্বকালীন তলানিতে এসে ঠেকে। মুদ্রা বিনিময় হারের উচ্চ মূল্যায়ন এবং রপ্তানি স্থিতিস্থাপকতা সংক্রান্ত নিরুৎসাহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

ক্ষেত্রে ভারতকে আরও দুর্বল করে দেয়। ফলত, বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শান্তির জন্য খাদ্য' বা পি.এল. ৪৮০ কর্মসূচির আওতায় ভারত সেদেশ থেকে সহজ শর্তে খাদ্যশস্য আমদানি করতে পারত। কিছুটা সাহায্য হিসেবে পাওয়া যেত, কিছুটার মূল্য আবার টাকায় চোকানো যেত। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করে। মার্কিন কংগ্রেস ভারতকে সহায়তা দেবার পক্ষে হলেও তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন, ভারতের যুদ্ধবিরোধী অবস্থানে ক্ষুব্ধ হয়ে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭, পরপর দু-বছরের খরা ভারতকে আরও বিপাকে ফেলে দেয়। লেনদেন ঘাটতি বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছালে ১৯৬৬ সালের মার্চে ভারত বাধ্য হয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে। দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রত্যাশিতভাবে টাকার অবমূল্যায়ন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করাকে তাদের সহায়তার শর্ত হিসেবে আরোপ করে।

দেশীয় রাজনীতি

দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সবুজ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট প্রস্তুতিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাংকের চাপে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটান। কিন্তু এই পদক্ষেপ রপ্তানি বাড়াতে বা বিনিয়োগ আকর্ষণে ততটা কার্যকর হতে পারেনি। পি.এল. ৪৮০ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে প্রভূত রাজনৈতিক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। খাদ্যশস্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমাতে সরকার দেশীয় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেয়। কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী সি সুব্রমনিয়ামের উদ্যোগে গৃহীত হয় কৃষি উন্নয়নের নতুন কৌশল।

কৃষি গবেষণা

সুব্রমনিয়াম দেশের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে ড. এম এস স্বামীনাথন, ড. নর্ম্যান বোরলগ সহ বিভিন্ন কৃষিবিজ্ঞানী, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থনীতিবিদ, রকফেলার ফাউন্ডেশন এবং মার্কিন কৃষি দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেন। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে তিনি নব উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বীজের ওপর নির্ভর করেন। এর গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ মেক্সিকোতে করে আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) এবং ফিলিপিন্সে আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা কেন্দ্র (IRRI)। ভারতে এর দায়িত্ব নেয় ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR)।

উচ্চফলনের প্রযুক্তি : পরীক্ষাগার থেকে কৃষকের জমিতে

সবুজ বিপ্লব কেন হয়েছিল, সেই আলোচনা থেকে এবার আসা যাক কীভাবে তা হল, সেই প্রশ্নে। দেখা গেল, যে কোনও আয়তনের জমিতেই উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া সম্ভব। সঠিক পরিমাণে সার, কীটনাশক ও পর্যাপ্ত জলসেচের ফলে উৎপাদন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, প্রতি হেক্টর জমিতে আয় সর্বাধিক হয়। এজন্যই উচ্চফলনশীল বীজকে 'আশ্চর্য বীজ' বলা হয়।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেবলমাত্র পরীক্ষামূলকভাবে আশ্চর্য বীজের ব্যবহার হত। পরবর্তীকালে কৃষিবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে কৃষিজমিতে এর প্রয়োগ হয়েছে।

উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

গম ও ধানের উচ্চফলনশীল প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হল তাদের খর্বাকার, যা পরোক্ষভাবে প্রতি হেক্টরে উচ্চতর ফলনের পথ প্রশস্ত করে। ফসলের দৈর্ঘ্য বেশি হলে বাতাস, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতিতে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কাও বাড়ে।

খর্বকায় প্রজাতির ফসল ও উচ্চ উৎপাদনশীলতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের খর্বকায় গমের একটি প্রজাতি (নেরিন ১০) এক বিজ্ঞানী আমেরিকায় নিয়ে যান। মার্কিন কৃষি দপ্তরে গমের অপর একটি প্রজাতির (ব্রেভর) সঙ্গে তার সংকরায়ণ ঘটানো হয়। পরে সেটিকে মেক্সিকোতে নিয়ে গিয়ে ড. নরম্যান বোরলগ আরও এক দফা সংকরায়ণ ঘটান।

পাঁচের দশকের গোড়ায় জাপানি ধানের একটি প্রজাতির (জ্যাপোনিকা) সঙ্গে দেশীয় প্রজাতির (ইন্ডিকা) ধানের সংকরায়ণ ঘটায় কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (CRRI)। এতে খুব বেশি সাফল্য মেলেনি। ১৯৬১ সালে বিভিন্ন আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন, উচ্চফলনশীল ধানের প্রজাতি উৎপাদন করে ফিলিপিন্সের আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা কেন্দ্র (IRRI)। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে এমন আরও একটি প্রজাতি আই আর ৮ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতীয় জলহাওয়ায় এগুলি চাষ করা কি সম্ভব? একটা কথা মানতেই হবে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা না থাকলে ভারতের পক্ষে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার সম্ভব হত না।

ভারতীয় জলহাওয়ায় উচ্চফলনশীল সম্ভার : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৬১ সালে এম এস স্বামীনাথনের পরামর্শে ভারত সরকার নরম্যান বোরলগকে আমন্ত্রণ জানান। আন্তর্জাতিক মহলে সমাদৃত উচ্চফলনশীল গম কীভাবে ভারতীয় পরিবেশে উৎপাদন করা যায়, সে বিষয়ে তাঁর মতামত চান সরকার। দু-বছর পর ১৯৬৩ সালের মার্চে বোরলগ ভারতে আসেন। স্বামীনাথন, বোরলগ ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে ভারতীয় গম উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখে পরিস্থিতির সমীক্ষা করেন। বোরলগ মেক্সিকোয় উৎপাদিত সোনোরা ৬৩, সোনোরা ৬৪, মেয়ো ৬৪ ও লের্মা রোজো ৬৪-এ এদেশে উৎপাদনের সুপারিশ করেন। পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই এগুলির চাষে ভালো ফল মেলে। রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে এবং মেক্সিকো কৃষিমন্ত্রকের সহযোগিতায় ভারত পাঁচটি প্রজাতির গমের পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। এগুলি হল—লের্মা রোজো ৬৪-এ, সোনোরা ৬৩, সোনোরা ৬৪, মেয়ো ৬৪ এবং এস২২৭ ও ২২০। ১৯৬৪ সালের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়, লের্মা রোজো ৬৪-এ, সোনোরা ৬৪ এবং পিভি ১৮ ভারতে উৎপাদনের উপযুক্ত।

উচ্চফলনশীল ফসলের উৎপাদনে কিছু রাজনীতি

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় সমর্থনে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী সি সুব্রমনিয়াম ১৯৬৬ সালে লের্মা রোজো ৬৪-এ এবং সোনোরা ৬৪-এর প্রায় ১৮০০০ টন বীজ আমদানি করেন। দেশের ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই বীজ বপন করা হয়। এক বছরের মধ্যেই মিলল ফল। ১৯৬৬-৬৭ সালের ১ কোটি ১৩ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৬৭-৬৮ সালে গমের উৎপাদন হল ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টন। তবে নতুন এই উৎপাদন নিয়ে ভোগকারী ও কৃষকদের মধ্যে একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। নতুন লাল গমের থেকে প্রথাগত সাদা গম তাঁদের বেশি পছন্দের। নতুন প্রজাতির ধানও সাধারণ মানুষ বিশেষ পছন্দ করেননি।

জননীতিজনিত হস্তক্ষেপ

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারত উচ্চফলনশীল সম্ভারের সুবিধা সম্পূর্ণভাবে নেবার মতো জায়গায় ছিল না। প্রথমত, দেশের কৃষিকাজ অত্যধিক মাত্রায় বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে মোট কৃষিজমির মাত্র ১৮.৩ শতাংশ সেচসেবিত ছিল। ১৯৬৪-৬৫-তে এই হার বেড়ে হয় ১৯.৩ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, রাসায়নিক সার দেশে উৎপাদন বা বিদেশ থেকে আমদানির আর্থিক ক্ষমতা ছিল সীমিত। কিন্তু নীতিপ্রণেতারা বুঝেছিলেন, উচ্চফলনশীল বীজের সঙ্গে সার ও সেচের জোগান সুনিশ্চিত করতে পারলে শস্যের ফলন সর্বাধিক হবে। সেজন্য এই লক্ষ্যে সরকারি প্রয়াস শুরু হল। দেখা গেল, ভারতীয় কৃষি মূলত ব্যক্তি-উদ্যোগনির্ভর। লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের অধিকাংশের মালিকানাধীন জমির আয়তন এক হেক্টরেরও কম। উচ্চফলনশীল সম্ভার কৃষকরা যাতে ব্যবহার করেন, সেজন্য তাঁদের যথাযথ সহায়তা ও উৎসাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কী ধরনের উৎসাহ দেওয়া হবে, তা নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট কৃষক উৎপাদনের উপাদান হিসেবে কী কী বেছে নিচ্ছেন তার ওপর। এই উপাদানগুলি সময়মতো কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাও জরুরি।

স্বামীনাথন বলেছেন, "প্রযুক্তি, জননীতি এবং কৃষকদের উৎসাহের পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমেই সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হতে পেরেছিল।" সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাড়াতে তার ওপর সরকারি ভরতুকি, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ডিজেলের ওপর ভরতুকি, ঋণের সুবিধা, কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণে সরকারি বিনিয়োগের মতো একগুচ্ছ ব্যবস্থা এই সময়ে নেওয়া হয়।

দেশে রাসায়নিক সারের উৎপাদন বাড়াতে উৎপাদকদের ভরতুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাড়ানো হয় সারের আমদানিও। একজন কৃষক যাতে তাঁর কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ন্যায্য মূল্যে পান, সেদিকে বিশেষ জোর দেয় সরকার। শুধু তো উৎপাদনের উপাদানমূল্যই নয়, কৃষকদের উপার্জন নির্ভর করে ফসলের বাজারমূল্যের ওপরেও। তাই নীতিপ্রণেতারা বিভিন্ন খাদ্যশস্যের ন্যূনতম মূল্যও বেঁধে দেন।

উচ্চফলনশীল বীজ কর্মসূচি

কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন কৌশলের আওতায় ১৯৬৬-৬৭ সালে উচ্চফলনশীল বীজ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালের গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত এক সম্মেলনে সুপারিশ করা হয়—

(i) এই কর্মসূচির আওতায় যেসব এলাকাকে আনা হবে, সেগুলিতে যাতে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক সুযোগসুবিধা থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রগাঢ় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (IADP) এবং প্রগাঢ় কৃষি এলাকা কর্মসূচির (IAAP) আওতায় থাকা অঞ্চলগুলিকে বেছে নেওয়াই শ্রেয়।

(ii) নির্বাচিত অঞ্চলের অন্তত ৮০ শতাংশ এলাকায় জলসেচের সুবিধা থাকতে হবে।

(iii) IADP ও IAAP-র আওতায় নেই, এমন কোনও এলাকাও নির্বাচন করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার একটা বড় অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেখানে গম চাষের চল থাকবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

ভারতীয় কৃষির প্রেক্ষাপটে নতুন প্রযুক্তির জটিলতার বিস্তৃতির সাপেক্ষে ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সরকার এজন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে (ব্যাস, ১৯৭৫)। জাতীয় বীজ নিগম গঠন করে কৃষকদের কাছে বীজ পৌঁছে দেবার জন্য প্রতি ব্লকে কেন্দ্র খোলা হয়।

সার সরবরাহে কৃষক সমবায়

কৃষকদের কাছে সার, ঋণ প্রভৃতি পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সমবায়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রামস্তরের সমবায়গুলি তাদের চাহিদা জেলা সমবায় সংস্থাগুলিকে জানায়। জেলা সমবায় সংস্থা এগুলি একত্রিত করে পাঠিয়ে দেয় রাজ্য সমবায় বিপণন ফেডারেশনের কাছে। চাহিদামতো সেইসব উপাদান সরবরাহ করা হয়। প্রক্রিয়াটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকেন কৃষি দপ্তরের সচিব।

ঋণ প্রদান

কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের দায়িত্বও সমবায় সংস্থাগুলির ওপর ন্যস্ত। এক্ষেত্রে জেলা সমবায় ব্যাংকগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। গ্রামস্তরের সমবায়গুলি ঋণের চাহিদা একত্রিত করে জেলা সমবায় ব্যাংকে পাঠায়। জেলা সমবায় ব্যাংক রাজ্য সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদন পাঠায় রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে। অনুমোদিত ঋণ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ফসলের বিপণন

কেন্দ্রীয় স্তরে খাদ্যশস্যের সুশৃঙ্খল বিপণনের ভার নিয়েছে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। ভারতীয় খাদ্য নিগম কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে রাজ্য সরকারগুলিকে দেয়। গণবণ্টন ব্যবস্থায় রেশন দোকানের মাধ্যমে রাজ্য এই খাদ্যশস্য স্বল্প

মূল্যে বিক্রি করে। কত দামে ভারতীয় খাদ্য নিগম কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনবে, তার সুপারিশের জন্য কৃষি মূল্য কমিশন (APC) স্থাপন করা হয়েছে। বাজারের চাহিদা-জোগানের ভারসাম্যের দিকে দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি কৃষকরা যাতে বঞ্চিত না হন, সেদিকে নজর দিয়ে সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা হয়।

কৃষি গবেষণা

কৃষি গবেষণার কারিগরি ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্যের ওপর ৩৫টি সুসমন্বিত গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। নানা রাজ্যে গড়ে তোলা হয় নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আগে থেকেই রয়েছে, তাদের অর্থবরাদ্দ বাড়িয়ে গবেষণার সুযোগসুবিধা আরও উন্নত করা হয়। ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র-কে আরও ক্ষমতা দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে কৃষি সংক্রান্ত গবেষণার ওপর নজর রাখার ভার তার ওপর ন্যস্ত করা হয়। "নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞানী ও কৃষকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে থাকে। কৃষকরা ট্র্যাক্টরের মাধ্যমে চাষ, টিউবওয়েল সেচব্যবস্থা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে থাকেন। ১৯৬৫-৬৬ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১২ বছরে প্রায় তিন গুণ বাড়ে। গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল সবথেকে চিত্তাকর্ষক।"

দেশীয় ক্ষেত্রে সারের সরবরাহ বৃদ্ধি

কৃষকদের কাছে সস্তায় যথোপযুক্ত পরিমাণে সার পৌঁছে দেবার ওপর উচ্চফলনশীল বীজ কর্মসূচির সাফল্য নির্ভরশীল। এজন্য দেশীয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ

ষাটের দশকে যখন বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করা হত, তখনই সি সুব্রমনিয়াম ভারতীয় সার শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত নতুন নীতি ঘোষণা করেছিলেন। ভারতের বিনিয়োগ পরিবেশ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় বিদেশি উৎপাদকরা চাইছিলেন, নিজেদের দেশে উৎপাদন করে ভারতে রপ্তানি করতে। অন্য দিকে ভারত চাইছিল, বিদেশিরা ভারতে উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলুন, যা ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হবে। দেশের শিল্পপতিদেরও সরকার সিমেন্ট ও সার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহ দিচ্ছিল।

বিদেশি লগ্নি টানার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল না হওয়ায় সরকার নিজেই বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে। দেশীয় বেসরকারি ক্ষেত্রকেও কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় এই বিনিয়োগ কম হওয়ায় ভারতকে সার আমদানি করে যেতেই হয়।

দেশীয় উৎপাদনে অর্থনৈতিক উৎসাহ

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া। এর সঙ্গে সালফিউরিক, নাইট্রিক, ফসফরিক অ্যাসিড মিলিয়ে সৃষ্টি করা হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম ফসফেট প্রভৃতি সার। নাইট্রোজেন পাওয়া যায় বাতাস থেকে। হাইড্রোজেন সৃষ্টির বহু পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল বিদ্যুৎ ও ন্যাপথা জ্বালানি বা কয়লার সাহায্যে জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ। এদের বলা হয় ফীড স্টক। কয়লা ও বিদ্যুৎ ছাড়া অধিকাংশ ফীড স্টক-ই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এর খরচ ও সরবরাহ বিভিন্ন সময়ে ওঠানামা করে।

সারের বিপুল চাহিদার জন্য উৎপাদন ক্ষমতার সবটাই কাজে লাগাতে হয়। উৎপাদনকে আর্থিকভাবে বাস্তবোচিত করে তুলতে ১৯৭৭ সালে সার মূল্য কমিটির সুপারিশ মতো সরকার Retention Price Scheme—RPS-এর সূচনা করে। এর সংস্থান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হয় খরচ ও করের উপর ১২% লাভ ধরে। কৃষকদের কাছে সার, প্রভূত ভরতুকিতে বিক্রি করা হয়। সরকার নির্ধারিত মূল্য এবং কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান সরকার দিয়ে দেয়। এইভাবে সারের উৎপাদক ও ভোগকারী, উভয়ের স্বার্থই সুরক্ষিত থাকে। সার্বিকভাবে দাম কম থাকায় কৃষকরা বেশি করে সার কেনেন, বিক্রি বেশি হওয়ায় উৎপাদকরা উৎপাদনে উৎসাহিত হন, বিনিয়োগকারীরাও সার ক্ষেত্রে নিশ্চিত আয়ের আশায় লগ্নিতে এগিয়ে আসেন। সার উৎপাদন ও ভোগে এই উৎসাহ দান সবুজ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট প্রস্তুতিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

তবে এই প্রকল্প কেবলমাত্র ইউরিয়ার মতো নাইট্রোজেনভিত্তিক সারের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়েছে। ফসফরাসভিত্তিক সারের ৯০% এবং পটাশিয়ামভিত্তিক সার পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সারের প্রয়োগ ক্রমশই বেড়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে প্রতি হেক্টর কৃষিজমিতে গড়ে ১৩ কেজি সার ব্যবহার করা হত। ১৯৮০-৮১-তে তা বেড়ে হয়েছে ৩১ কেজি। এই হার দ্রুতগতিতে আরও বাড়ছে।

সেচ পরিষেবার বিস্তার

বীজ ও সার ছাড়া উচ্চফলনশীল চাষের অন্যতম শর্ত হল বৃষ্টির জল ও কৃত্রিম জলসেচ। এক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে জল বেশি লাগে না, তবে জলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় জল না পেলে ব্যাহত হয় শস্যের ফলন। ক্যাসম্যান ও গ্রাসসিনির ভাষায়, "সেচসেবিত জমির পরিমাণ বাড়াতে যথাযথ বিনিয়োগ এবং বর্তমান সেচ পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট মনোযোগী না হলে সবুজ বিপ্লবের চিন্তা করা অসম্ভব।"

সেচব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন

ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত ভারতের সেচ নীতি ছিল সুরক্ষামুখী। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, নদীর জল বা জলাধারের জলকে বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে যত বেশি সংখ্যক কৃষকের কাছে সম্ভব পৌঁছে দেওয়া, যাতে অনাবৃষ্টির সময়ে তাঁদের শস্য নষ্ট না হয়ে যায়। অর্থাৎ, এই নীতির অভিমুখ, সামাজিক আয় সর্বাধিক করার থেকেও সামাজিক ঝুঁকি সর্বনিম্ন করার দিকে ছিল।

ক্রমশ কৃষকরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আখের মতো বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের দিকে ঝুঁকলেন। প্রথাগত শস্যের বদলে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে আয়ের হাতছানি বেশি ছিল। এই প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করতে এর ওপর সেস ও কর বসানো হল, যদিও কৃষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ফাঁকি দিতেন।

উচ্চফলনশীল বীজ কর্মসূচির রূপায়ণে সেচ নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। শুধু সুরক্ষা নয়, জলসেচকে ব্যবহার করার দরকার হল সামাজিক ও ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে। প্রয়োজন দেখা দিল সেচ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের।

দুটি স্তরে এই পরিবর্তন হল। সরকারি স্তরে খাল সংস্কার করে জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিপুল বিনিয়োগ করা হল। কৃষকদের ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের জল ব্যবহারে টিউবওয়েল বসানোর জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ এল। ঋণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ভরতুকি মূল্যে ডিজেল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল। এর জেরে মোট সেচসেবিত জমির পরিমাণ ১৯৭০-৭১-এর ৩ কোটি ৮২ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ২০১০-১১ সালে ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছেছে। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বহুফসলী উৎপাদন শুরু হয়েছে, বেড়েছে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭০-৭১-এর ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২০১২-১৩ সালে হয়েছে ২৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টনেরও বেশি।

ব্যয় পুনরুদ্ধার

সেচসেবিত জমি বাড়ার পিছনে মূল কারণ হল বিদ্যুৎ, ডিজেল ও খালের জল ব্যবহারের জন্য সরকারের কম মূল্য নেওয়া। ষাটের দশকের গোড়া থেকে সরকার ব্যয় পুনরুদ্ধারের কথা ভাবতে শুরু করে। পরিকল্পনা কমিশন জানায়, সুবিধা-ব্যয় অনুপাত ১.৫ : ১ হলে তবেই কোনও সেচ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সুবিধা বলতে এই প্রকল্পের ফলে বর্ধিত ফসলের আর্থিক মূল্যকে বোঝাচ্ছে। ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে প্রকল্প চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, ১০% হারে মূলধনের ওপর সুদ এবং অবচয় (সেচ কমিশন, ১৯৭২)।

এই অনুপাত কঠোরভাবে মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ রয়েছে। সেচের জলের মূল্য স্থির করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির। এক্ষেত্রে যে ধরনের কম মূল্য ধার্য করা হয়েছে তাতে বোঝা যায়, সামাজিক ব্যয় ও সুবিধার থেকেও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি উচ্চফলনশীল বীজ কর্মসূচি এবং কৃষি উন্নয়নের নতুন কৌশল গ্রহণের পর বেসরকারি টিউবওয়েল স্থাপন বহুগুণে বেড়ে যায়। ১৯৬৫ সালে ভারতে বেসরকারি টিউবওয়েলের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০। ১৯৬৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৩,৬০,০০০ এবং ১৯৭৪ সালে ১১,৮৪,০০০। এই বিপুল সংখ্যাধিক্যের পিছনে টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, ডিজেল ও বিদ্যুতে ভরতুকিরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

কৃষিজ মূল্য নীতি

১৯৬৫ সালে গৃহীত নতুন কৃষি সংক্রান্ত কৌশলে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য নতুন উচ্চফলনশীল প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণের পাশাপাশি কৃষকদের এই প্রক্রিয়া ব্যবহারে উৎসাহ জোগানো হয়। এই উৎসাহের একটি অঙ্গ হল ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বেঁধে দেওয়া। এই দামে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কিনে নেয়। বেশি ফলনের ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের দাম কমে গেলে এই পদ্ধতি কৃষকের বিমার মতো কাজ করে।

কৃষিজ পণ্য কমিশন-এর নাম বদলে ১৯৮০ সালে হয় কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্টস অ্যান্ড প্রাইসেস। উৎপাদক, উপভোক্তা, সমাজ ও অর্থনীতির স্বার্থরক্ষা করে ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ দেয় এই সংস্থা।

APC তিন ধরনের মূল্যের সুপারিশ করেছিল। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, সংগ্রহ মূল্য এবং সরবরাহ মূল্য। প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে, বাজারদর পড়ে গেলে কৃষকদের সুরক্ষা দেয়। সাধারণত এই দাম গড় বাজারমূল্যের নীচে রাখা হয়। দ্বিতীয় মূল্যটি সরকারকে গণবণ্টন ব্যবস্থার জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য। এটি ন্যূনতম মূল্যের ওপরে এবং প্রত্যাশিত বাজারদরের নীচে থাকে। তৃতীয় দামটিতে সরকার গণবণ্টন ব্যবস্থায় রেশন দোকানের মাধ্যমে উপভোক্তাদের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রি করে। সংগ্রহ মূল্যের সঙ্গে পরিবহণ ও মজুত ব্যয় যোগ করে যে মূল্য দাঁড়ায়, সরবরাহ মূল্য তার থেকে কম রাখা হয়। দরিদ্র মানুষের জন্য এক্ষেত্রে ভরতুকির পরিমাণ অনেক বেশি হয়। দুর্ভাগ্যবশত কৃষক লবির চাপে এখন সহায়ক ও সংগ্রহ মূল্যের ব্যবধান ঘুচে গেছে। ফসল সংগ্রহের ঊর্ধ্বসীমাও তুলে দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা যত দিতে পারবে, তত পরিমাণ খাদ্যশস্যই সরকার এখন সহায়ক মূল্যে কিনে নিতে প্রস্তুত। এ ছাড়া লবির চাপে সহায়ক মূল্যও প্রতি বছর বাড়ানো হচ্ছে।

সমস্যাসমূহ

মূল্য সংক্রান্ত সহায়তা, উপাদানে ভরতুকি এবং ফসলের জন্য নিশ্চিত ক্রেতা, সবুজ বিপ্লবের সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় জোরটা ছিল স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর। দীর্ঘমেয়াদে এই ধারাকে কীভাবে অব্যাহত রাখা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা বিশেষ হয়নি। উৎপাদনের উপাদানের দক্ষ ব্যবহার নিয়ে মাথা ঘামাননি কেউ। বিপুল ভরতুকি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ওপর যে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে, তা নিয়েও কোনও কথা হয়নি।

সার নীতি

লক্ষ লক্ষ কৃষক খুব দ্রুত উচ্চফলনশীল বীজ কৃষি পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে নাইট্রোজেনঘটিত সারগুলিতে দেওয়া ভরতুকি অন্যান্য সারের অনুপাতের সাপেক্ষে প্রভূত অসাম্যের সৃষ্টি করেছিল। জমির অবস্থা এবং পরবর্তীকালে উৎপাদনশীলতার ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল। সারের প্রয়োগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কমতে থাকে। ১৯৯২-৯৭ সময়কালে প্রতি কেজি সারে সাড়ে সাত

কেজি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হত। ১৯৯৭-৯৯ সময়কালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়ায় ৭ কেজিতে, ১৯৯৯-২০০০ সালে আরও কমে সাড়ে ছয় কেজিতে।

দীর্ঘদিন ধরে ভরতুকি পেয়ে আসায় সার উৎপাদনে অদক্ষ সংস্থাগুলিও তাদের উৎপাদন ব্যয় নির্বিশেষে না লাভ-না ক্ষতির জায়গায় পৌঁছে যায়। সার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর জ্বালানি লাগে। তাই জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক গ্যাস, ন্যাপথা, জ্বালানি তেল, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানির উপাদান হিসেবে কাজে লাগানো হয়। ইউরিয়া উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার হলে তা একদিকে যেমন ব্যয়সাশ্রয়ী হয়, তেমনি পরিবেশের দূষণও কম করে।

সরকার সব ন্যাপথাভিত্তিক সার কারখানাকে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। এই কাজ সম্পন্ন না হলে জুনের পর থেকে এই কারখানাগুলিকে আর ভরতুকি দেওয়া হবে না বলে সরকার জানিয়ে দেয়।

বিভিন্ন সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে সার শিল্পে ভরতুকি পরিমাণ বেড়েই চলে। বিপুল পরিমাণ এই ভরতুকি ক্রমশই ভারতীয় অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ভরতুকির পরিমাণ কমালে তা রাজকোষের পক্ষে স্বস্তিদায়ক হবে ঠিকই, কিন্তু তাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ওপর প্রভাব পড়ারও আশঙ্কা থেকে যায়। ভরতুকি কমালে সারের দাম বাড়বে। সেক্ষেত্রে কৃষকরা সারের ব্যবহার কমাতে, এমনকি বন্ধ করে দিতেও পারেন। তাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমবে।

সার ক্ষেত্রে সংস্কার এবং সারের মূল্য সংক্রান্ত নীতি ধীরে ধীরে তুলে দেবার চেষ্টা হলেই বিভিন্ন মহল তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। কৃষক লবিরও বিপুল চাপ থাকে। এমন পদক্ষেপ নেওয়া হলে তার রাজনৈতিক খেসারত দিতে হবে বলে রাজনৈতিক দলগুলিও ভরতুকি হ্রাসের বিষয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না।

সেচ নীতি সংক্রান্ত সমস্যা

উচ্চফলনশীল বীজ কর্মসূচির আওতায় দেশে জলসেচের প্রসার ঘটানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তাতে প্রায় দু-দশক ধরে (১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫) সরকার অত্যন্ত কম মূল্যে সেচের জল সরবরাহ করে এসেছে। ১৯৮৭ সালে এই বিষয়ে সরকার সচেতন হয়। বলা হয়, "এমন মূল্য ধার্য করতে হবে যাতে বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের পাশাপাশি স্থির ব্যয়ের একটা অংশও উঠে আসে (পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯২)।" রাজ্য স্তরে এ ব্যাপারে কিছুটা উদ্যোগ নেওয়া হলেও জাতীয় স্তরে এখনও এর কোনও প্রভাব পড়েনি। এর ফলে সরকারের আর্থিক ঘাটতি বাড়ছে। উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদেও টান পড়ছে। এক্ষেত্রেও জলের মূল্য বাড়াতে গেলেই কৃষক লবির তীব্র বিরোধিতার আশঙ্কা রয়েছে।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ভরতুকি

ভূগর্ভস্থ জল পাম্পের সাহায্যে টেনে তুলে সেচের কাজে ব্যবহার করতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, লাগে ডিজেল। এক্ষেত্রে ভরতুকি নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকলে কৃষি থেকে আয় বাড়ে। এই সত্য উপলব্ধি করে কৃষকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় এক শক্তিশালী ভোটারভিত্তি হিসেবে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। কৃষি থেকে আয় ভারতে করমুক্ত হওয়ায় অনেকে ছদ্ম কৃষক সেজে অকৃষি আয়কেও কৃষি আয় বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। তাঁরাও এই কৃষক লবির সঙ্গে রয়েছেন। অথচ, যথেচ্ছ জলসেচের ফলে বহু জায়গায় ভূগর্ভস্থ জল শুকিয়ে যাচ্ছে, মাটি নোনা হয়ে পড়ছে, বাড়ছে জল জমে থাকার সমস্যাও।

কোথাও বিনামূল্যে, কোথাও ভরতুকি মূল্যে পাওয়া বিদ্যুতের অপচয়ের কারণে আর্থিক ঘাটতি বাড়ছে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি লোকসানে চলছে, দেশের বহু জায়গায় দেখা দিচ্ছে বিদ্যুৎ ঘাটতি।

বস্তুতপক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ভরতুকি, দেশে অদক্ষ বিদ্যুৎ পরিষেবার অন্যতম কারণ। বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য অনেক শহুরে এলাকায় এখনও দিনে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং করে রাখতে হয়। কৃষিক্ষেত্রকে বিনামূল্যে ও ভরতুকি মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রকে। গড় বিদ্যুৎ ব্যয়ের অনেক বেশি তাদের কাছ থেকে মাশুল হিসেবে নেওয়া হয়। বেশি টাকা দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পান না। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, "বিদ্যুতের খারাপ মানই ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের পথে সবথেকে বড়ো বাধা।" ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনে বিদ্যুতের উৎপাদন, পরিবহণ ও সরবরাহকে পৃথক করা হয়। এর আগে এই সবই লোকসানে চলা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির অধীনে ছিল।

ফসলের মূল্য সংক্রান্ত সমস্যা

ভারতীয় খাদ্য নিগম-এর ফসলের মূল্য নির্ধারণ নীতি সবুজ বিপ্লবের পথ সুগম করে থাকলেও এরও কিছু সমস্যা রয়েছে।

ভারতীয় খাদ্য নিগম-এর মাধ্যমে যেসব ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে, তার অনেকগুলিই কোনও সামাজিক ও আর্থিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ। ভরতুকি বেড়ে চলায় ভারতীয় খাদ্য নিগম-এর খরচও বেড়ে চলেছে।

অনেকে সরবরাহ মূল্যে খাদ্যশস্য কিনে তা সরকারকেই সংগ্রহ মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা লুটছে। মূল্য নীতির কোনওরকম সংস্কার করতে গেলেই কৃষক লবির তীব্র বিরোধিতা আসছে।

মূল্য নীতি ও গণবণ্টন ব্যবস্থা দুটি বাজারের সৃষ্টি করেছে। একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত ও রেশন দোকানের মাধ্যমে পরিচালিত, অন্যটি বেসরকারি খোলা বাজার। সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি দাম নির্ধারণ করে। খোলা বাজারে দাম স্থির হয় চাহিদা ও জোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। কম দাম থেকে বেশি দামের বাজারে পণ্য পাচার হয়। আবার বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যশস্যের সরবরাহ মূল্য বিভিন্ন হওয়ায় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে খাদ্যপণ্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর মোকাবিলায় সরকার এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এর থেকে প্রত্যাশিতভাবেই সৃষ্টি হয়েছে কালোবাজারি ও মজুতদারির।

কৃষক লবির মতো বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সব সময়েই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। যখনই আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে, সরকারের

ড: এম এস স্বামীনাথনের বার্তা

ছয়ের দশকে সংঘটিত সবুজ বিপ্লবের কারিগরি ও জননীতিগত দিকের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন বলে আমি আনন্দিত। আমি বহুবারই সবুজ বিপ্লবকে একটা সিম্ফনির সঙ্গে তুলনা করেছি, যেখানে বিভিন্ন সংস্থার সুসমন্বিত ভূমিকা ছিল। গম ও ধান উৎপাদনের এই ব্যাপক বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে প্রযুক্তি, জননীতি ও কৃষকদের উৎসাহ। লেখকরা এর উল্লেখ করার পাশাপাশি এই প্রযুক্তির অপব্যবহারের কুফল নিয়ে আলোচনা করায় আমার আরও বেশি ভালো লেগেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত প্রযুক্তিগত কলাকৌশল যাতে পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। এজন্যই সবুজ বিপ্লবকে আমি 'চিরসবুজ বিপ্লব' বলি। দুর্ভাগ্যবশত এখন ভূপৃষ্ঠের জল ব্যবহার, সারের ব্যবহার এবং শক্তি ব্যবহারের সহায়তার অপব্যবহার হচ্ছে। ভরতুকি কাজে লাগানো হচ্ছে 'বাস্তুতন্ত্রগত আত্মহত্যায়।'

ভারতীয় খাদ্য নিগম, জাতীয় বীজ নিগম, কৃষিজ মূল্য কমিশনের মতো ছয়ের দশকে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানগুলি সবুজ বিপ্লবে যে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল, এই নিবন্ধে তার যথাযথ আলোচনা হওয়ায় আমার ভালো লেগেছে। নিশ্চিত ও মুনাফাযোগ্য বিপণনের ব্যবস্থা না করতে পারলে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষকদের কিছুতেই উদ্‌বুদ্ধ করা সম্ভব হত না।

যাঁরা দেশের কৃষি রূপান্তরের ইতিহাস জানতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে এই নিবন্ধ বিশেষ সমাদর পাবে বলে আমার বিশ্বাস। একসময়ে জাহাজে করে আমাদের খাদ্য আসত। এখন যে আমরা দেশের মাটিতেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন করতে পারছি, তা সব ভারতীয়ের কাছেই অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

ওপর চাপ আসে সহায়ক মূল্য বাড়ানোর। CACP যা সুপারিশ করে, তার থেকে উচ্চ হারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য স্থির করা এখন দস্তুর হয়ে গেছে।

সব কৃষিবাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক না হওয়ায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মজুতে গাফিলতি দেখা যায়। কখনও মজুত ক্ষমতার থেকে বেশি খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ফেলে তা ভরতুকিতে রপ্তানি করতে হয়।

উরুগুয়েতে কৃষি সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন খাদ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যশস্য মজুতের যে সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছে, অনেক সময়ে দেশীয় বাধ্যবাধকতায় তা লঙ্ঘিত হয়।

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে বালি মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তি চূড়ান্ত হয়। ভারত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। তবে চূড়ান্ত সময়সীমার (৩১ জুলাই, ২০১৪-র) মধ্যে প্রোটোকল অব অ্যামেন্ডমেন্টস্-এ স্বাক্ষর না করায় এই চুক্তি কার্যকর হতে পারেনি। খাদ্য সুরক্ষার প্রয়োজনে কোনও দেশ খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার কতটা গড়ে তুলতে পারে, তা নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনে কোনও আলোচনা হয়নি। ভারতের আশঙ্কা, এই প্রোটোকল-এ স্বাক্ষরের পর বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তি কার্যকর হয়ে গেলে উন্নত দেশগুলি আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

এখানে বলা দরকার, একমাত্র ভেনেজুয়েলা ছাড়া অন্য কোনও উন্নয়নশীল দেশই (এর মধ্যে সাফটা ও ব্রিক্স-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিও রয়েছে) এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আসেনি। শেষ পর্যন্ত ২০১৪-র নভেম্বরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে এই সংক্রান্ত সমঝোতার কথা ঘোষণা হয়েছে। তবে সমঝোতার বিস্তারিত বিবরণ এখনও জানানো হয়নি। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল থেকে জানা গেছে, ভারত যাতে কোনও ঊর্ধ্বসীমা ছাড়াই ভরতুকি মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য চুক্তির Peace Clause-কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়াতে আমেরিকা সম্মত হয়েছে।

ভারত ও আমেরিকার এই সমঝোতা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কর্তৃপক্ষ সাধারণ পরিষদে এখনও খতিয়ে দেখা হয়নি। সাধারণ পরিষদ এই সমঝোতা সব সদস্য রাষ্ট্রের জন্যই কার্যকর করে দোহা আলোচনা আবার শুরু করতে পারে। আবার বিকল্প হিসেবে ভারত-আমেরিকা সমঝোতাকে অগ্রাহ্য করে প্রোটোকল অব অ্যামেন্ডমেন্টস্-কে নিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করার পথও তাদের সামনে খোলা। কোনও বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে ভোটের ব্যবস্থা করার অধিকার ৯ নম্বর ধারার পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। ভোট হলে ভারত অবধারিতভাবেই তাতে হারবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য রাষ্ট্রগুলি তখন স্থির করবে ভারতকে আর এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে রাখা হবে কি না। তবে ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা বলে, এমন ভোট হবে না। আপসেই মীমাংসার পথ খুঁজে নেওয়া হবে।

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

চূড়ান্ত সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র ছয়ের দশকে উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তির হাত ধরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, যা সবুজ বিপ্লব নামে খ্যাত।

উচ্চফলনশীল বীজ কর্মসূচি রূপায়ণে সরকার বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি সার ও জলসেচের ব্যবহার বাড়াতে বহুবিধ উদ্যোগ নেয়। কৃষকদের মধ্যে নতুন এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে ভরতুকি ও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হয়। উৎপাদিত ফসল সরকার সংগ্রহ মূল্যে কিনে নিয়ে মজুত করে এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে তা দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সম্মিলিত এই ব্যবস্থার ফলে দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়ে, তবে ক্রমশ কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। নিশ্চিত ভরতুকি ব্যয়সংকোচের তাগিদকে নষ্ট করে। অদক্ষ, দিশাহীন পরিচালনা লোকসানের পথে ঠেলে দেয় প্রতিষ্ঠানকে। আবার ভরতুকির পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় চাপ সৃষ্টি হয় অর্থনীতির ওপর। সামাজিক ও আর্থিক সুবিধার থেকেও বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক লাভকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

যেসব নীতি ও কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, এখন সময় এসেছে তা নতুন করে খতিয়ে দেখার। সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অকেজো নীতিগুলি বাতিল করা না হলে সমস্যার দীর্ঘকালীন সমাধানের চাবিকাঠি মিলবে না।❑

[লেখক ড. টি এন শ্রীনিবাসন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আই আই টি মাদ্রাজের অধ্যাপক। পবন কাটকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সান্টা মনিকায় র‍্যান্ড কর্পোরেশনের সহকারী নীতি বিশ্লেষক এবং পাদরি র‍্যান্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুলে ডক্টরেট ফেলো।
emial : t.srinivasan@yale.edu
p.katkar@gmail.com]

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২১ নভেম্বর—১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

বহির্বিশ্ব

● **কংগ্রেসকে এড়িয়ে অভিবাসন নীতি বদল করলেন ওবামা :**

মার্কিন কংগ্রেসকে এড়িয়ে অভিবাসন নীতিতে বড় পরিবর্তন আনলেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এই পরিবর্তনের ফলে যেসব ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী মার্কিন গ্রিন কার্ড পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদেরও সুবিধে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ওবামা জানিয়েছেন, মার্কিন অভিবাসন নীতি দিশাহীন হয়ে গিয়েছে। তাই এই পরিবর্তন প্রয়োজন। কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা না করে এ বিষয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করেছেন ওবামা। নয়া নীতির ফলে আমেরিকায় বেআইনিভাবে থাকা ৫০ লক্ষ মানুষকে সে দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ হয়ে গেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম হয়েছে এমন ব্যক্তিদের অনেকের বাবা-মার সে দেশে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি নেই। আবার অনেককে শৈশবে বেআইনিভাবে সে দেশে আনা হয়। মূলত মার্কিন সমাজের এই অংশের কথা মাথায় রেখেই নয়া নীতি তৈরি করেছে ওবামা প্রশাসন। কিন্তু এতে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের মতো দক্ষ পেশাদারদেরও সুবিধে হতে পারে। এখন স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি বা গ্রিন কার্ডের জন্য আর্জি জানিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। প্রক্রিয়া শেষ হতে কয়েক বছর সময় লাগে। সেই সময়ে এই ধরনের পেশাদার ও তাঁদের স্বামী বা স্ত্রী-রা শহর বা চাকরি বদলাতে পারেন না। বিয়ে করার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়। এখন এই ধরনের পেশাদাররা যাতে সহজে চাকরি বা শহর বদল করতে পারেন, সেজন্য পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন করবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর। অনেক ক্ষেত্রে এই পেশাদারের স্বামী অথবা স্ত্রী-ও গ্রিন কার্ডের আবেদন করে থাকলে তাঁদের চাকরি করার সুযোগও দেওয়া হবে।

বেআইনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা ব্যক্তিদের ওবামা সহজেই সে দেশে থাকতে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন বলে তোপ দেগেছেন বিরোধী রিপাবলিকানরা। প্রেসিডেন্টের পালটা যুক্তি, এঁরা (এই বাসিন্দারা) অনেকেই অন্য সব ক্ষেত্রে মার্কিন আইন মেনে চলেন। নয়া নীতির ফলে সহজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইসব বাসিন্দা মার্কিন সমাজের মূল স্রোতে যোগ দিতে পারবেন।

● **আই এস জঙ্গি নিধন ব্রিটেনের হামলায় :**

গত কয়েক সপ্তাহ ইরাকে প্রায় প্রতিদিন গড়ে আট জন করে আই এস জঙ্গিকে নিধন করেছে ব্রিটেনের স্পেশাল এয়ার সার্ভিসেস (স্যাস) অফিসাররা। কিন্তু এতদিন জানা ছিল আই এস-এর বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে না ব্রিটেন। রাতের আঁধারে জঙ্গিঘাঁটি বেছে বেছে হামলা চালিয়েছেন তাঁরা। তবে প্রত্যেকটা অভিযানই হয়েছে অত্যন্ত গোপনে। এক ব্রিটিশ দৈনিকের দাবি, জঙ্গিদের অপ্রস্তুত করতেই এহেন হামলার পথ বেছেছে ব্রিটেন (২৩ নভেম্বর প্রকাশিত)।

তবে লাগাতার হামলা সত্ত্বেও দমছে না আই এস জঙ্গিরা। তাই শুধু গোপন অভিযান চালিয়েই থামছে না ব্রিটেন। পাশাপাশি আই এস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তৈরি করছে ইরাকি সেনা ও কুর্দ বাহিনীকে।

● **মুবারক "নির্দোষ", ফের উত্তপ্ত তাহরির স্কোয়ার :**

মিশরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের বিরুদ্ধে ২০১১ সালের গণহত্যা ও দুর্নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা খারিজ করে রায় দিল সে দেশের এক আদালত। একই হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন মুবারক জমানার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ও দেশের আরও ছয় শীর্ষস্থানীয় নিরাপত্তা আধিকারিক। ইজরায়েলে গ্যাস রপ্তানি-সহ আরও কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক তছরুপ ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল মুবারক এবং তাঁর দুই ছেলের বিরুদ্ধে। আদালতের রায়ে বেকসুর সাব্যস্ত হলেন তাঁরাও।

অবশ্য এই রায়ের পরেও পুরোপুরি ছাড় পাচ্ছেন না মুবারক। অন্য একটি তছরুপ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে তিন বছরের সাজা ভোগ করছেন তিনি। তবে এই রায়ের বিরোধিতা করে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ থাকছে বলে মত আইনজীবীদের।

১৯৮১ থেকে প্রায় তিরিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ২০১১ সালে গণ অভ্যুত্থানের জেরে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন মুবারক। অভিযোগ, তার আগে দেশে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন রুখতে গণহত্যার নির্দেশ দেন তিনি। নিহত হন আটশো নাগরিক। ২০১২ সালে এই মামলাতেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন সাজা হয় মুবারকের। এই রায়ে সব মাফ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দেশের বর্তমান সরকারকে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

প্রতিবাদ আর স্লোগানে ফের উত্তাল মিশর। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত দুজনের মৃত্যু ঘিরে আবার উত্তপ্ত তাহরির স্কোয়ার। 'গণহত্যার নায়ক' হোসনি মুবারকের শাস্তির দাবিতে এখনও অনড় দেশের একটা বড় অংশ।

● **নাইজিরিয়ার ধর্মস্থানে জঙ্গি হানা :**

নাইজিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কানো-তে একটি ইসলামি ধর্মস্থানের ওপর সন্দেহভাজন 'বোকো হারাম' জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলায় নিহত হলেন ৬৪ জন সাধারণ মানুষ। সংবাদে প্রকাশ, গত ২৮ নভেম্বর দুপুরে ওই ধর্মস্থানে প্রার্থনায় যোগ দিতে আসেন বহু মানুষ। প্রার্থনা চলার সময়ে মুখোশধারী একদল জঙ্গি আচমকা শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, পাশাপাশি গুলি চালাতে থাকে। ধর্মস্থানে

আটকে থাকা মানুষ পালানোর কোনও সুযোগ পাননি। ঘটনাস্থলেই ৬৪ জন মারা যান। আহত অসংখ্য। ধর্মস্থানের ওপর এমন নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা করে কানো শহরের আমির (মেয়র) বোকো হারাম জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেন।

● **শ্রীলঙ্কায় রাজাপক্ষে বিরোধী জোট :**

শ্রীলঙ্কায় মাহিন্দা রাজাপক্ষের একচেটিয়া শাসনের কি অবসান হতে চলেছে? দ্বীপরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনই প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। সংবাদে প্রকাশ, শাসক দল শ্রীলঙ্কা পার্টি এবং ওই পার্টির একক কর্তৃত্বের অধিকারী রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে শ্রীলঙ্কার ছোট-বড় সব ক-টি রাজনৈতিক দল। প্রধান বিরোধী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির উদ্যোগে তৈরি এই জোটে সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন রাজাপক্ষে মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দেওয়া ১১ জন মন্ত্রী। এঁদের মধ্যে রয়েছেন একদা রাজাপক্ষের অতি ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাইথরিপালা স্থিরিসেনা। রাজনৈতিক ওঠাপড়ার এই সকল ঘটনা বৌদ্ধপ্রধান দ্বীপরাষ্ট্রে শাসকগোষ্ঠীর রদবদলের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে।

● **ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে ফিলিপিন্‌স :**

ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'হাজুপিত' (ফিলিপিনো ভাষায় এই শব্দটির অর্থ চাবুক) আছড়ে পড়ল ফিলিপিন্‌সের উপকূলবর্তী 'সামার' দ্বীপে। ৭ ডিসেম্বর ভোর রাতে ওই ঝড়ের আঘাতে ১২ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি ধুলোয় মিশে গেল। কিন্তু প্রশাসনিক তৎপরতার কারণে 'হাজুপিত' মারণঘাতী হয়ে উঠতে পারেনি। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'সামার' দ্বীপের বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণে মৃতের সংখ্যা মাত্র ২১। অথচ ২০১৩-য় ঘূর্ণিঝড় 'হাইয়ান'-এর আঘাতে ৭ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।

● **বিপর্যস্ত শৈশব নিয়ে 'ইউনিসেফ' রিপোর্ট :**

রাষ্ট্রসংঘের শিশু তহবিল 'ইউনিসেফ' সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ২০১৪ সালকে শিশুদের জন্য 'বিপর্যয়ের বছর' বলে ঘোষণা করেছে। এই এক বছরে (১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত) প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু যুদ্ধের শিকার হয়েছে। এদের সিংহভাগই সিরিয়া, ইরাক, দক্ষিণ সুদান, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন ও প্যালেস্তাইনের শিশু। অন্যদিকে পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশে 'ইবোলা' নামক মারণ সংক্রমণের শিকার হয়েছে কয়েক লক্ষ শিশু। 'ইবোলা'-র সংক্রমণে মৃত্যুর পাশাপাশি হাজার হাজার শিশু অনাথ হয়ে পড়েছে। স্কুল ছাড়তে হয়েছে ৫০ লক্ষেরও বেশি শিশুকে।

এই দেশ

● **তিন দশক পরে কামান কিনল কেন্দ্র :**

সম্প্রতি নতুন ৮১৪টি কামান কেনার জন্য ১৫,৭৫০ কোটি টাকার প্রকল্পে সবুজ সংকেত দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিকর। প্রসঙ্গত, বোফোর্স কাণ্ডের পর ভারত সরকার কামান কেনার বিষয়টিকেই স্থগিত রেখেছিল এতকাল। ১৯৮৬-র মার্চে ৪১০টি হাউয়িৎজার কামান কেনার জন্য সুইডেনের এ বি বোফোর্স কোম্পানির সঙ্গে ৬০ কোটি টাকার চুক্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল।

● **প্লাস্টিক বন্ধে নতুন আইন :**

পরিবেশ বাঁচাতে এবার প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও কঠোর আইন নিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকার। আগের আইনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন আইন আনা হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, ৪০ (চল্লিশ) মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যাগ বানালে সেই সংস্থাকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ছাড়াও প্রতিটি প্লাস্টিকের ব্যাগে প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম এবং মাইক্রনের পরিমাপ বাধ্যতামূলকভাবে জানাতে হবে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানান, প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা হয়, তা মাটিতে মিশে যায় না বলে বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষিত করে বলে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

● **'সার্ক' শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ :**

নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ১৮তম 'সার্ক' শীর্ষ সম্মেলন বসেছিল গত ২৫-২৬ নভেম্বর। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সহযোগিতা মঞ্চ, সংক্ষেপে 'সার্ক'-এর সদস্যসংখ্যা ৮। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও মালদ্বীপ। 'সার্ক' অন্তর্ভুক্ত এই দেশগুলির মধ্যে ভারত বৃহত্তম। 'সার্ক' শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চে ভাষণ প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'সার্ক' গোষ্ঠীভুক্ত আটটি দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ, সড়ক ও রেল যোগাযোগের তিন দফা প্রস্তাব দেন। 'সার্ক'-এর বাকি দেশগুলি ওই প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য ও পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে 'সার্ক'-এর দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি তিনি সম্ভাবনার পথও দেখান। তাঁর মতে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি সারা বিশ্বের সঙ্গে যা বাণিজ্য চালায়, সেই তুলনায় এই দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ তার মাত্র ৫ শতাংশ। এরও মাত্র ১০ শতাংশ বাণিজ্য চলে 'সার্ক'-এর মুক্ত বাণিজ্য এলাকার মধ্যে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, আজও এক পঞ্জাব (ভারতে) থেকে অন্য পঞ্জাবে (পাকিস্তানে) পণ্য পাঠাতে গেলে দিল্লি-মুম্বই-দুবাই-করাচি হয়ে যেতে হয়। এতে ১১ গুণ বেশি রাস্তা আর ৪ গুণ বেশি খরচ পড়ে। তিনি আরও বলেন, 'সার্ক' গোষ্ঠী হিসেবে মানুষের আশা অনুযায়ী এগোতে পারেনি। অথচ পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন দক্ষিণ এশিয়াতে সবথেকে বেশি, কিন্তু এখানেই তার মাত্রা সবথেকে কম বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

● **নতুন সি বি আই প্রধান :**

দেশের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা সি বি আই-এর নতুন প্রধান পদে নিযুক্ত হলেন অনিল কুমার সিন্‌হা। এর আগের সি বি আই প্রধান রণজিৎ সিন্‌হা-র স্থলাভিষিক্ত নতুন প্রধান ১৯৭৯ সালের আই পি এস। এতদিন অনিল সিন্‌হা সি বি আই-এরই বিশেষ নির্দেশক ছিলেন।

● **এক জোট জনতা পরিবার :**

১৯৭৭-এ কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলা জনতা পার্টির (কেন্দ্রে সরকারও গঠন করেছিল) বিচ্ছিন্ন অংশগুলি ফের একজোট হল। অখণ্ড জনতা পার্টি ভেঙে তৈরি হওয়া

উপদলগুলি, যথাক্রমে সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, সংযুক্ত জনতা দল এবং জনতা দল (সেক্যুলার) এক হয়ে ফের অখণ্ড একটি দল গঠনের কথা ঘোষণা করল। নতুন গোষ্ঠীর নাম সমাজবাদী জনতা দল। সমাজবাদী পার্টির প্রধান মুলায়েম সিং যাদব দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। এবারের জনতা ঐক্যের লক্ষ্য বিজেপি-বিরোধিতা।

● **ছানি কাটাতে গিয়ে বহু দৃষ্টিহীন পঞ্জাবে :**

পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় একটি বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবিরে চোখের অপারেশনের পর ৬০ জনের দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার ঘটনা সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। যদিও এ ধরনের ঘটনা এদেশে এই প্রথম নয়। অদূর অতীতে বেশ কয়েকটি এমন মর্মান্তিক ঘটনার নিদর্শন রয়েছে। প্রতিবারই শিবিরের উদ্যোক্তা এবং চিকিৎসকদের গাফিলতিকেই দায়ী করা হয়েছে। গুরুদাসপুরের ঘটনায়ও গাফিলতির অভিযোগে ওই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজক সংস্থা কর্তা এবং শিবিরের প্রধান চিকিৎসককে পঞ্জাব পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

● **পুতিনের ভারত সফর :**

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন দু-দিনের (১০ ও ১১ ডিসেম্বর) ভারত সফরে এসে পরমাণু এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন যাত্রাপথ তৈরি করলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের পর ভারতে নতুন ১০টি পরমাণু চুল্লি গঠনের বিষয়ে সমঝোতা করলেন। আগামী ২০ বছরে পর্যায় ক্রমে এই চুক্তিগুলি তৈরি করা হবে বলে পুতিন জানালেন। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে সংগতি রেখে এক নতুন প্রতিরক্ষা সমঝোতার কথা বলেছেন পুতিন। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের মাটিতে রাশিয়ার আধুনিক হেলিকপ্টার তৈরির কারখানা তৈরি করতে রাশিয়া উৎসাহী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র দিবসে' বিশেষ অতিথি হিসেবে ভারত সফরে আসছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা। তার ঠিক আগে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত মেরুতে থাকা রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের এই অগ্রগতি ভারতের পক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

● **সংসদের শীতকালীন অধিবেশন :**

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হল ২৪ নভেম্বর। এই অধিবেশনকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেদিন সকল সাংসদ এবং বিরোধী দলগুলিকেও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তিনি বলেন, "আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। আশা করি, সকলেই ঠান্ডা মাথায় এই অধিবেশনকে সফল করতে উদ্যোগী হবেন।" গত অধিবেশনে বিরোধী দলের গঠনমূলক ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে এই অধিবেশনেও তাদের কাছ থেকে সেই ধরনের ভূমিকার আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এই রাজ্য

● **সেরা জেলা বর্ধমান :**

একশো দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের শীর্ষে বর্ধমান জেলা। এ তথ্য আগেই জানানো হয়েছে। এবার 'প্রতিবন্ধী সুরক্ষা'-য়ও বর্ধমান সেরা জেলার স্বীকৃতি পেল। রাজ্য সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্ধমান জেলা প্রশাসন প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও তাঁদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আরও সমাজমুখী করার কাজেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বর্ধমানের ৩১টি ব্লকে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। ওই শিবিরে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছিল অভিভাবকত্বের আইন কার্যকর করা। এ ছাড়াও, প্রতিবন্ধীদের পড়াশোনা এবং স্বনির্ভরতা সম্পর্কে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিবন্ধীদের মাসিক পেনশন দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে তারিফযোগ্য উদ্যোগ বলে সরকারি সমীক্ষায় বলা হয়েছে এবং এই কারণেই বর্ধমান সেরা জেলার সম্মান পাচ্ছে।

● **জাতীয় নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পে শামিল রাজ্যও :**

সারা দেশে নদী সংযুক্তিকরণের মানচিত্রে স্থান করে নিল পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে দামোদরের সঙ্গে অজয় নদীকে সংযুক্ত করার কাজ শুরু হতে চলেছে। কুনুর নদী ও সিঙ্ঘম খালের মাধ্যমে এই দুই নদী সংযুক্ত হচ্ছে। রাজ্য সরকার সূত্রে প্রকাশ, এই সংযুক্তির ফলে অজয় নদীর মরা খাতে ফের জল আসবে। দামোদরের জলে সারা বছর জীবন্ত থাকে অজয়। এই প্রস্তাবিত জলপথ দিয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে দামোদরের জল কুনুর নদী ও সিঙ্ঘম খালের মাধ্যমে ৪৫ কিমি দূরে কাটোয়ার নতুন গ্রাম অজয়ে চলে যাচ্ছে। রাজ্যের এই সংযুক্তিকরণ প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছে।

● **ছিটমহল বিনিময় চুক্তিতে সায় রাজ্যের :**

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছিটমহলগুলির বিনিময়ের প্রশ্নে যৌথ চুক্তি এতদিনে বাস্তবরূপ পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে বিষয়টি ঝুলে আছে।

ছিটমহল, আভিধানিকভাবে এর অর্থ 'বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড'। এই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের উৎপত্তি দেশভাগের সময়। বলা হয় যে, তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী একতরফাভাবে এবং তাড়াহুড়ো করে দেশভাগের কাজটি শেষ করতে চাওয়ার ফলেই এই সমস্যা তৈরি হয়। দেখা যায় যে, ভারতীয় পরিবার অধ্যুষিত ভূখণ্ড পূর্ব পাকিস্তানে (এখন বাংলাদেশ) পড়ে গেছে; অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাসিন্দাদের মালিকানাধীন জমিও ভারতের ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এই ছিটমহলের বাসিন্দারা সুদীর্ঘকাল ধরে কার্যত পরিচয়হীন। কারণ এঁরা আজও কোনও দেশেরই (ভারত-বাংলাদেশ) নাগরিকত্ব পাননি। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর দুই দেশের ছিটমহলগুলি হস্তান্তরের প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও তা নানা কারণে কার্যকর হয়নি। এরপর ২০০৪-এ পূর্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার বিষয়টি কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়। রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে সেই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। প্রায় ১০ বছর পরে ছিটমহল বিনিময়ের প্রশ্নটি ফের সামনে এসেছে।

● **নতুন রূপে পর্ষদ টেস্ট পেপার :**

রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিশেষ প্রস্তুতির সুযোগ করে দিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপারে আমূল রদবদল করল। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০-তে থাকা পড়ুয়ারা নানা বিষয়ে যেসব প্রশ্নের সেরা উত্তর দিয়েছে, সেগুলিই এবার নমুনা উত্তরপত্রে

বিশদে তুলে ধরা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নে সর্বোচ্চ নম্বর পেতে গেলে কী লিখতে হবে, কীভাবে লিখতে হবে, হাতেকলমে তারও উপযুক্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও করা হয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যের নামি ও প্রতিষ্ঠিত ৮০টি বিদ্যালয়ের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নও দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের অঙ্কের ভীতি কাটাতে সব গণিত প্রশ্নের উত্তরমালাও দেওয়া হয়েছে।

● **কৃষি বিপণন বিধেয়ক গৃহীত বিধানসভায় :**

বহু আলোচিত 'কৃষি বিপণন বিধেয়ক' (বিল) রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হল। বিলের জন্য রাজ্য সরকার ৮ ডিসেম্বর একদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকে। এই বিল গৃহীত হওয়ার ফলে এই রাজ্যে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি এবং বেসরকারি বাজার খোলার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আইন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিধেয়কের পক্ষে সরকারের যুক্তি, এখন ফল, সবজি, মাছ ইত্যাদি উৎপাদন করেও যথাযথ দাম পান না চাষিরা। সেই ব্যবস্থা দূর করে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানাতেই এই সংশোধনী বিল।

● **দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রী গ্রেফতার :**

বহু কোটি টাকার সারদা চিট ফান্ড প্রতারণায় যুক্ত থাকার অভিযোগে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি বি আই রাজ্যের পরিবহণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র-কে গ্রেফতার করল। এর আগে ওই একই মামলায় রাজ্যসভার দুই সাংসদ কুনাল ঘোষ এবং সৃঞ্জয় বসু-কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

● **শালবনিতে জিন্দলদের ইস্পাত প্রকল্প স্থগিত :**

আনুষ্ঠানিকভাবে শালবনির প্রকল্প স্থগিত রাখার কথা জানিয়ে দিলেন জে এস ডব্লিউ স্টিলের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজ্জন জিন্দল।

প্রসঙ্গত, ২০০৭-এ রাজ্য ও জিন্দল গোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তি সইয়ের পরে প্রকল্পটি বারে বারে বাধার মুখে পড়ে। ২০০৮-এ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শিলান্যাসের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে প্রকল্পের অদূরেই মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা। ২০০৯-এ মন্দার কারণে তৈরি হয় আর্থিক সমস্যা। মন্দা ও ইস্পাতের পড়তি চাহিদায় ব্যাংকঋণ পাওয়া কঠিন হয়। এরপর তৈরি হয় জমি-জটিলতা। প্রয়োজন ছিল ৪৩৩৪ একর জমি। ২৯৪ একর সরাসরি কেনে সংস্থা। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন অনুযায়ী শিল্পের জন্য বাড়তি জমি রাখতে ১৪ ওয়াই ধারায় আবেদন করতে হয়। এই আবেদন করে অতিরিক্ত জমি রাখার জন্য ভূমি দফতরের অনুমোদন নিতে হয়। ২৯৪ একর কেনার আগে সংস্থা অনুমোদন না নেওয়ায় জমির লিজ চুক্তি আটকে যায়। শিল্প দপ্তরের হস্তক্ষেপে সে সমস্যা অবশ্য পরে মেটে।

প্রথম পর্যায়ে ৩০ লক্ষ টনের ইস্পাত কারখানা এবং সেখানে ব্যবহারের জন্য ৩০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে বাম জমানায় শালবনিতে ২০ হাজার কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব দিয়েছিল জিন্দল গোষ্ঠী। সংস্থার দাবি ছিল, প্রকল্প তৈরিতে তারা দায়বদ্ধ হলেও আকরিক লোহার জোগান নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে ঋণ দিচ্ছে না ব্যাংক। উল্লেখ্য, 'গ্রিনফিল্ড' বা সম্পূর্ণ নতুন ইস্পাত প্রকল্পে সরকার বা সরকারি সংস্থার মাধ্যমে আকরিক লোহা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হলে ঋণ দেয় না কোনও ব্যাংক।

রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং প্রশাসনিক গড়িমসি। সঙ্গে কয়লা ও আকরিক লোহা জোগানের সমস্যা এবং ইস্পাতের চাহিদায় ভাটা। সব মিলিয়ে আটকে গেল রাজ্যে জিন্দলদের শালবনি ইস্পাত প্রকল্প।

অর্থনীতি

● **জাতীয় আয় ছাপিয়ে যেতে পারে শেয়ার বাজার :**

নথিবদ্ধ সব শেয়ারের বাজারমূল্য (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) গত কয়েক সপ্তাহে ছাড়িয়েছে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা। সব নজির ভেঙে শেয়ার বাজার এখন সর্বকালীন উচ্চতায়।

প্রকাশিত হয়েছে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছ-মাসের জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিসংখ্যান। বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থনীতির চাকা প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় কিছুটা মন্থর হলেও বাজারের আশঙ্কার তুলনায় পরিসংখ্যান মন্দ নয় বলে মনে করা হচ্ছে। এপ্রিল-জুনে ৫.৭ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় জুলাই-সেপ্টেম্বরে জাতীয় উৎপাদন বা আয় বেড়েছে ৫.৩ শতাংশ হারে। আগের বছর একই সময়ে তা ছিল ৫.২ শতাংশ। আশা করা হচ্ছে গোটা বছরে বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৫.৫ শতাংশ।

প্রায় প্রতিদিন নতুন নজির গড়ছে সেনসেক্স ও নিফটি। বাজারে চলছে শক্তিশালী 'বুল রান'। নথিবদ্ধ সব শেয়ারের বাজার দর ছাড়িয়েছে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা। ২০০৩ সালে তা ছিল ১০ লক্ষ কোটি টাকা, যা ৫০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছায় ২০০৯ সালে। এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয়, শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করে কী ধরনের লাভ হতে পারে। ২০১৩-১৪ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল প্রায় ১১৪ লক্ষ কোটি টাকা। বাজার যে গতিতে বাড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে শেয়ারের মোট বাজার দর আর কিছু মাসের মধ্যেই জাতীয় আয়কে ছাপিয়ে যেতে পারে। মাঝেমধ্যে সংশোধন সাপেক্ষে বাজার এখন চাঙ্গাই থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

● **অনলাইন ব্যাবসা নিয়ে শীঘ্রই নির্দেশিকা রিজার্ভ ব্যাংকের :**

অনলাইন সংস্থাগুলির ব্যাবসা পদ্ধতি নিয়ে উদ্‌বিগ্ন রিজার্ভ ব্যাংক। ই-কমার্সের সাইটে টাকাপয়সা লেনদেন নিয়ে খুব শীঘ্রই নির্দেশিকা প্রকাশ করতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ কথা জানান রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এইচ আর খান। ই-কমার্স ব্যাবসার ঠিক কোন পদ্ধতিগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের চিন্তার কারণ তা বিস্তারিত বলেননি তিনি। মনে করা হচ্ছে, ই-কমার্স সাইটে গ্রাহকের থেকে টাকা লেনদেনের বিষয়টি আরও সুরক্ষিত করতে চায় রিজার্ভ ব্যাংক। সম্প্রতি বিভিন্ন ই-কমার্স সাইটে ভুয়ো পণ্য বিক্রির জন্য আদালতে মামলা হয়েছে। এসবের উপর মন্ত্রক কড়া নজর রাখছে বলেই জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী। ই-কমার্সের ব্যাবসায়িক মডেল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি ই-কমার্স সাইটে বিপুল ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্যও বাণিজ্য মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছে সাধারণ বিপণির মালিকরা। অনলাইন বাজারে এরকম অবিশ্বাস্য ছাড়ের জেরে প্রতিযোগিতা কমিশনের কাছেও অভিযোগ করেছে খুচরো দোকান সংগঠনগুলি।

● **খতিয়ে দেখা হবে সোনায় ৮০ : ২০ নীতি প্রত্যাহারের ফল :**

সোনা আমদানির উপর ৮০ : ২০ নীতি প্রত্যাহারের পর পরিস্থিতি কী হচ্ছে সেদিকে নজর দিচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক। ৮০ : ২০ নীতি প্রত্যাহারের পর সোনার চাহিদা কেমন থাকে, আমদানির পরিমাণই বা কত হয়, সেসব খতিয়ে দেখে তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ৮০ : ২০ নীতি উঠে যাওয়ার পর নতুন করে সোনার আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ লাগবে কি না তাও সম্পূর্ণ পরিস্থিতি দেখে তবে ঠিক হবে। মূলত অপরিশোধিত তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে পড়ে যাওয়ায় সোনার আমদানির উপর ৮০ : ২০ নীতি শিথিল করা হয়েছে বলে জানান খান। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সোনার আমদানি বাড়লেও গত সপ্তাহে সোনার আমদানিতে নীতি শিথিল করে আর বি আই। খান বলেন, তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় চলতি খাতে ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আপাতত নেই। তাই সোনার আমদানিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ঋণনীতি ঘোষণার সময় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রাজনও বলেন, সোনার উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার এটাই সেরা সময়। খুব শীঘ্রই হয়তো সোনার আমদানি শুল্ক নির্ধারণের পদ্ধতিও সরকার পালটাতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রাজন।

● **বাড়ল প্রিপেড কার্ডের সীমা :**

প্রিপেড কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। প্রিপেড কার্ডের ব্যালান্সের পরিমাণ বর্তমান ৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। 'কোনও অবস্থাতেই প্রিপেড কার্ডের ব্যালান্স যেন এক লক্ষ টাকা অতিক্রম না করে', বিবৃতিতে জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। এর ফলে নগদে কেনাকাটার প্রবণতা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি গিফ্‌ট কার্ডের সময়সীমাও বর্তমান এক বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করেছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রিপেড কার্ড ও গিফ্‌ট কার্ডের বাকি নিয়মগুলি বজায় থাকবে।

● **ইন্ডিয়া পোস্ট-এর সংস্কারের সুপারিশ :**

তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিকম মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদের কাছে জমা পড়া এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে—অবিলম্বে দেশের ডাকঘরগুলিতে ব্যাংকিং, বিমা এবং ই-কমার্স পরিষেবা চালু করা উচিত। টি এস আর সুব্রহ্মণ্যমের নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট বলছে, পোস্ট অফিসের মূল সংস্থার পাঁচটি বিভাগ থাকা উচিত। তার মধ্যে তিনটি হবে ব্যাংকিং, বিমা এবং ই-কমার্স। দেশের ১.৫৫ লক্ষ ডাকঘরের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে এভাবেই উন্নতিকরণ হবে ইন্ডিয়া পোস্টের।

ডাকঘর ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক। সেই টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ, ব্যাংক ব্যাবসার পাশে ই-কমার্সকেই পোস্ট অফিসের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাবসা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এভাবেই ই-কমার্স ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সারির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ইন্ডিয়া পোস্ট। পোস্ট ব্যাংক গড়ার প্রসঙ্গে টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ, প্রথম তিন বছরে দেশের সব জেলায় পোস্ট ব্যাংক-এর একটি করে শাখা গড়া হোক এবং প্রাথমিক লগ্নি হিসেবে সরকারের ৫০০ কোটি টাকা পুঁজি ঢালা উচিত এ প্রকল্পে।

ব্যাংকিং, বিমা এবং ই-কমার্স ছাড়া সরকারি পরিষেবা এবং বি-টু-বি ব্যাবসা করতে পারে ইন্ডিয়া পোস্ট। পাঁচটি বিভাগের মধ্যে প্রথম তিনটি বিভাগের ব্যাবসা দ্রুত শুরু করার উপর জোর দিয়েছে সুব্রহ্মণ্যম কমিটি। অনলাইন ব্যাবসার ফায়দা তুলতে ও এই ব্যাবসা থেকে ৯০০ কোটি ডলার (প্রায় ৫৪,০০০ কোটি টাকা) আয়ের লক্ষ্যে তাদের পরিকাঠামো ব্যবস্থা ঢেলে সাজাচ্ছ ইন্ডিয়া পোস্ট।

● **জমি বিক্রি করে ১,২১১ কোটি টাকা তুলল সাহারা :**

সুব্রত রায়ের জামিনের টাকা জোগাতে গুড়গাঁওয়ের ১৮৫ একর জমি এম থ্রি এম সংস্থাকে ১,২১১ কোটি টাকায় বিক্রি করল সাহারা গোষ্ঠী। আবাসন, সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, অফিস, বিনোদন ক্ষেত্র, খুচরো বিপণি তৈরির মতো একাধিক কাজে সেই জমি ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে এম থ্রি এম সংস্থা। ওই জমির উপর তৈরি প্রকল্প থেকে বিক্রি বাবদ ১২ হাজার কোটি টাকা আয়ের আশা রাখছে রিয়েল এস্টেট সংস্থাটি। চাপের মুখে নয়, বরং বাজার দরেই সাহারা গোষ্ঠী এই জমি বিক্রি করেছে বলে দাবি এম থ্রি এম সংস্থার। গুড়গাঁওয়ের চৌমা গ্রামের এই জমিটির জন্য প্রাথমিক দফায় ১৫০ কোটি টাকা সাহারা গোষ্ঠীকে নগদে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এম থ্রি এম সংস্থা। আগামী ছ-মাসে বাকি টাকা শোধ করা হবে। তার জন্য পোস্ট ডেটেড চেকও দেওয়া হয়েছে। চৌমা গ্রামের এই জমিতে এক লক্ষ ২০ হাজার বর্গফুট বিল্ট-আপ এরিয়া রয়েছে। দু-মাস আগেই এই জমি বিক্রির চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদনের জন্য চুক্তির বাস্তবায়ন আটকে ছিল। জেলবন্দি সুব্রত রায়ের জামিনের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা ধার্য করেছে সুপ্রিমকোর্ট।

● **সাত লক্ষ কোটি টাকা মূলধন চাই ২৬২টি সংস্থার :**

দেশের প্রথম সারির ২৬২টি সংস্থা বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে চলছে। ঋণ মেটাতে এই সংস্থাগুলির ৭ লক্ষ কোটি টাকা এবং তিন বছরের সময় প্রয়োজন—এক রিপোর্টে জানিয়েছে ইন্ডিয়া রেটিংস্। ঋণ মেটানোর জন্য বাজারে শেয়ার ছাড়ার প্রয়োজন হলে ভারতের ৫০০টি প্রথম সারির সংস্থার মধ্যে ২৬২টি সংস্থাকে বাজারে ন্যূনতম ৭,০৪,৩০০ কোটি টাকার শেয়ার ছাড়তে হবে। তবে এই পথে টাকা তোলা খুব একটা সহজ হবে না। কারণ ২০০৭-০৮ অর্থবর্ষ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের মধ্যে এই ৫০০ সংস্থায় এর অর্ধেকের কিছু কম টাকা এই সংস্থাগুলির শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সংস্থাগুলির ঋণের পরিমাণ আর না বাড়লে বর্তমান ঋণ মেটাতে ন্যূনতম তিন বছর সময় লাগবে। এর মধ্যে যে ৯৬টি সংস্থার ঋণ অনাদায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বা যেগুলি ঋণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেগুলির ঋণের বোঝা হালকা করতে ৯ থেকে ১০ বছর সময় লাগবে, জানিয়েছে ইন্ডিয়া রেটিংস্।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **বিরল 'চাইনিজ ফেরেট-ব্যাজার'-এর সন্ধান :**

আলিপুরদুয়ারে জলদাপাড়া বনাঞ্চলে মিলল বিরল এক প্রাণীর সন্ধান। প্রাণীটির নাম 'চাইনিজ ফেরেট-ব্যাজার'। উত্তরবঙ্গের এই জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্যে এটা এক নতুন সংযোজন। স্তন্যপায়ী

এই প্রাণীর অস্তিত্ব সম্প্রতি লেন্সবন্দি হয়েছে। উল্লেখ্য, নিশাচর এই প্রাণীর সংখ্যা এতই কম যে, আন্তর্জাতিক প্রাণী বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা 'ইনটারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস' এদের 'লাল' তালিকাভুক্ত করেছে। এমন একটি বিরল প্রাণীর সন্ধান পেয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই উল্লসিত। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, কয়েক মাস আগে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ইন্ডিয়ান ঢোল বা বন্য কুকরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

● **হারিয়ে যাওয়া শহরের সন্ধান গ্রিসে :**

গ্রিসের পূর্বাঞ্চলে ইজিয়ান সাগরের গভীরে হারিয়ে যাওয়া এক শহরের সন্ধান পেলেন সে দেশের পুরাতাত্ত্বিকরা । গ্রিসের পুরাতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র 'হেলেনিক রিসার্চ ওয়ার্কশপ'-এর বিজ্ঞানীরা জানান, সমুদ্রতল থেকে মাত্র ৬ ফুট নীচে রয়েছে এই নগরীর অবশেষ। সেখান থেকেই পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাত্র তৈরির একটি কারখানার অনেকটা অংশ ও ১৬টি প্রাচীন পাত্রের নিদর্শন। পুরাতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, যে ভাঁটায় ওই পাত্র তৈরি করা হত সেইরকম একটি ভাঁটারও ভগ্নাবশেষ রয়েছে সেখানে। তাঁদের অনুমান, প্রাচীন এই নগরী একসময় ইজিয়ান সাগরের তীরবর্তী কোনও জায়গাতেই ছিল। পরে কোনওভাবে এই নগরী তলিয়ে যায় সমুদ্রে।

● **'ইবোলা' জীবাণু নির্ণয়ে নতুন গবেষণা :**

'ইবোলা' সংক্রমণের অস্তিত্ব খুঁজে বার করতে এতদিন আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে পাওয়া জীবাণুর বিশেষ ডি এন এ পরীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হত। এর জন্য যথেষ্ট সময় লেগে যেত। সেনেগালের পাস্তুর ইন্সটিটিউট-এর গবেষকেরা জানাচ্ছেন, এবার সৌরশক্তি চালিত বিশেষ এক ধরনের পোর্টেব্‌ল গবেষণাগারে মাত্র ১৫ মিনিটেই নির্ণয় করা যাবে শরীরে বাসা বাঁধা 'ইবোলা'-র ভাইরাসের অস্তিত্ব। তাড়াতাড়ি রক্তে থাকা জীবাণুর খোঁজ পাওয়া গেলে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত সেরে ওঠার সম্ভাবনাও অনেকটাই বেশি থাকে।

● **বায়ুদূষণও মৃত্যু ডেকে আনছে :**

শীর্ষ আদালত নিযুক্ত পরিবেশদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (EPCA) বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানিয়েছেন, ভারতে যে যে কারণে মৃত্যুর হার বেশি, তার মধ্যে এই মুহূর্ত পর্যন্ত পঞ্চমতম কারণ হল বায়ুদূষণ। প্রথম চারটি হল, উচ্চ রক্তচাপ, বাড়িতে রান্নার জ্বালানিজাত দূষণ, তামাক এবং অপুষ্টি। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সারা দেশে সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণ যুক্ত কয়েকটি শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। শহরগুলি হল—গোয়ালিয়র (মধ্যপ্রদেশ), রায়পুর (ছত্তিশগড়), পশ্চিম-সিংভুম (ঝাড়খণ্ড), গাজিয়াবাদ (উত্তরপ্রদেশ) এবং দিল্লি।

● **এইচ আই ভি-র মারণথাবা স্থিমিত হয়ে পড়ছে :**

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দাবি, এইচ আই ভি সংক্রমণ ক্রমেই তীব্রতা খোয়াচ্ছে। এর কারণ চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানুষের শরীরের বিশেষ জিন সংক্রান্ত এ আর টি চিকিৎসার (অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি) জেরে ক্রমেই এইচ আই ভি তার প্রতিলিপি গঠন ও সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা হারাচ্ছে। ফলে ওই সংক্রমণ ঢোকার পরে শরীরে এইডস-এর পরিস্থিতি তৈরি হতে আগের চেয়ে সময় বেশি লাগছে। বসনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দু-হাজার এইচ আই ভি-আক্রান্ত মহিলাকে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা সংক্রমণের ক্ষমতা কমার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।

● **মগজ চুরি :**

সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার থেকে সম্প্রতি একশোটি মগজ গায়েব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, চুরি হয়ে যাওয়া মগজগুলি 'ফরমাল-ডিহাইড'-এর জারে ডুবিয়ে রাখা ছিল। মগজগুলি গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হত। এই ঘটনায় টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কার্যত মাথায় হাত বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে বলা হয়েছে।

● **'ওরায়ন'-এর সফল উৎক্ষেপণ :**

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'নাসা'-র বিজ্ঞানীরা সফলভাবে পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করলেন মহাকাশযান 'ওরায়ন'-এর। এ প্রসঙ্গে 'নাসা'-র (ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস এজেন্সি) প্রধান বিজ্ঞানী এলেন স্টোফান জানান, যে ধরনের মহাকাশযানে কয়েক বছর পরে মানুষ মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেবে, তেমনই এক যান পরীক্ষামূলকভাবে পাঠানো হয়েছে। ৫ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত গিয়ে মহাকাশ 'ওরায়ন' আবার পৃথিবীর দিকেই ফিরে আসবে।

● **হাতির সংখ্যা হ্রাসে উদ্‌বেগ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের :**

সারা বিশ্বে উদ্‌বেগজনকভাবে কমে যাচ্ছে হাতির সংখ্যা। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এ হারে কমতে থাকলে আগামী প্রজন্মেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আফ্রিকার বন্য হাতি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা হাতির এই অস্তিত্ব সংকটের জন্য চীনা প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানীদের মতে, ২০১০ থেকে চীনে হাতির দাঁতে তৈরি সামগ্রীর চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে। মূলত সেই চাহিদা পূরণ করতেই আফ্রিকার চোরাশিকারিরা বিপুল উৎসাহে হাতি মারতে শুরু করেছে।

● **পেরুর বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে নতুন দিশা :**

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে নতুন দিশা ঘোষণা করা হল। দু-সপ্তাহব্যাপী ওই সম্মেলনে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করা হল। বলা হল, এতদিন কেবলমাত্র ধনী দেশগুলিই গ্রিন হাউস নির্গমন কমাতে থাকবে, এমনই সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু পেরু সম্মেলনে ঠিক হয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশকেই (বিশেষ করে ভারত, চীন-সহ উন্নয়নশীল দেশ) এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।

● **সারগাছিতে বিজ্ঞান কেন্দ্র :**

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা অনেক বিষয় অলৌকিক বা জাদু বলে মনে হয়। তার নেপথ্যে কিন্তু রয়েছে সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ। আমজনতা থেকে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সামনে সেই 'অলৌকিক' ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে বিভ্রম কাটাতে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 'স্বামী অখণ্ডানন্দ সায়েন্স সেন্টার'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। ওই বিজ্ঞান কেন্দ্রের দুটো ভাগ রয়েছে। একটিতে রয়েছে নানান

'অলৌকিক' ঘটনার প্রদর্শনী ও তার কার্যকারণের ব্যাখ্যা। এই বিভাগটির নামকরণ করা হয়েছে 'মায়ার অতীত সম্বোধি'। তার পাশের ঘরে রয়েছে 'বিজ্ঞান অনুশীলন কেন্দ্র'। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের দেওয়া ৪০ লক্ষ টাকায় ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম্স (এন সি এস এম)-এর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে এই বিজ্ঞান কেন্দ্র। সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতির মিউজিয়াম সংক্রান্ত উপদেষ্টা সরোজ ঘোষ। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এন সি এস এম-এর ডিরেক্টর জেনারেল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

১১৭ বছর আগে ১৮৯৭ সালে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন সারগাছিতে। তার দু-বছর পর ১৮৯৯ সালে কয়েক জন দুঃস্থ ও অনাথ শিশু নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয়। জন্ম সার্ধশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বামী অখণ্ডানন্দ সায়েন্স সেন্টার'।

খেলার জগৎ

● **বিশ্ব দাবা খেতাব এবারও কার্লসেনের দখলে :**

রাশিয়ার সোচিতে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলেন নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন। এই টানা দু-বার। দু-বারই কার্লসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভারতের বিশ্বনাথন আনন্দ। পাঁচবারের বিশ্বসেরা আনন্দ এবার খেতাব পুনরুদ্ধারের পথে ভালোই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু ১১ নম্বর গেমে হেরে যাওয়ায় আর শেষ রক্ষা হয়নি।

● **বিশ্ব বক্সিংয়ে রুপো সরযুবালার :**

কোরিয়ায় মেয়েদের বিশ্ব বক্সিংয়ে রুপোর পদক পেলেন মণিপুরের সরযুবালা দেবী। ৪৮ কেজি বিভাগে তিনি এই পদক পান। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে যুব বিশ্ব বক্সিংয়ে সরযু সোনা পেয়েছিলেন।

● **ফের ম্যাকাও ওপেন ব্যাডমিন্টন খেতাব সিন্ধু-র :**

পর পর দু-বার ম্যাকাও ওপেন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের সিঙ্গলস্ খেতাব জিতলেন ভারতের পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু। ফাইনালে তিনি হারান দক্ষিণ কোরিয়ার কিম হায়ো মিনকে (২১-১২, ২১-১৭)। উল্লেখ্য, ভারতের এই ব্যাডমিন্টন তারকা দু-বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

● **বেটন কাপ হকি চ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়ান অয়েল :**

শতাব্দীপ্রাচীন বেটন কাপ হকি খেতাব জিতল ইন্ডিয়ান অয়েল। কলকাতায় ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক-কে। টুর্নামেন্টের সেরা ইন্ডিয়ান অয়েলেরই গগনদীপ সিং।

● **ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার টেনিস লিগ :**

ক্রিকেটে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আই পি এল), ফুটবলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আই এস এল)-এর পর এবার শুরু ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার টেনিস লিগ (আই পি টি এল)। বিশ্ব টেনিসের সর্বকালের সেরা রজার ফেডেরার, পিট সাম্প্রাস, রাফায়েল নাদাল; অন্যদিকে আনা ইভানোভিচ, ভারতের সানিয়া মির্জা-সহ একঝাঁক তারকা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন। খেলা চলছে নতুন দিল্লিতে।

● **ফুটবলারদের নামে রাস্তা আর্জেন্টিনায় :**

আর্জেন্টিনার এল চানার শহর কর্তৃপক্ষ অভিনব ভাবে সম্মানিত করল দেশের কয়েকজন কৃতী ফুটবলারকে। শহরের বিভিন্ন রাস্তার নাম রাখা হল জাতীয় দলের ফুটবল তারকাদের নামে। লিওনেল মেসি, আগুয়েরো, ডি মারিয়া, মাসচেরানো ও দেমি চেলসির নামে রাস্তা হল।

● **হার দিয়ে টেস্ট সিরিজ শুরু ভারতের :**

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারত ৪৮ রানে হেরে গেল। অ্যাডিলেডে ওই টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর : অস্ট্রেলিয়া ৫১৭/৭ ও ২৯০/৫, ভারত ৪৪৪ ও ৩১৫। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার অফ স্পিনার নাথান লিয়ন। দু-ইনিংস মিলিয়ে তিনি ১২টি উইকেট নেন।

● **চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হকি খেতাব জার্মানির :**

ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আট দেশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে চ্যাম্পিয়ন হল জার্মানি। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারাল পাকিস্তানকে। তৃতীয় স্থান পেল অস্ট্রেলিয়া। ভারত চতুর্থ।

● **বলের আঘাতে নিহত ক্রিকেটার ফিলিপ হিউজ :**

শন অ্যাবটের বাউন্সারের মারণ আঘাত থেকে সেরে উঠতে পারলেন না ফিলিপ জোয়েল হিউজ। ক্রিজে জ্ঞান হারানোর পর তা আর ফিরে পাননি। দু-দিন পরে এক বিবৃতিতে তাঁর অকালমৃত্যু ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। যে টিমের হয়ে খেলতে নেমে প্রাণ হারালেন হিউজ, সেই সাউথ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট সংস্থার মুখ্যকর্তা স্মিথ ব্র্যাডশও একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

৬৩ রানে ব্যাট করছিলেন হিউজ। ওই স্কোরেই চিরকালের জন্য অপরাজিত থেকে গেলেন। বাহাত্তর ঘণ্টা পর ছাব্বিশে পা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। দিন কয়েকের মধ্যে ব্যাগি গ্রিন পরে ব্রিসবেন টেস্টে নামার সুযোগও হয়তো ছিল।

এ বছরের শুরুর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বলেছিলেন হিউজ। অস্ট্রেলিয়া 'এ'-র হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তার পরপরই দুটো ডাব্‌ল সেঞ্চুরি। আমিরশাহিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে ক্রিস রজার্সের জায়গায় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে নির্বাচকদের মনে হয়, এখন থাক। রজার্স আর ক-বছরই বা খেলবে। ও বরং এটা খেলুক। হিউজের সামনে তো গোটা কেরিয়ারটাই পড়ে আছে। তার চেয়ে ওকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করা হোক। সত্যি, টেস্ট কেরিয়ারে আরও অনেক বছর বাকি ছিল হিউজের।

তরুণ, প্রতিভাবান এই তারকার মৃত্যুতে থমকে যায় অস্ট্রেলিয়া তো বটেই, সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বও। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দেশের পতাকা অর্ধেক নামানো। লর্ডসের গেটের বাইরে ফুলের তোড়া। শারজায় স্কোরবোর্ডে 'বিদায় হিউজ'। পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড টেস্টে সেদিনের খেলা বাতিল করে দেওয়া হয়। শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ আগেই বাতিল করা হয়। এ দিন তার সঙ্গে যোগ হয় গ্রেড এবং ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচও।

দুঃসংবাদটা যখন বিরাট কোহ্‌লিরা পান, তখন টিম ইন্ডিয়া অ্যাডিলেড ওভালে প্র্যাকটিসে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ম আপ থামিয়ে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন কোহ্‌লিরা। ছিলেন

টিম ডিরেক্টর রবি শাস্ত্রীও। অ্যাডিলেড ওভালের বিশাল স্কোরবোর্ডে তখন ভেসে উঠেছে 'বিদায় ফিল হিউজ। মাঠকর্মীরা অনেকেই কান্না চেপে রাখতে পারেননি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ওই টেস্ট টিমের চার সদস্য সিডনিতে হিউজ-দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। মনে করা হচ্ছে, কয়েক দিনের মধ্যে একটা টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামার মানসিক অবস্থায় থাকা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

● **বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দল বাছাই :**

আগামী বিশ্বকাপে আর খেলার সুযোগ পাবেন না যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, গৌতম গম্ভীর, জাহির খান ও হরভজন সিং।

এই পাঁচ তারকা ছাড়াও যাঁরা তিরিশ জনের সম্ভাব্য তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পেসার আশিস নেহ্‌রা ও মুনাফ প্যাটেল, স্পিনার পীযূষ চাওলা এবং অল-রাউন্ডার ইউসুফ পাঠান।

২০১১ সালের বিশ্বজয়ী দলের সদস্যদের মধ্যে শুধু চার জনের আগামী বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবার সম্ভাবনা আছে—অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহ্‌লি, সুরেশ রায়না এবং আর অশ্বীন। চূড়ান্ত দল ঘোষণা হওয়া এখনও বাকি আছে।

'নবাগত' ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্যতম হলেন শিখর ধবন, রোহিত শর্মা, অজিঙ্কিয়া রাহানে ও রবীন্দ্র জাডেজা। ভুবনেশ্বর কুমার, ইশান্ত শর্মা, মহঃ শামি, উমেশ যাদব, বরুণ অ্যারন, ধবল কুলকার্নি, মোহিত শর্মা ও অশোক দিন্দার মতো উদীয়মান বোলাররাও এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসনের নির্দেশ মেনেই নির্বাচকেরা গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী দলের পাঁচ জন নিয়মিত খেলোয়াড়কে ছেঁটে ফেলতে পারলেন—এমনই অভিযোগ করা হচ্ছে। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এটা একেবারে বিরল ঘটনা যে, কাপজয়ী দলের পাঁচ জন কিনা পরের বিশ্বকাপে বাদ।

বিবিধ সংবাদ

● **আর রুপালি পর্দায় দেখা যাবে না অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে :**

বিশ্বখ্যাত বলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি অভিনয় জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, জোলি অভিনীত ছবি 'আনব্রোকেন' শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে। ছবির মুক্তি উপলক্ষ্যে প্যারিসে যান এই অভিনেত্রী। সেখানেই স্থানীয় এক দৈনিকে সাক্ষাৎকারে জোলি নিজেই অভিনয় ছাড়ার কথা বলেন। অভিনয় ছেড়ে জোলি এবার চলচ্চিত্র পরিচালনায় মন দিতে চান বলে ওই সাক্ষাৎকারে জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জোলি অভিনীত বহু আলোচিত ছবি 'ক্লিওপেট্রা'-র চলতি বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পাওয়ার কথা। এলিজাবেথ টেলরের পর এবার জোলিকে মিশরীয় রানির ভূমিকায় দেখা যাবে।

● **'টাইম' ম্যাগাজিনের 'সেরা'-র তালিকায় মঙ্গলযান :**

ভারতের তৈরি মহাকাশযান 'মঙ্গলযান'-কে এ বছরের সারা বিশ্বে সেরা ২৫টি আবিষ্কারের মধ্যে স্থান দিল মার্কিন পত্রিকা 'টাইম'। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের মতে, মঙ্গল অভিযানে প্রথমবারের চেষ্টায় সাফল্য পেয়েছে ভারত। এই কৃতিত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার মতো মহাকাশ গবেষণায় অগ্রণী দেশগুলিও দেখাতে পারেনি। এ কারণেই এই অভিনব সিদ্ধান্ত বলে 'টাইম' সূত্রে বলা হয়েছে।

● **পল রোবসনকে নিয়ে ছবি :**

মানুষের সমানাধিকারের দাবিতে তিনি গান লিখতেন। প্রকাশ্য সভায় তা নিয়ে ভাষণ দিতেন। এই প্রতিবাদী গায়ক, অভিনেতা সারা বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় হলেও মার্কিন প্রশাসন তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। তাঁর নাম পল রোবসন। তাঁর মৃত্যুটাও রহস্যজনক। বিশ্বখ্যাত এই মানুষটির বর্ণময় জীবনকে চলচ্চিত্রে রূপদান করছেন খ্যাতনামা ম্যাককুইন স্টিভ। ছবির নাম 'বায়োপিক'।

● **শ্রমিকের নামে চায়ের ব্র্যান্ড :**

উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ চা-বাগান 'মার্গারেট হোর' কর্তৃপক্ষ তাদের উৎপাদিত একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের চায়ের নাম রেখেছে ওই চা-বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক পূর্ণে সুব্বা-র নামে। উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত।

● **দুই ভারতীয়কে 'সন্ত' ঘোষণা পোপের :**

কেরালার দুই খ্রিস্টান ধর্মযাজক কুরিয়াকোজ চাভারা ও সিস্টার ইউফ্রেসিয়াকে 'সন্ত'-এর মর্যাদা দিল ভ্যাটিকান। গত ২৩ নভেম্বর স্টেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে এই দুজনের নাম ঘোষণা করেন পোপ ফ্রান্সিস। উল্লেখ্য, এই নিয়ে মোট তিন ভারতীয় সর্বোচ্চ এই ক্যাথলিক সম্মান পেলেন। তিনজনই কেরালার। এর আগে ২০০৮-এ সিস্টার আলফনসাকে 'সেন্টহুড' (সন্ত)-এ ভূষিত করে ভ্যাটিকান।

● **নাৎসি আমলের শিল্পসম্ভার সুইস জাদুঘরে :**

নাৎসি যুগের শিল্প সংগ্রাহক কনের্লিয়াস গুরলিটের দান করে যাওয়া সম্পত্তি সুইটজারল্যান্ডের বার্ন আর্ট মিউজিয়ামে স্থান পেল। এর মধ্যে রয়েছে পিকাসো, রেনোয়া, শাগাল এবং মোনে-র মতো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবিও। তবে বহু শিল্পকর্মের আসল মালিক এখনও চিহ্নিত না হওয়ায় সেগুলি এখন জার্মানিতেই থাকবে।

● **মুরলী দেওরা প্রয়াত :**

কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলী দেওরা প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। টানা ২২ বছর মহারাষ্ট্রে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন নায়ার। ১৯৭৫ সালে মুম্বই পুরভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে দেওরার রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু। ১৯৭৭-৭৮ সালে মুম্বইয়ের মেয়র হন। দক্ষিণ মুম্বই কেন্দ্র থেকে পর পর চার বারের লোকসভা সাংসদ হন তিনি। প্রথম ইউ পি এ সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন।

● **রেকর্ড দামে বিক্রি তিব্বতি শিল্পকর্ম :**

৬০০ বছরের পুরোনো একটি তিব্বতি শিল্পকর্ম রেকর্ড দামে নিলাম হয়ে গেল। রেশমের ওপর লাল ও সোনার জরি দিয়ে তৈরি এক ধরনের ওই পর্দা শিল্পরসিকদের কাছে 'থাঙ্কা' হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি হংকংয়ের ক্রিস্টিজ নিলামে ওই 'থাঙ্কা'-টি সাড়ে চার কোটি মার্কিন ডলার দিয়ে কিনে নিলেন চীনের ধনকুবের লিউ ইকিয়াং।

● **ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরীর জীবনাবসান :**

গত ২৭ নভেম্বর অক্সফোর্ডে নিজের বাসভবনে প্রয়াত হলেন

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী (৮৮)। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ইতিহাস চর্চার অগ্রণী ব্যক্তিত্ব তপন রায়চৌধুরী তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য রেখে গেছেন অমূল্য একগুচ্ছ গ্রন্থ। তাঁর লেখা 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গির', 'ইউরোপ রিকনসিডার্ড', 'পারসেপশন্স', 'রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিত চর্চা', সর্বোপরি 'বাঙালনামা' ইতিহাস সমাজবিদ্যার সীমা ছাড়িয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স এবং অক্সফোর্ডের সেন্ট অ্যাস্টনিস কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন এই ভিন্ন ধারার ইতিহাসবিদ।

● **প্রয়াত এ আর আন্তুলে :**

মহারাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী এ আর আন্তুলে ২ ডিসেম্বর প্রয়াত হলেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এই কংগ্রেস নেতা। ওই সময়ের মধ্যে সিমেন্ট দুর্নীতি মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রিত্ব খোয়ান। পরে ২০০৪-এ কেন্দ্রে ইউ পি এ জোট সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী হন।

● **সম্মান জানানো হল প্রাণদায়ী এক মানুষকে :**

নাৎসি ঘাতকদের হাত থেকে ইহুদিদের প্রাণরক্ষায় এগিয়ে আসা একজন মানুষের কথা সারা বিশ্ব এতদিন জানত। তাঁর নাম অস্কার শিন্ডলার। কিন্তু সম্প্রতি শিন্ডলারের মতো আর-এক পরিত্রাতার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর নাম জিওর্জিও পারলেস্কা। স্পেনের কূটনীতিকের ছদ্মবেশে ওই ইতালীয় ব্যবসায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি হানাদারির হাত থেকে ৫ হাজার ইহুদিকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাল ইজরায়েলি অর্কেস্টা।

● **'টাইম' ম্যাগাজিনের সম্মান :**

সিয়েরা লিওনে লাইবেরিয়া-সহ পশ্চিম এশিয়ার ভূখণ্ডে 'ইবোলা' সংক্রমণে আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে যেসব চিকিৎসক, সেবিকা এবং সমাজসেবী সংগঠন অক্লান্ত পরিচর্যা করেছেন, তাঁদের সকলকে এ বছরের 'পার্সন অফ দ্য ইয়ার' (বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব) সম্মান জানাল মার্কিন পত্রিকা 'টাইম'। পত্রিকার ইতিহাসে এমন নির্বাচন এই প্রথম।

● **ভারতে নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত :**

একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রদূত পদে অভিষিক্ত হলেন। নাম রিচার্ড রাহুল বর্মা। প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় কূটনীতিক হেনস্থা নিয়ে বিতর্কের পরে সরানো হয়েছিল আগের মার্কিন রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়ালকে। সেই পদে অস্থায়ীভাবে কাজ চালাচ্ছিলেন ক্যাথলিন স্টিফেন্স। রিচার্ড রাহুল বর্মা স্থায়ী রাষ্ট্রদূত হয়ে ভারতে এলেন।

● **বিশ্বের দীর্ঘতম রেলযাত্রা :**

চীনের ইওয়াউ স্টেশন থেকে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদগামী একটি ট্রেন যাত্রা শুরু করেছিল গত ১৮ নভেম্বর। টানা ২১ দিন চলার পর ১১ ডিসেম্বর ট্রেনটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাল। দীর্ঘ ১৩ হাজার ৫২ কিলোমিটার পথ পেরোতে গিয়ে ট্রেনটি স্পর্শ করল রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখাস্তান, পোল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের মাটি। বিশ্বের ইতিহাসে এটাই দীর্ঘতম রেলযাত্রা বলে আন্তর্জাতিক রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে দাবি।

● **'নৃত্যসম্রাজ্ঞী' সিতারা দেবী প্রয়াত :**

কত্থকের সম্রাজ্ঞী সিতারা দেবী দীর্ঘ রোগভোগের পর মুম্বইয়ের হাসপাতালে ২৮ নভেম্বর মারা গেলেন। বয়স হয়েছিল ৯৪। গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন প্রবীণা শিল্পী।

সারা বিশ্বকে কত্থকের জাদুতে মোহিত করেছেন সিতারা দেবী। হিন্দি ছবির জগতে কত্থককে নিয়ে আসার পিছনেও অগ্রণীর ভূমিকা তাঁরই। 'উষাহরণ', নাগিনা', 'অঞ্জলি', 'মাদার ইন্ডিয়া'-র মতো বেশ কয়েকটি হিন্দি ছবিতে নৃত্যশিল্পী হিসেবে তাঁকে দেখা গিয়েছে। সিতারা দেবীর কাছে কত্থক শিখেছেন মধুবালা, রেখা, মালা সিন্‌হা এবং কাজলের মতো অভিনেত্রীরা।

১৯২০ সালে কলকাতায় জন্ম সিতারা দেবীর। দীপাবলির প্রাক্কালে ধনতেরাসের দিন জন্ম হয়েছিল বলে নাম রাখা হয়েছিল ধনলক্ষ্মী। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবা সুখদেব মহারাজের তত্ত্বাবধানেই কত্থক শেখা শুরু। বাবা পরে ছোট্ট ধনলক্ষ্মীর নতুন নাম রাখেন সিতারা (অর্থাৎ নক্ষত্র)। এগারো বছরের সিতারার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'নৃত্যসম্রাজ্ঞী' আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁকে।

● **৪৫তম ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া :**

৪৫তম ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া-র (ইফি) মঞ্চে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য এ বার ছিল হ্যাটট্রিক চান্স। তাঁর পরিচালিত 'আরেকটি প্রেমের গল্প' আর 'অপুর পাঁচালি'-র জন্য ইফিতে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পান কৌশিক। তাই এ বছর কম্পিটিশন সেকশনে তাঁর ছবি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই টলিউডে প্রত্যাশার পারদ চড়ছিল। নিরাশ করেননি কৌশিক। তাঁর ছবির হাত ধরেই বেস্ট অ্যাক্টর মেল (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা), সিলভার পিকক পুরস্কার এল বাংলায়।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা ছবি 'ছোটদের ছবি'-র নায়ক দুলাল সরকার। সাধারণের তুলনায় খর্বকায়, নানারকম প্রতিবন্ধকতা তাঁর নিত্যসঙ্গী। এ ছবিতে তাঁর চরিত্রের নামও 'খোকা'। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে যে তিনি অনেকের চেয়েই দড়, তার সাক্ষী রইল ইফির মঞ্চ। জীবনের প্রথম ছবি। সেই ছবিতেই ইফির মঞ্চে সেরা নায়কের পুরস্কার। পুরস্কারদাতা জ্যাকি শ্রফ।

● **অভিনেতা দেবেন বর্মার জীবনাবসান :**

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ২ ডিসেম্বর সকালে পুণের এক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা দেবেন বর্মা। বয়স হয়েছিল ৭৮।

১৯৬১ সালে বি আর চোপড়ার প্রযোজনায় 'ধর্মপুত্র' ছবিটি দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু দেবেন বর্মার। এরপর ১০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। 'অঙ্কুর', 'চোরি মেরা কাম', 'অনুপমা', 'গোলমাল', 'খাট্টা মিঠা', 'দিল', 'আন্দাজ আপনা আপনা', 'দিল তো পাগল হ্যায়'-র মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় দক্ষতার পরিচয় মিলেছে।

হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি মারাঠি এবং গুজরাতি ছবিতেও অভিনয় করেছেন দেবেন বর্মা। প্রযোজনা এবং পরিচালনার কাজও করেছেন একটা সময়। তাঁর প্রযোজিত ছবিগুলির অন্যতম 'বেশরম'। অভিনয় জীবনের শেষের দিকে 'মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায়' এবং 'ক্যালকাটা মেল'-এ অভিনয় করেন তিনি। □

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

জা নে ন কি?

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন

মলয় ঘোষ

ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করেন। তাই গ্রামোন্নয়নকে বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবা যায় না। স্বাধীনতার পর থেকেই সারা দেশে জোর দেওয়া হয়েছে গ্রামোন্নয়নে—নেওয়া হয়েছে নানান প্রকল্প। প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে দারিদ্র্যদূরীকরণে ও দরিদ্র পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে। গ্রামোন্নয়নে এ পর্যন্ত গৃহীত যে সমস্ত প্রকল্পগুলি উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে রয়েছে—

(ক) বিভিন্ন এলাকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল—পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন সংস্থা (HADA), খরাপ্রবণ এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি (DPADP), কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি (CADP), মরু অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি (DDP), অব্যবহৃত জমির উন্নয়নে সুসংহত কর্মসূচি (IWDP) প্রভৃতি।

(খ) স্বনিযুক্তি এবং মজুরিভিত্তিক কর্মনিয়োগ প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল—ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন এজেন্সি (SFDA), প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন এজেন্সি (MFALD), সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (FFW), জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি (NREP), গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (RLEGP), জওহর রোজগার যোজনা (JRY), কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম (EAS), স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY), মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (MGNREGS) ইত্যাদি।

(গ) ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, আশ্রয়হীন দরিদ্র পরিবারের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজন সরবরাহ, গণবণ্টন ব্যবস্থাকে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

(ঘ) সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (এর তিনটি অংশ রয়েছে, যথা—দরিদ্রদের জন্য বার্ধক্যভাতা, দরিদ্র মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং দরিদ্র পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যুতে বিমা সহায়তা), অন্নপূর্ণা যোজনা প্রভৃতি।

যৌথ অংশীদারিত্ব

গ্রামোন্নয়নে রূপায়িত হয়ে চলা বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে কিছু প্রকল্প কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে, কিছু প্রকল্প শুধুমাত্র কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায়, আবার কিছু প্রকল্প শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে রূপায়িত হয়। আবার কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ব্যয় বরাদ্দের অনুপাত বিভিন্ন প্রকার। তা ছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। এগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রূপায়ণের পদ্ধতিগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়ে থাকে এবং নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি

স্বনিযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্যদূরীকরণ, গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল—এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং নির্দিষ্ট দল ভিত্তিক উপভোক্তাকেন্দ্রিক নানান প্রকল্পকে একত্রিত করে গৃহীত সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP), যা সারা দেশে শুরু হয় ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ। প্রথমে ২৩০০টি ব্লকে শুরু হলেও পরবর্তীকালে সারা দেশেই এই কর্মসূচি চালু করা হয়। এই প্রকল্পে দরিদ্র পরিবারগুলি থেকে উপভোক্তা নির্বাচন করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, যাতে করে এই আর্থিক সহায়তার সাহায্যে উপভোক্তা তাঁর পছন্দমতো কোনও স্বনিযুক্তিমূলক কাজ করতে পারেন এবং তার রোজগার বাড়ে। আর্থিক সহায়তার মধ্যে ছিল ব্যাংক ঋণ এবং অনুদান—এই দুটি অংশ। IRDP-র সঙ্গে, আরও কয়েকটি প্রকল্প দারিদ্র্যদূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্পগুলি হল :

● **গ্রামাঞ্চলের তরুণদের স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ (TRYSEM)**—১৯৭৯ সালে গৃহীত এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের যুবক-যুবতীদের প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ সহায়তা।

● **গ্রামাঞ্চলের নারী ও শিশুদের উন্নয়ন (DWCRA)**—১৯৮৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে লক্ষ্য ছিল দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে আর্থিক ও সামাজিক সক্ষমতা অর্জন, রোজগার বৃদ্ধির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ইত্যাদি।

● **দশ লক্ষ কূপনির্মাণ প্রকল্প (MWS)**—১৯৮৮ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল মূলত তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত দরিদ্র উপভোক্তাদের কৃষিকার্যে সেচের জন্য কূপ খননের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া। এই আর্থিক সহায়তা পুরোপুরি অনুদান হিসেবে দেওয়া হত।

● **গ্রামাঞ্চলের কারিগরদের জন্য উন্নত সরঞ্জাম** (SITRA)—১৯৯২ সালে গ্রামীণ কারিগরদের জন্যে গৃহীত এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত, যাতে করে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মানের উন্নয়ন ঘটে।

● **গঙ্গা কল্যাণ যোজনা** (GKY)—১৯৯৫ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পে দরিদ্র কৃষকদের সেচের সুবিধার জন্য গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হত।

দারিদ্র্যদূরীকরণে এবং তার সহযোগী উপরোক্ত পাঁচটি প্রকল্পের ভূমিকা এবং তা রূপায়ণের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই ছয়টি প্রকল্পকে একসঙ্গে নিয়ে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা কর্মসূচি চালু করা হয় ১৯৯৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে। কারণ, দেখা যায় যে এই ছয়টি প্রকল্প পৃথক হলেও মূলত এদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক।

SGSY-এর সীমাবদ্ধতা

SGSY কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে গ্রাম স্তরে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে থেকে মহিলা সদস্যদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। গঠিত হয় অসংখ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী। গ্রামোন্নয়নে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্যদূরীকরণে যোগ হয় একটি নতুন অধ্যায়। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার ফলস্বরূপ সারা দেশে দারিদ্র্য-দূরীকরণের মাধ্যম হিসেবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলির সামাজিক একত্রীকরণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী দেশের প্রায় ৭ কোটি পরিবারের

মধ্যে ২.৫ কোটি পরিবারকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যদিও স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও SGSY প্রকল্পে ব্যাংক সংযোগ বেশ দুর্বল বলে লক্ষিত হয়। ফলে প্রয়োজন মতো ব্যাংক ঋণ প্রকল্পের গ্রহীতাদের কাছে পৌঁছয়নি। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, গোষ্ঠী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপ্রতুলতা ইত্যাদি SGSY প্রকল্পের অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ২০০৮ সালে অধ্যাপক আর. রাধাকৃষ্ণর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ২০০৯ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। রাধাকৃষ্ণ কমিটিও SGSY-এর পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে এবং SGSY প্রকল্পকে পুনর্গঠিত করার সুপারিশ করে। মূলত এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভারত সরকার 'জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন' (NRLM) হিসেবে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনাকে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

লক্ষ্য

দরিদ্র পরিবারগুলিকে লাভজনক স্বনিযুক্তি এবং দক্ষ মজুরিভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ লাভের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা, যাতে করে তৃণমূল স্তরে দরিদ্র মানুষের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিবারগুলি জীবন ও জীবিকার স্থায়ীভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। সারা দেশের ১৩টি রাজ্যে নিবিড়ভাবে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কাজ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে আর্থিক সহযোগিতা করছে। এই ১৩টি রাজ্য হল—অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ।

মুখ্য বৈশিষ্ট্য

(১) এই কর্মসূচি গ্রামে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত পরিবারগুলির অন্তত একজন সদস্যকে, বিশেষ করে মহিলা সদস্যকে একটি সময়সীমার মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে।

(২) স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং গ্রাম ও উচ্চতর স্তরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ ও মহাসংঘ গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি ও দরিদ্রদের কার্যক্রমের পরিসর, তাদের মতামত জানানোর সুযোগ ও সংগতি বৃদ্ধি করা এবং বহিরাগত সংস্থাগুলির ওপর তাদের নির্ভরশীলতা কমাবার দিকে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

(৩) জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে স্বতন্ত্র ও সহধর্মী পরিকাঠামো থাকবে। রাজ্য স্তরে রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা থাকবে।

● রাজ্য অভিযান ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (SMMU)

রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা অভিযান (SRLM), রাজ্যে রাজ্য অভিযান ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (SMMU) গঠনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কর্মসূচি রূপায়ণ করবে। রাজ্য সরকারের নিয়োজিত একজন পূর্ণ সময়ের রাজ্য মিশন অধিকর্তা (SMD) রাজ্য মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট-এর নেতৃত্বে থাকবেন এবং তিনি হবেন সমিতির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক (CEO)।

রাজ্য মিশন অধিকর্তা ছাড়া রাজ্য মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে বিভিন্ন বিষয়ে, যথা—সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, জীবিকা, মানব সম্পদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী/বিশেজ্ঞদের একটি টিম ও সাহায্যকারী কর্মচারীবৃন্দ থাকবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞদের সরকারি সংস্থা, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, ব্যাংক ইত্যাদি থেকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা যেতে পারে।

● জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (DMMU)

রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, জেলায় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্দেশ্যপূরণ ও মিশনের কার্যক্রমের রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে। জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৃণমূল স্তরের কাঠামোগুলির জন্য একটি সহায়ক সংস্থা হবে। জেলা মিশন প্রবন্ধক (DMM)-এর নেতৃত্বে জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ চুক্তির ভিত্তিতে বা সরকারি বিভাগ, ব্যাংক বা সরকারি অধিগৃহীত সংস্থা থেকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন। বিভিন্ন বিষয়ে, যথা—সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, জীবিকা, মানব সম্পদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞদের একটি টিম ও সাহায্যকারী কর্মচারীবৃন্দ নিয়ে এই জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গঠিত হবে।

● ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (BMMU)

ব্লক মিশন প্রবন্ধক (BMM)-এর নেতৃত্বে একটি ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট থাকবে। এই কাঠামোর মুখ্য দায়িত্ব হবে দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় একত্রিত করা, তৈরি হওয়া এবং নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করা, বিভিন্ন স্তরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ বা দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠান গঠন করা এবং দরিদ্র জনগণ, তাদের প্রতিষ্ঠান, সম্পদ কর্মী এবং অন্যান্য সমাজকর্মীদের সক্ষমতা সৃষ্টি করা।

(৪) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজলভ্য করতে, জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করতে ও ঋণের ফাঁস থেকে বেরিয়ে আসতে, পরিশোধসাধ্য মূল্যে এবং চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে ও পরিশোধের সুবিধাজনক শর্তে বারংবার আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকা আবশ্যিক।

(৫) যোগ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য আবর্তনীয় তহবিলের সংস্থান রয়েছে। এই তহবিল তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং তাদের অগ্রগতি মূলস্রোতের ব্যাংকের আর্থিক সহায়তাকে আকর্ষণ করবে। এমনকি যারা মূলস্রোতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণ নিয়েছে এমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ঋণ পরিশোধের খতিয়ানের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হলে সুদের ওপর ভরতুকিরও সহায়তা পাবে। প্রতিটি দরিদ্র পরিবার বারংবার ঋণ সহায়তার মাধ্যমে যাতে অন্তত ১ লক্ষ টাকার মতো পুঁজি বিনিয়োগে সক্ষম হয় তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

(৬) যেহেতু পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান গ্রামোন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে, তাই দরিদ্র গ্রামবাসীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তার ফেডারেশনগুলির সঙ্গে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সুসম্পর্ক থাকা দরকার। এর ফলে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয়। আবার, তাদের অংশগ্রহণে গ্রামোন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

২০১১ সালের ৩ জুন কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পের সূচনা হয়। বিভিন্ন রাজ্যে ধীরে ধীরে এই প্রকল্প চালু হতে থাকে—অবশ্য পাশাপাশি স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা প্রকল্পও চালু থাকে। ৩১ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা প্রকল্প চালু থাকার পর ২০১৩-১৪ সাল থেকে তা বন্ধ করে সারা দেশে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্মসূচি পূর্ণমাত্রায় চালু করা হয়।❑

উড়ান দুনিয়ায় পেশার হদিস

মহুয়া গিরি

বিমানে যাতায়াত এখন আর শুধু কিছু ধনী মানুষের বিলাসিতা নয়, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছর কুড়ি আগেও দৃশ্যটা অন্যরকম ছিল। ১৯৯১ সালে ভারতে এয়ারলাইন কোম্পানি বলতে ছিল শুধু এয়ার ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্। দুটোই সরকারি সংস্থা। আর এখন? ২০টিরও বেশি কোম্পানি উড়ান পরিষেবা দিচ্ছে। বেসরকারিকরণের ফলে মাত্র কুড়ি বছরেই পুরো ছবিটা বদলে গেছে। এখন এয়ারলাইন যাত্রীদের সস্তায় বিমানযাত্রার সুবিধে করে দিচ্ছে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পাল্লা দিয়ে কমেছে টিকিটের দাম। খাবারদাবার, বিলাস-বৈভব কাটছাঁট করে খুব সস্তার 'নো ফ্রিলস্ ট্রাভেলিং'-এর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সকালে দিল্লি-বিকেলে মুম্বই—গতির জীবনে সময় বাঁচাতে এখন অনেকেই প্লেনে যাতায়াত পছন্দ করেন। বিশ্ব অর্থনীতির এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলির ওপর নির্ভর করে দেশের জিডিপি দ্রুত হারে বাড়ছে, ভারতের উড়ান পরিষেবা ক্ষেত্র তার মধ্যে অন্যতম। এখানে অর্থনীতি এখন উর্ধ্বমুখী। বিগত দুই দশকে যাত্রীসংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, প্রতি বছরে এই সংখ্যা ২০ শতাংশ হারে বাড়ছে। এখন ভারতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রায় প্রতি বছর গড়ে ১৬ কোটিরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করে।

জলপথে যেমন জলযোগাযোগ ব্যবস্থা, সড়কপথে বাস, ট্রাম, রেল, তেমনই আজকের দিনে আকাশপথে জমে উঠেছে উড়ান ব্যাবসা। আর প্লেন তো শুধু এক রকমের নয়। রয়েছে এয়ারবাস, বোয়িং-এর মতো যাত্রীবাহী বিমান, মিগ, বোমবার্ডিয়ান, হকার-এর মতো যুদ্ধবিমান, বিচ এয়ারক্রাফ্ট বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিমান। রয়েছে এমব্রেস, এটিআর, ইউরোকপটার, এসএএবি, সিরোস্কি, দাসান্ত, লিয়ারজেট, সেসনা আরও কত কী! কোনও কোনও দেশের আবার নিজস্ব প্রযুক্তির বিমান থাকে। যেমন ইউরোপের এয়ারবাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং, কানাডার বোমবার্ডিয়ার, ব্রাজিলের এমব্রায়ের। এই সমস্ত হাজারো বিমান চালানো, দেখাশোনা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন প্রচুর দক্ষ পেশাদার ও শ্রমিক। উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিতদের জন্য যেমন ভালো বেতনের চাকরি রয়েছে, তেমনি দেখাশোনার কাজে অনেক সাধারণ শ্রমিককেও নিয়োগ করা হয়।

উড়ান ক্ষেত্রের কাজের দুনিয়াটাকে মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। বিমানে বিমানচালক ও বিমানসেবক, মেইনটেন্যান্স, বিজনেস ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অপারেশন, রোটারি, মিলিটারি ও ডিফেন্স, ম্যানুফ্যাকচারার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, বিমান বন্দর, কার্গো ও লজিসটিক্স, হসপিটালিটি, নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা বিভাগে রয়েছে নানা রকমের পেশার সুযোগ।

পাইলট

সব বাচ্চাই কোনও না কোনও সময়ে পাইলট হবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু শেষ অবধি পারে ক-জন? এ চাকরিতে স্বাস্থ্যমানের কড়াকড়ি ও ট্রেনিং-এর চাপ আছে। তা ছাড়া পাইলট হতে চাইলে একটা ন্যূনতম যোগ্যতার প্রয়োজন। দ্বাদশ স্তরে পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক নিয়ে বিজ্ঞান শাখায় কম করে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করতে হয়। এরপর উড়ানের ট্রেনিং। প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স (পিপিএল) পেতে গেলে অন্তত ১৬ বছর বয়স হওয়া বাধ্যতামূলক। আর কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (সিপিএল)-এর জন্য ১৭ বছর বয়স হওয়া চাই। দু-চোখের দৃষ্টি চাই ৬/৬। সাধারণত স্বাস্থ্য মজবুত হতে হবে। বিমান চালাতে চাইলে প্রথমে স্টুডেন্ট পাইলট লাইসেন্স পেতে হয়। তারপর পিপিএল। এর মধ্যেই শেখানো হয় এভিয়েশন মেটেরোলজি এবং এয়ার ন্যাভিগেশন। পিপিএল পেতে গেলে ৬০ ঘণ্টা উড়ান অভিজ্ঞতা লাগে। তার মধ্যে ২০ ঘণ্টা সোলো, অর্থাৎ একা ওড়ার অভিজ্ঞতা। সিপিএল পেতে গেলে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে অন্তত ২৫০ ঘণ্টা উড়ানের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এই পেশায় আইনকানুন বেশ কড়া। দেশে বেশ কয়েকটি ফ্লাইং স্কুলেই লাইসেন্স দেওয়া হয়। তবে আন্তর্জাতিক উড়ান সংস্থাগুলিতে চাকরি পেতে গেলে কোনও আন্তর্জাতিক মানের ফ্লাইং স্কুল থেকেই প্রশিক্ষণ নিলে ভালো। এই পেশায় গ্ল্যামার আছে। আছে মাস গেলে ছয় অঙ্কের বেতনকাঠামোও। তবে কাজের সময় অন্য দশটা-পাঁচটা চাকরির মতো ছকবাঁধা নয়। নিষ্ঠা লাগে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে চনমনে থাকতে হয়। পেশায় ঝুঁকিও আছে। আগে খুব কম মেয়েরাই এই পেশায় আসত। এখন সেই তুলনায় মহিলা পাইলটের সংখ্যা বাড়ছে। দ্বাদশ পাশ করার পর দেশের বিভিন্ন এয়ার ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হতে গেলে প্রায় সব জায়গাতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি পরীক্ষা দিতে হয় ফিটনেসেরও। এই ধাপটিই সবচেয়ে কঠিন। ফিটনেস-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এই পেশায় আয়ের সুযোগ যেমন বেশি, পড়ার খরচও তেমনি কম নয়। এদেশে পড়তে গেলে মোটামুটি

১৫-২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। অনেক ব্যাংকই ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শিক্ষাঋণ দেয়। ট্রেনিং শেষ হলে বিমান চালনার ছাড়পত্র মেলে। নামি এয়ারলাইন সংস্থাগুলি এইসব প্রতিষ্ঠানের মেধাবী পড়ুয়াদের শিক্ষানবিশির সুযোগ দেয়। সেখানে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে ভবিষ্যতে ওই সমস্ত কোম্পানির পাইলট হিসেবে কাজ করার সুযোগ মেলে। শিক্ষানবিশদের বেতন কম হলেও পরে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মাইনে বাড়তে থাকে। ভারতে পাইলটরাই সর্বোচ্চ বেতনের চাকরি করেন। দেশীয় বিমান সংস্থায় একজন পাইলটের মাসিক বেতন মোটামুটি দেড় লক্ষ টাকা থেকে শুরু হয়। এরপর সময় এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আয় আরও বাড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বেতন কাঠামো বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক উড়ানে একজন দক্ষ পাইলটের মাসিক বেতন মোটামুটি ৫-৬ লক্ষ টাকা হতে পারে।

তবে ভারতীয় বায়ুসেনা দলে পাইলট পদে যোগ দিতে চাইলে তার জন্য আলাদা পরীক্ষা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে বেতনকাঠামো কমার্শিয়াল পাইলটদের তুলনায় অনেক কম হলেও সরকারি পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকে।

বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের খোঁজ এখানে দেওয়া হল।

১. ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি, উত্তরপ্রদেশ।

২. ফ্লাইং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, বেহালা, কলকাতা।

৩. গভর্নমেন্ট এভিয়েশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, সিভিল এয়ারোড্রোম, ভুবনেশ্বর।

৪. কারনাল এভিয়েশন ক্লাব, কুনজাপুরা রোড,কারনাল, হরিয়ানা।

৫. গভর্নমেন্ট ফ্লাইং ক্লাব, এয়ারোড্রোম, লখনউ।

৬. স্কুল অব এভিয়েশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, দিল্লি ফ্লাইং ক্লাব লিমিটেড, নিউ দিল্লি।

৭. স্টেট সিভিল এভিয়েশন, ইউ পি গভর্নমেন্ট ফ্লাইং ট্রেনিং সেন্টার, কানপুর ও বারাণসী।

৮. রাজস্থান স্টেট ফ্লাইং স্কুল, সঙ্গনের এয়ারপোর্ট, জয়পুর, রাজস্থান।

৯. গভর্নমেন্ট ফ্লাইং ট্রেনিং স্কুল, জাক্কুর এয়ারোড্রোম, ব্যাঙ্গালোর।

১০. অন্ধ্রপ্রদেশ ফ্লাইং ক্লাব, হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্ট, হায়দ্রাবাদ।

১১. অসম ফ্লাইং ক্লাব, গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট, অসম।

১২. বিহার ফ্লাইং ইন্সটিটিউট, সিভিল এয়ারোড্রোম, পাটনা।

কেবিন ক্রু

শুধু পাইলট নয়, কেবিন ক্রু হিসেবেও এয়ারলাইনসে কাজ করা যায়। বিমানসেবার পেশায় মহিলা কর্মীদের চাহিদা বেশি হলেও এখন অনেক পুরুষও এই পেশায় আছেন। বিমান আকাশে ওড়ার পর থেকে মাটি ছোঁয়া পর্যন্ত যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়াটাই এই পেশাদারদের কাজ। যাত্রীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুন জানানো, আপৎকালীন ব্যবস্থাগুলি জানিয়ে রাখা, প্রয়োজনমতো খাবার ও জল দেওয়া, যাত্রীদের দেখাশোনা করা—এসবই কেবিন ক্রু-এর কাজের মধ্যে পড়ে। বিমানসেবক হতে গেলে পেশাদারি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলির প্রয়োজন। মধুরভাষী, দক্ষ ও চটজলদি সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দক্ষতা থাকা চাই। চাই সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও। কাজের সময় মেজাজ হারালে চলবে না। উড়ানে নানা রকম যাত্রীরা আসেন-যান। তাঁদের নানা বায়না, অনেক সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই প্রতিদিনের কাজে সহনশীলতা ও মিষ্টি ব্যবহারের ছোঁয়া যেন থাকে। এ ছাড়া আছে স্বাস্থ্যবিধি। বিমানসেবকদের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো হতে হবে। ওজন হতে হবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই। বিপদের সঙ্গে লড়াই করবার মতো মানসিক জোর থাকা চাই এবং সব ক্ষেত্রেই পাসপোর্ট থাকা আবশ্যিক। চাই সঠিক উচ্চারণে ইংরেজি ও অন্য প্রাদেশিক ভাষাতে অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা। যাত্রীদের মন বোঝার ক্ষমতা। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান বা চাইনিজ-এর মতো বিভিন্ন বিদেশি ভাষা জানা থাকলে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলিতে কাজ পেতে সুবিধা হয়। কেবিন ক্রু হতে চাইলে অন্তত দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রয়োজন। এরপর কোনও ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে পেশাদারি প্রশিক্ষণ নিলে ভালো। থিয়োরি এবং হাতেকলমে দু-ভাবেই কাজ শেখানো হয়। সেখানেই এয়ারক্রাফ্‌ট ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞান, টিকিট ব্যবস্থা, বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য বিশেষ যত্নের মতো খুঁটিনাটি কাজ শেখা হয়ে যায়। বয়স মোটামুটি ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে থাকলে এই পেশায় কাজের সুযোগ বেশি পাওয়া যায়। এই পেশায় উপার্জনের সুযোগ অনেক। দেশীয় এয়ারলাইন্সে মোটামুটি ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সে ৭৫ হাজার থেকে লক্ষাধিক টাকা উপার্জনের সুযোগ আছে। তবে এই পেশায় বয়স একটা প্রধান বাধা। বেশি বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করার সুযোগ থাকে না। তখন অবশ্য গ্রাউন্ড স্টাফ কিংবা প্রশাসনিক কাজকর্মে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকে।

এয়ারোনটিক্‌ল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিমান ওড়ায় পাইলট। বিমান বানায় কারা? বানায় এয়ারোনটিক্‌ল ইঞ্জিনিয়াররা। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এই শাখায় নানা ধরনের বিমান তৈরির প্রযুক্তি পড়ানো হয়। উড়ানের দুনিয়ায় নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করতে হয় অত্যাধুনিক এয়ারক্রাফ্‌ট। শুধু বিমান তৈরি নয়, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে আরও উন্নত মানের বিমান সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তা শেখানো হয়। বাণিজ্যিক এবং মিলিটারি দুই ধরনের বিমানের ডিজাইনিং, কনস্ট্রাকশন, ডেভেলপমেন্ট, টেস্টিং, অপারেশন, মেনটেন্যান্স-এর মতো অত্যন্ত জরুরি দিকগুলিও এই পেশাদারদেরই দেখতে হয়।

এরোনটিক্‌ল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ যেমন জটিল, তেমনি দক্ষ পেশাদারের কদরও বিশ্ব জুড়ে। এখন বিশ্ব জুড়ে আকাশ ও মহাকাশযাত্রার গুরুত্ব বেড়েছে। উড়ানের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। তাই দিনে দিনে এই পেশাদারদের কাজ ও চাহিদা দুই বাড়ছে। শুধু কলেজের পড়াশোনা বা তুখোড় বুদ্ধি

নয়, এই পেশায় আসতে গেলে প্রয়োজন দল বেঁধে কাজ করার মানসিকতাও। কারণ, এখানে সাধারণত সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে দল বেঁধে কাজ করেন নতুনেরা। পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও কাজের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে পেশায় টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যায়। সেইজন্য প্রয়োজন সুস্থ শরীর আর মন। সবদিকে সজাগ দৃষ্টি, কাজের খুঁটিনাটি শিখে নেওয়ার আগ্রহ এবং নির্ভুল অঙ্কের জ্ঞান থাকলে এই পেশায় ওপরে ওঠার রাস্তা সহজ হয়। সাফল্য আসে।

স্ট্রাকচারাল ডিজাইনিং, ন্যাভিগেশন গাইডেন্স, কন্ট্রোল সিস্টেম, ইনস্ট্রুমেনটেশন, কমিউনিকেশন, প্রোডাকশন মেথডের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ করা যায়। অথবা কোনও এক ধরনের বিশেষ উড়ান, যেমন—মিলিটারি বিমান, যাত্রীবাহী বিমান, হেলিকপ্টার, স্যাটেলাইট কিংবা রকেট-এগুলির ওপরেও বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনার সুযোগও রয়েছে। পড়ার শেষে কাজের সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন এয়ারলাইন সংস্থায়, এয়ারক্রাফ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে, এয়ার টারবাইন প্রোডাকশন প্ল্যান্টে।

দ্বাদশ স্তরে বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনার পরে স্নাতক স্তরে এই বিষয়ে বি টেক বা বি ই ডিগ্রি করা যায়। ছাত্র বাছাই পর্ব বেশ কঠিন হয়। স্নাতক স্তরে ভর্তির সময় বিজ্ঞানের বিষয়গুলির ওপর প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। কোর্সের সময়সীমা চার বছর। একসঙ্গে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়তে চাইলে ইন্টিগ্রেটেড এম টেক বা এম ই-ও পড়া যায়। সেক্ষেত্রে সময় লাগে পাঁচ বছর। স্নাতক স্তরে মেকানিক্যাল, সিভিল বা মেকাট্রনিক্স বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকলেও ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।

এয়ারোনটিক্‌ল ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে বি ই বা বি টেক ডিগ্রি লাগে। কিন্তু যাদের বি ই বা বি টেক নেই, তাদের জন্য এয়ারোনটিক্‌ল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া এ এম আই ই পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এই কোর্সটি এয়ারোনটিক্‌ল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রির সমতুল্য।❑

এয়ারোনটিক্‌ল ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজ/ইউনিভার্সিটি	রাজ্য/শহর	ডিগ্রি
আই আই টি	মুম্বই (মহারাষ্ট্র) কানপুর (উত্তরপ্রদেশ) খড়গপুর (পশ্চিমবঙ্গ) চেন্নাই (তামিলনাড়ু)	বি টেক
মাদ্রাজ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি	চেন্নাই (তামিলনাড়ু)	বি টেক
আলাগাপ্পা ইউনিভার্সিটি	কড়াইকুডি (তামিলনাড়ু)	বি এসসি
অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি	নয়ডা (উত্তরপ্রদেশ)	বি টেক, এম টেক
অমৃতা ইউনিভার্সিটি	কোয়েম্বাটুর (তামিলনাড়ু)	বি টেক
অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি	বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ)	বি ই
আন্না ইউনিভার্সিটি	চেন্নাই (তামিলনাড়ু)	বি ই, এম ই
মণিপাল ইউনিভার্সিটি	মণিপাল (কর্ণাটক)	বি টেক
মুম্বই ইউনিভার্সিটি	মুম্বই (মহারাষ্ট্র)	এম এসসি
পঞ্জাব টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি	কাপুরথালা (পঞ্জাব)	বি টেক
সত্যবামা ইউনিভার্সিটি	চেন্নাই (তামিলনাড়ু)	বি ই
সিংঘানিয়া ইউনিভার্সিটি	ঝুনঝুনু (রাজস্থান)	বি টেক, বি এসসি ডিপ্লোমা
এস আর এম ইউনিভার্সিটি	কাঞ্জিপুরম (তামিলনাড়ু)	বি টেক

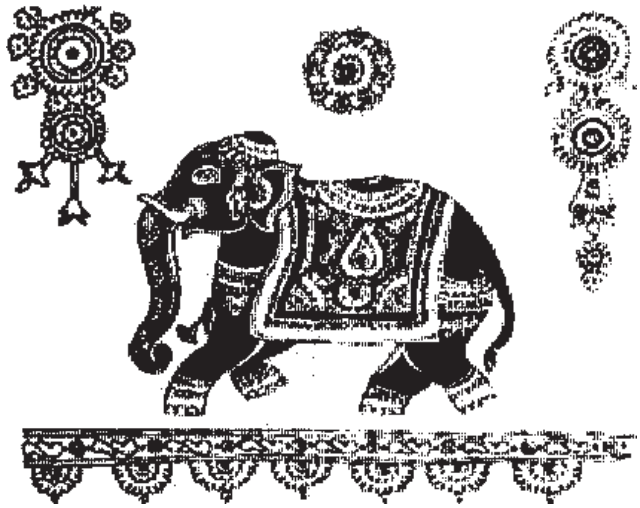

যোজনা ? কু্যইজ

১. লিনাস টরভালড্সের বিখ্যাত সৃষ্টির নাম কী?

২. "শোধ গঙ্গা" ও "শোধ গঙ্গোত্রী" কী?

৩. ট্যুইটার-এ একটি ট্যুইট-এ সর্বাধিক ক-টা ক্যারেক্টার (অক্ষর, চিহ্ন ইত্যাদি) থাকতে পারে?

৪. এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের বিশিষ্ট অতিথি কে?

৫. প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ও বর্তমান পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের জন্মদিন একই দিনে। সেটি কোন দিন?

৬. সম্প্রতি কোন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মরণোত্তর ভারত রত্নে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে?

৭. "জাব্রিস্কি মালভূমি" কোথায় অবস্থিত?

৮. ২০২২ সালের মধ্যে ১৫ কোটি মানুষকে প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এদেশে কোন সংস্থা গঠন করা হয়েছে?

৯. কাগজের মুদ্রার প্রচলন প্রথম কোন দেশে শুরু হয়?

১০. কবে ভারতবর্ষ "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" হয়?

১১. "ইন্দিরা গান্ধী রিটার্নস্" শীর্ষক বইটির রচয়িতা কে?

১২. ভারতের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন "ডেকান কুইন" কোন দুই স্টেশনকে সংযুক্ত করে?

১৩. দেশের সবথেকে বড় টাঁকশাল কোন শহরে অবস্থিত?

১৪. কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথমবার শনি গ্রহের বৃত্তগুলি লক্ষ করেন?

১৫. সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া "নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম : সিক্রেট অব দ্য টুম্ব" কোন বিখ্যাত হলিউড অভিনেতার শেষ চলচ্চিত্র?

উত্তর :

১. লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম। ২. ভারতে গবেষণার থিসিস ও ডিসার্টেশনের তথ্যভাণ্ডার হল "শোধ গঙ্গা"। যেসব গবেষণার কাজ বর্তমানে চলছে, তার তথ্যভাণ্ডার হল "শোধ গঙ্গোত্রী"। ৩. ১৪০। ৪. মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা। ৫. ২৫ ডিসেম্বর। ৬. মদন মোহন মালব্য। ৭. মঙ্গল গ্রহে। ৮. ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (NSDC)। ৯. চীন। ১০. ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই দিনটিকে আমরা প্রজাতন্ত্র দিসব হিসেবে পালন করি। ১১. খুশবন্ত সিং। ১২. কল্যাণ (মুম্বই) ও পুনে। ১৯৩০ সালের ১ জুন থেকে যাত্রা শুরু করে এই ট্রেনটি। ১৩. কলকাতা। ১৪. গ্যালিলিও। ১৫. রবিন উইলিয়ামস্ (২১ জুলাই, ১৯৫১—১১ আগস্ট, ২০১৪)।